

আলোয় আঁকি আগামীর পৃথিবী

DELL-DUPS

ম
১ জাতীয়
আন্দোলন
উৎসব '১২

■ ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ■

আলোয় আঁকি আগামী পৃথিবী

DELL DUPS

ম ১ জাতীয় গ্রান্ড প্রাইজ উৎসব '১২

■ ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ■

আলোয় আঁকি আগামীর পৃথিবী



১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব'১২

ভেন্যু:

টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
২২-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২

সম্পাদনা

তত্বাধীশ রঞ্জন সরকার

সম্পাদনা পর্ষদ

মহসীন কবীর
ইমতিয়াজ-আল-তারেক
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
মোহাম্মদ রাসেল
মো: আকরাম হোসেন
জাকিয়া খানম

বহু:

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস)

কৃতজ্ঞতা

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
ড. শফিউল আলম জুইয়া
মাহবুব জামান
সোনিয়া বশির কবির
ইহতিশাম কবির
এস.কে এনামুল হক

এস এম পোর্কি

আলমগীর হোসেন

জিয়া ইসলাম

শাহাদাত পারভেজ

জামান মাহমুদ

নাজমুল হোসেন

দীপঙ্কর দিগু

মাদল সেব বর্মন

জাহাঙ্গীর ফ্রেম ঘর

ফটোহাট

সম্পদের প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সকল লেখক

বিচারকবৃন্দ

গণমাধ্যম সহযোগী

ডিইউপিএস এর সকল সদস্য

উৎসবে সকল অংশগ্রহণকারী

ডিজাইন

প্রাবন গাঙ্গুলী

মুদ্রণ

চিত্রকল্প

১৭৯/৩ ককিরেরদুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের আলোকচিত্রের ইতিহাস এক আলোকিত অধ্যায়। কিন্তু এদেশের অন্যান্য শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে আলোকচিত্র শিল্পের বিকাশ কতটা ঘটেছে সেটা সত্যিই প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১, ৯০ আজ অনেকের কাছে গল্প, অনেকের কাছে স্মৃতি আর নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস, যে ইতিহাসকে আমরা দেখতে পাই আলোকচিত্রের মাধ্যমে। ইতিহাসকে তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দেশের গৌরব অর্জনের ক্ষেত্রেও আলোকচিত্রীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আলোর সেই শিল্পীরা কতটুকু আলোকিত হতে পেরেছে আমরা জানি না...

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হলেও বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে খুব ভালভাবে জড়িয়ে আছে আলোকচিত্র; সেটা স্মৃতি ধরে রাখার জন্য হোক, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য হোক, ইতিহাস সমৃদ্ধ করার জন্য হোক কিংবা নিজেদের পরিচয় বহন করার জন্যই হোক। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে ভাবনার জায়গায় আমাদের অবস্থান কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর বের করার কিছুটা প্রয়াস এই আলোকচিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি নবীন প্রজন্মের আলোকচিত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি আর মেধা বিকাশের একটি সুযোগ তৈরি করা। একই সাথে এদেশের সমৃদ্ধ আলোকচিত্রের ইতিহাসকে অনুভব করে ভবিষ্যতে সঠিক দিকনির্দেশনায় পথ চলার প্রেরণা থেকেই এ আলোকচিত্র উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসবে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আলোকচিত্র জগতের সকল ক্ষেত্রের আলোকচিত্রীদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমরা কৃতজ্ঞ। এছাড়াও এক্ষেত্রের বাইরের মানুষদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছে সবসময়।

আয়োজনের দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় সুযোগ হয়েছিল দেশের আলোকচিত্র শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার। অনুধাবন করতে পারি এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা, আলোকচিত্রীদের নানা বাধ্যবাধকতা, সংকট, আলোকচিত্রীদের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের হতাশা..... সর্বোপরি খুব অভাব বোধ করি যে শিল্পটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি এনে দিয়েছে সেই আলোকচিত্র শিল্পের একটি ফেডারেশন এবং সে শিল্পের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার।

আয়োজনের কর্মপরিধি নিয়ে কথা বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সংগঠনের সদস্যদের বিরতিহীন পরিশ্রম, উৎসাহ, সাহস আর আলোকচিত্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকেই এ উৎসবের আয়োজন এবং তার বাস্তবায়ন। গুরুটা কেটেছে অনেক শঙ্কার মধ্যে। হতাশার বিপরীতে উৎসাহের রসদ সরবরাহ করেছেন আলোকচিত্র জগতের অনেক নবীন ও প্রবীণ আলোকচিত্রী। আলোকচিত্রের প্রতি তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উৎসবের আগুনের দিকে ছুটেছি আমরা, সাক্ষাৎকার, আলোকচিত্র নিয়ে বিভিন্ন লেখা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে শুধু উৎসাহ দেননি সেইসব আলোকচিত্রী, দিয়েছেন অনেক দিকনির্দেশনাও। আনোয়ার হোসেন, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন, শহিদুল আলম, শফিকুল আলম কিরণ, সাইফুল হক অমি, এস. কে. এনামুল হক, জিয়া ইসলাম, ফিরোজ চৌধুরী, আবীর আব্দুল্লাহ, দীন মোহাম্মদ শিবলী, শাহাদাত পারভেজ, শোয়েব ফারুকী সহ যাদের নাম এই মুহূর্তে স্মরণে নেই তাদের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মাহবুব জামান ভাইয়ের প্রতি আর আলোকচিত্র জগতের বাইরের যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংশয়বাদীদের।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির ঘন্টা পেরিয়ে সংগঠনের ছুটে আসা সহকর্মীদের পরিশ্রম, উৎসাহ আর সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের বিরতিহীন প্রচেষ্টার ফসল আপনাদের হাতে তুলে দেয়া এই প্রকাশনা। যার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়ার দায়ভার আপনাদের কাছেই সমর্পণ করছি।



ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি জেনে অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) খুব শীঘ্রই তাদের প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২ আয়োজন করতে যাচ্ছে। আলোকচিত্র শিল্প, শিল্পের একটি বড় অংশ। আজকের বিশ্বের তরুণ সমাজ এই আলোকচিত্র শিল্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে এবং তারা তাদের ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো ফ্রেমে আবদ্ধ করছে। তারা শুধুই অসাধারণ ছবিগুলো তুলছে না, তারা আমাদের সমাজের সমস্যা ও ভুলগুলো তুলে ধরছে, তারা একতাবদ্ধ হয়ে সবদিক থেকেই আমাদের সমাজের মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করছে। আর যেহেতু এইবার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনটি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকছে এবং অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর পাশাপাশি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। তাই আমি আশাবাদী এই আলোকচিত্র উৎসব থেকে তারা অনেক উপকৃত হবে।

আমি আশা করি ডিইউপিএস এর এই প্রচেষ্টা নতুন শিক্ষার্থী আলোকচিত্র শিল্পীদের জন্য একটা ভালো সুযোগ তৈরি করে দেবে। আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে, বাংলাদেশের এই তরুণ মেধাগুলো অনুসন্ধানের জন্য ডিইউপিএস এর কার্যক্রমে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। আমি আরো ধন্যবাদ জানাই সেই সব প্রতিষ্ঠানকে যারা ডিইউপিএস এর এই কার্যক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আশা করছি, প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ২০১২ সফল হবে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবে।



ড. নাসরীন আহমাদ

মাননীয় প্রো-উপাচার্য(শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” এর আয়োজন করেছে। সমকালীন তরুণদের মধ্যে আলোকচিত্র একটি অত্যন্ত সফল শিল্পমাধ্যম এবং এই উৎসব আয়োজনের ফলে অনেক শিক্ষানবিশ সৌবিন আলোকচিত্রী পাচ্ছে তাদের আলোকচিত্র প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করার সুযোগ।

এটা খুবই আশার বিষয় যে এই প্রথমবারের মতো সারা দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। দেশের সকল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের আলোকচিত্র বিষয়ে ধারণা সুদূরপ্রসারী করতে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। আমি এই আয়োজনের সহযোগী হিসেবে শিল্পকলা একাডেমীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানে সমূহকে।

“১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” সফল ও সার্থক হোক এবং ডিইউপিএস এর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আলোকচিত্রীরা বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি “ডিইউপিএস” ও “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” এর সর্বস্বীন সাফল্য কামনা করি।



অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন

মাননীয় প্রো-উপাচার্য(প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) আয়োজিত “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সারা দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ ধরনের উৎসব এটিই প্রথম। ডিইউপিএস এর এ ধরনের আয়োজন সারাদেশের শিক্ষার্থীদের আলোকচিত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আলোকচিত্রকে দেশের সকল শিক্ষার্থীদের কাছে আগ্রহের বিষয়ে পরিণত করতে এই উৎসব অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ছাত্রছাত্রীরা আলোকচিত্রের উন্নয়নের সাথে সাথে নিজেদের চিন্তা চেতনার উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। ডিইউপিএস এর আয়োজনে “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে ভাল মানের আলোকচিত্রী বেরিয়ে আসবে বলে আমি মনে করি।

“ডিইউপিএস” ও “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” এর সর্বদীন সাফল্য কামনা করি।



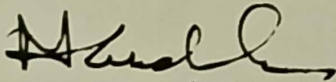
অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন

মাননীয় কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরম আনন্দের সংবাদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) গৌরব ও সাফল্যের সাথে একযুগ অতিক্রম করেছে। আমি আরো আনন্দিত হয়েছি, ডিইউপিএস তাদের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে সারা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে আয়োজন করেছে তাদের “প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২”। আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, কর্মশালা এবং ডিইউপিএস এর বাৎসরিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর সমন্বয়ে এ উৎসবের সফলতা কামনা করি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) এর দীর্ঘ এক যুগের সুনাম রয়েছে দক্ষতা অর্জনে সহায়তাকারী আলোকচিত্রের নানান অনুষ্ঠান আয়োজনের। আমি আশা করছি “প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” সারা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগাবে একজন সফল আলোকচিত্রী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

আমি প্রত্যাশা করছি, ডিইউপিএস একটি সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে পারবে। প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।


11/9/12



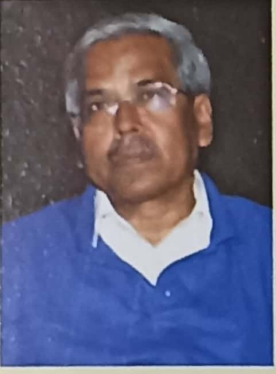
ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উপদেষ্টা, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

তথ্য-প্রযুক্তি মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসার কারণে ছবি তোলা আজকের দিনে অনেকটাই সহজ। কিন্তু আলোকচিত্রের ভাষা অনুধাবন করা ও শেখার বিষয়। আলোকচিত্রের ভাষার নিজস্ব স্টাইল আছে। যা তৈরি হয় আলোকচিত্রীর চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। আলোকচিত্রীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের ছবির নিজস্ব ভাষানির্মাণ। এজন্য, তরুণ আলোকচিত্রীদের ছবি তোলার পাশাপাশি একজন সচেতন মানুষ হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরী।

আলোকচিত্র এবং তরুণ আলোকচিত্রীদের বিকাশের জন্য ডিইউপিএস সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের “১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব ২০১২” এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। আমি সংগঠন-টির একজন উপদেষ্টা হিসেবে তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই সপ্তাহব্যাপী এ উৎসবের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীসহ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি, আয়োজক ডিইউপিএস এর তরুণ আলোকচিত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠা এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

SAC



মাহবুব জামান

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেটা সফট
সাবেক জি.এস, ডাকসু

মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার সূতিকাগার এই বিদ্যাপীঠ। বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এ বিদ্যায়তনের ছাত্র-শিক্ষকরা। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় আলোকচিত্র চর্চার সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) আয়োজন করতে যাচ্ছে “ডেল-ডিইউপিএস ১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব’২০১২”।

সৃজনশীলতার বিকাশে এবং তরুণ প্রজন্মকে আলোকচিত্রের প্রতি উৎসাহিত করার এই প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই ডেলকে যাদের সহযোগিতায় এই উৎসব সার্বজনীন রূপ নিতে যাচ্ছে। চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক, ছিল নানা প্রতিকূলতা। তবে বাধা পেরিয়ে এই প্রজন্মের এই সাহসী উদ্যোগ সফল হোক।



Shafiqul Alam Kiron

Photographer, Map

Bangladesh is making quite a progress on international level and as a consequence the number of amateur photographers has increased drastically, which needless to say, is very positive. It is even more hopeful now for the young photographers because of the increasing number of workshops, seminars and photography courses offered to them at various institutions, universities and other cultural centers. For the first time ever Dhaka University Photographic Society (DUPS) is going to arrange the first national photography festival in 2012. This festival includes a photography competition amongst other universities. I am a member of the judge panel and I looked at the photos according to the six criteria – abstract, lifestyle, portrait, festival, landscape and my campus. The participants should always keep in mind that the submitted photos must belong to the chosen criteria, that is, the participant must have some idea about the photo he/she sends to a competition and the criteria that he/she chooses for that particular photo. As judges, we have judged each photo by a combination of the following attributes – content, message, composition, technical quality, emotion and etcetera. We hope we have selected the photographs which have most of these attributes. DUPS has started a trend which will encourage many more young photographers to go far in the future and also present ones who are being awarded. I hope DUPS keeps up the good work.

বিচারকদের মূল্যায়ন



আবির আব্দুল্লাহ

ফটোগ্রাফার, ইউরোপিয়ান প্রেস ফটো এজেন্সি, ঢাকা।

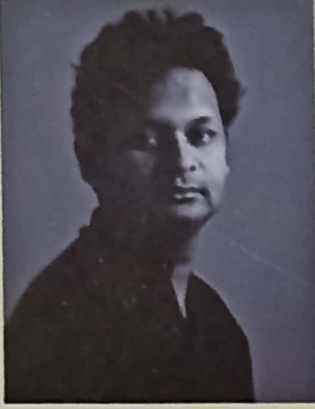
প্রত্যেক আলোকচিত্রীর দৃশ্যপট দেখা এবং তা ধারণ করার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। তেমনি ভাবে, ছবি বিচার বিশেষণ করা প্রত্যেক বিচারকের জন্য আলাদা। প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে ছবি বিশেষণ করেন। আর তাই ছবির বিচার কাজ কখনোই সহজ নয়। আরেকটি কথা হলো- প্রতিযোগিতার বিচার কাজ কখনোই সবাইকে খুশি করতে পারেনা এবং পারবেনা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি আয়োজিত ছবি প্রতিযোগিতা বিচারক হিসেবে আমরা চেষ্টা করেছি নতুন ছবির ভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে যেখানে একজন তরুণ আলোকচিত্রি কিভাবে ছবি নির্মাণের সময় তার চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা এবং নতুনত্বকে পুঁজি করে গতানুগতিক এবং 'অনেক দেখা' ছবিকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেছেন। কারণ আমি মনে করি, বিচারক শুধুমাত্র কিছু 'ফরমুলাইজড' ছবিকে পুরস্কার দিলে নতুন ছবি তৈরীর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তরুণ আলোকচিত্রীদের সেই জায়গা থেকে বের করে আনা বিচারকের অন্যতম দায়িত্ব। সেখানে নতুন ছবির ভঙ্গি এবং চিন্তাকে প্রধান্য দেওয়া এবং উৎসাহিত করার মাধ্যমে তরুণ আলোকচিত্রি এবং তাদের শিল্পকর্মকে স্বাগত জানানো।

ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে আমরা গতানুগতিক চিত্রটাই দেখতে পেয়েছি বেশি। সেইসাথে ছবি তোলা ধরণ বা উপস্থাপনায় ও তেমন উলেখযোগ্য চমক নেই। তাহলে কি আমাদের তরুণ আলোকচিত্রিরা একটি গভিতে আটকে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তরুণ আলোকচিত্রিদেরকে খুঁজতে হবে।

প্রযুক্তির বিস্ময়কর অবদানের কারনে এখন ছবি তোলা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু একটি ভালো ছবি তোলা আগের মতই কঠিন আর পুরস্কার পাওয়ার মতন ছবি তোলা আরো কঠিন। সুতরাং তরুণ আলোকচিত্রিদের শুধুমাত্র ফটোশপ টেকনিক দিয়ে চমক দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সৃষ্টিশীলতা আর চিন্তাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ছবি তোলা। আগামীতে তরুণ আলোকচিত্রিরা সেই চমকে দেয়ার মত ছবি তুলবে এবং আমাদেরকে দেখাবে এই প্রত্যাশায়।

আবির আব্দুল্লাহ



Saiful Huq Omi

Photographer
Teacher, Pathsala

It was a great experience judging the competition. The best part was the fact that both the photographers and the organizers were young, a sure sign of the bright future in the field of photography for Bangladesh.

Saiful Huq Omi.



দিন মোহাম্মদ শিবলী

শিক্ষক, পাঠশালা

আলোকচিত্র মূলত একজন আলোকচিত্রীর নিজস্ব অনুভবের বহিঃপ্রকাশ। তিনি যেভাবে প্রকৃতি থেকে তথ্য নেন এবং তার অতীতলব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের যে অর্থ করেন, তা একেবারেই তার নিজস্ব বিষয়। আলোকচিত্রের বিচারক হিসেবে ঐ পুরো বিষয়টি অনুপস্থিত হিসেবে বিবেচনায় নিতে হয়। কেননা তখন ঐ নির্দিষ্ট ছবির পাশে অনুভবের বর্ণনা দিতে আলোকচিত্রী উপস্থিত থাকবেন না। ফলে ছবি বিচারে আমাদেরকে গুরুত্ব দিতেই হয় এর কারিগরি দিককে। আলোর ব্যবহার, দেখার পারসাপেকটিভ, কম্পোজিশনের নানান উপাদানের সুসঙ্গত ব্যবহার, ছবির মুহূর্ত বিবেচনা ইত্যাদিই ছবি বিচারের প্রধান বিষয়। এবারের আয়োজন প্রথম হিসেবে স্বল্প পরিসরে হচ্ছে বলে মনে হয়। ধারণা করেছিলাম ছবির নদীতে হাবুডুবু খাবো। ঠিক ততটা হয়নি। ছবির মান বৃদ্ধিতে ডিইউপিএসকে আরো সক্রিয় হতেই হবে। আমরা সহযোগিতা করবো বলে কথা দিয়েছিলাম যেটি বলবৎ রয়েছে এখনো। সকলের মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করছি।

Din Mohammad Shibli



Mahfuzul Hasan Rana

EFIAP, ESFIAP

In today's world, photography as a medium of information and communication represents the most popular act of registering and forwarding informative, documentary or expressively, artistically focused visual information and messages. The very same path that leads to expressive photography has expanded dramatically in the last few years, following the emergence of digital photography and creative capabilities of sophisticated computer editing of each photograph individually into an ideal aesthetic integrity. Like this, DUPS 1st photo Festival 2012 created for enjoyment and satisfaction of all students fond of an art which patentizes for its technique and its thematic deep root with everything we call culture. Different subject has made up a quite explicit incentive and has attained its effect upon encouraging a great quantity of photographers from all universities around the country and thus we can have today among a wonderful selection.

All the selected photographs represent good photographic quality with subject matter and demonstrate every individual's predisposition to combining the world, which surrounds them in the form of specific motifs with their spiritual and creative power. Technical flawlessness, the correspondence of the motif with the prescribed subjects a harmony between form, color, tonality, pattern and composition, the originality, interdependence between detail and the whole and vice versa. According to the good quality of the selected photographs, I express my sincere congratulations to all exhibited authors and winners of awards.



এস কে হিঙ্গাই হক

চীফ ফটো জার্নালিস্ট, দি ডেইলি স্টার

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি(ডিইউপিএস) আয়োজিত দেশব্যাপি ফটোগ্রাফারদের ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর সমন্বয়ে এ উৎসবকে স্বাগত জানাই। আমার সুযোগ হয়েছিলো সেই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার কলেজ পর্যায়ের বিচারক হওয়ার। আমার সাথে বিচারক হিসেবে আরও ছিলেন প্রথম আলোর চীফ ফটোগ্রাফার জিয়া ইসলাম। ছবির বিচারকার্যের দিন জিয়া ইসলাম আসার এক ফাঁকে, পাশেই দেখলাম আরো তিনজন বিচারক মুনেম ওয়াসেফ, দীন মোহাম্মদ শিবলী আর রয়টার্সের এডু বিরাজ। যারা ঐ সময়ে অন্য একটি পর্যায়ের বিচারকার্য পরিচালনা করছিলেন। তাদের বিচারকার্যের দিকে একটু চোখ বুলালাম, তাতে দেখলাম অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি। এরপর মন ভরে ছবিগুলো একবার দেখে নিলাম। ছবি দেখে আমার মনে মনে একটু হিংসাই হলো যে, আমরা শুধু মারামারি কাটাকাটির ছবিই তুললাম, ওদের মতো বৈচিত্র্যময় ছবি কখনো তুললাম না। ততবধি জিয়া ইসলাম এসে পড়েছেন। তারপর গুরুত্ব করলাম কলেজ পর্যায়ের আমাদের ছবিগুলো বাছাইয়ের কাজ। আমাদের বিষয় ছিলো 'রূপসী বাংলা'। ছবির সংখ্যা ছিলো কয়েক শতাধিক। সেখান থেকে ত্রিশটি ছবি বাছাই হবে প্রদর্শনীর জন্য আর পুরস্কার পাবে মাত্র তিনটি ছবি। এতগুলো ভালো ছবি থেকে মাত্র তিনটি ছবি বাছাই করতে গিয়ে প্রায় সবগুলোই বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আমি সোসাইটিকে অনুরোধ করলাম, পরবর্তীতে যেন পুরস্কারের সংখ্যা বাড়ানো হয়। তা না হলে নতুন নতুন ফটোগ্রাফাররা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। যাই হোক, অনেক কষ্ট করে নিষ্ঠুরের মত, কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী সেরা তিনটি ছবি নির্বাচন করলাম। আমার মনে হয়েছে এই ফটোগ্রাফারগুলোকে যদি ঠিকঠাক মতো গাইড করা যায়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে অনেক ভালো করবে।

আলোর আঁকি আগামীর পৃথিবী

DOLL-DUPS

১ম জাতীয়
প্রাঙ্গণ
উৎসব '১২

■ ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ■

★ জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

★ ডিইউপিএস ৫ম বার্ষিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্র

★ সেমিনার

★ কর্মশালা

আলোয় আঁকি আগামী পৃথিবী

DOLL-DUPS

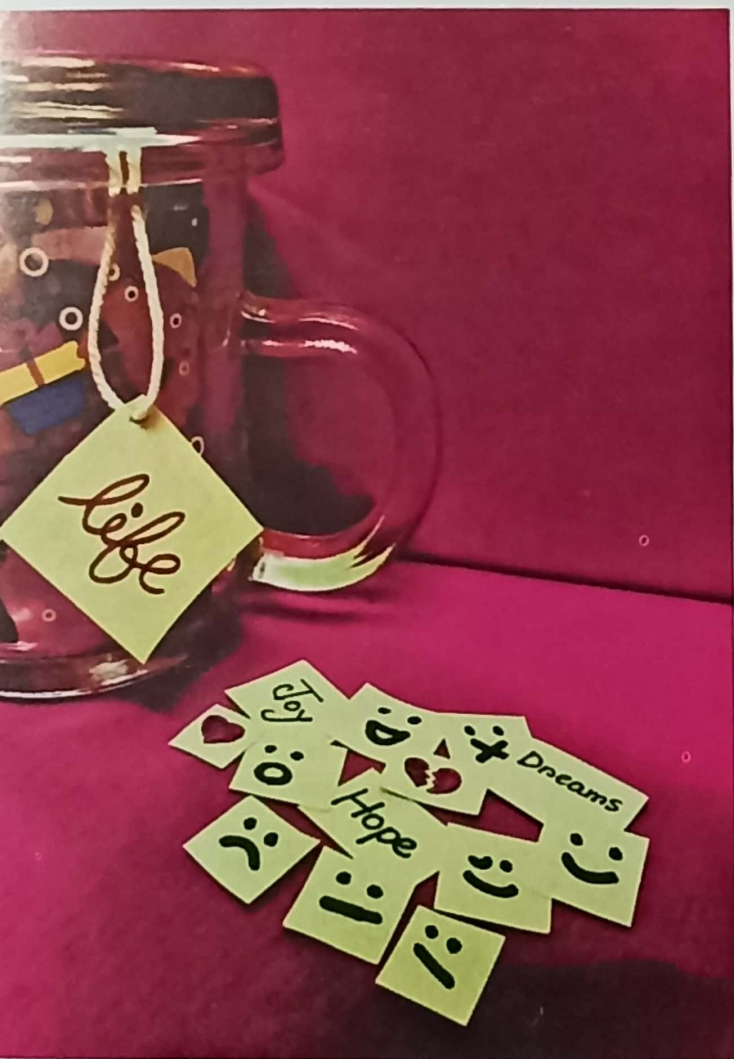
জাতীয়
আলোকচিত্র
উৎসব '১২
■ ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ■

জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

স্কুল

নির্বাচিত আলোকচিত্রীদের তালিকা

আলোকচিত্রী	প্রতিষ্ঠান	জেলা
শাহরিনা রহমান	উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঢাকা
ফাহিম আব্দুল্লাহ সাজিদ	ওয়ার্ল্ড এডুকেশন	ঢাকা
তাহসিন তাবাসুম	ভিকারুল্লিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ	ঢাকা
ইমতিয়াজ আহমেদ ফাহিম	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল	ঢাকা
মাহমুদুল হক ইভান	মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়	ঢাকা
মাসুদুল হাসান শাকিল	অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল	ঢাকা
তানভীর আহমেদ	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল	ঢাকা
অশ্রান সিনহা	সানিডেল	ঢাকা
ফাহিম হাসান	যশোর জিলা স্কুল	যশোর
ফায়রুজ সাজিদ আল আমিন	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঢাকা
নোশিন সাইয়ারা চৌধুরী অদ্রি	এ.জি.চার্চ স্কুল	ঢাকা
নাসিবা আহমেদ পরমা	এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ	ঢাকা
ফার্জানা বিনতে মঞ্জু	বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ময়মনসিংহ
সামিউন ফাতীহা	এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ	ঢাকা
ক্রিনটন চাক্মা	কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়	খাগড়াছড়ি
ফাহিমদা বিনতে হোসেন মাহিম	বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	টাঙ্গাইল
অদিতি সবুর	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ঢাকা
আয়েশা সিদ্দিকা অর্না	প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ	
	রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ	মুন্সিগঞ্জ
মহুয়া মৌলী	সিদ্দিক'স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল	ঢাকা



১ম | শাহরিনা রহমান



২য় | ফাহিম আব্দুল্লাহ সাজিদ



৩য় | তাহসিন তাবাস্‌সুম



ইমতিয়াজ আহমেদ ফাহিম



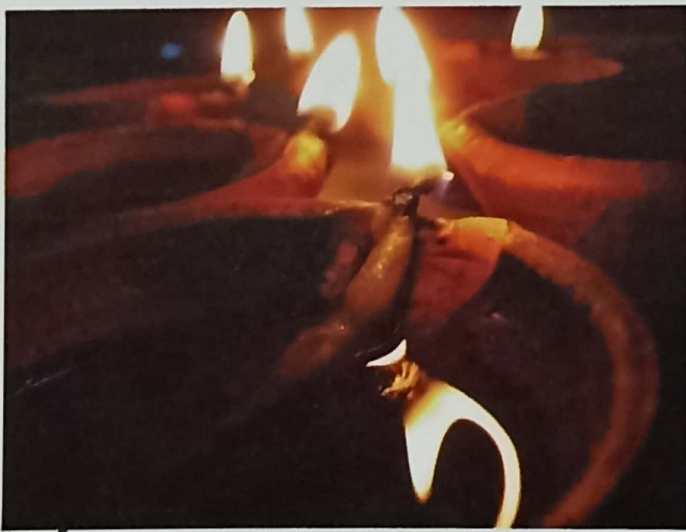
মাহমুদুল হক ইভান



মাসুদুল হাসান শাকিল



তানভীর আহমেদ



অম্লান সিনহা



ফাহিম হাসান



ফায়রুজ সাজিদ আল আমিন



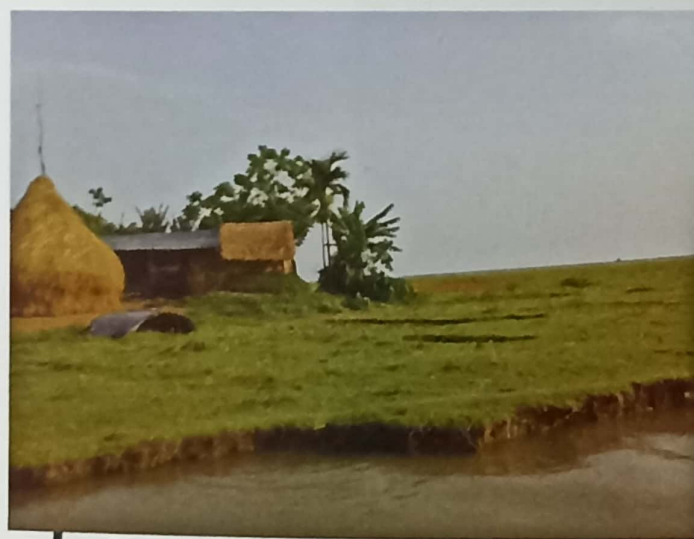
নওশীন সাইয়ারা চৌধুরী অদ্রি



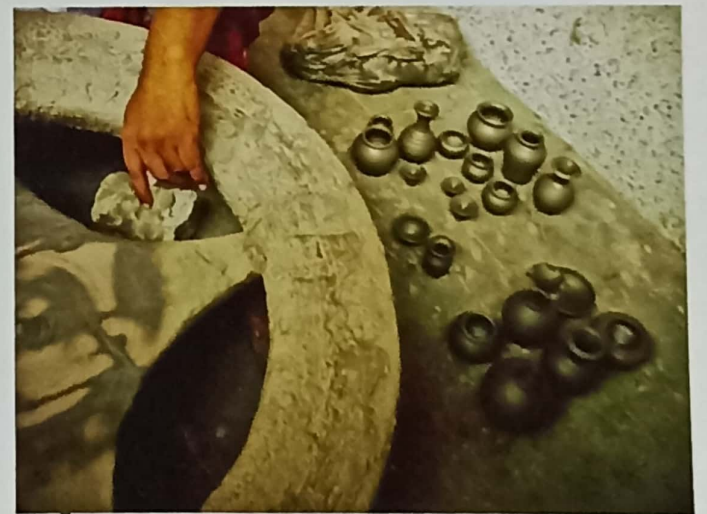
নাসিবা আহমেদ পরমা



ফারজানা বিনতে মঞ্জু



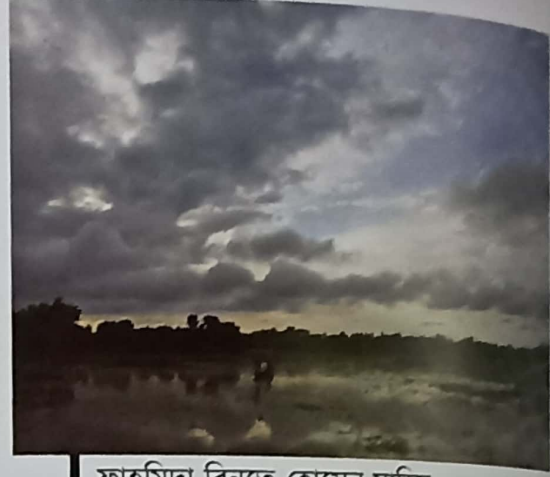
সামিউন ফাতীহা



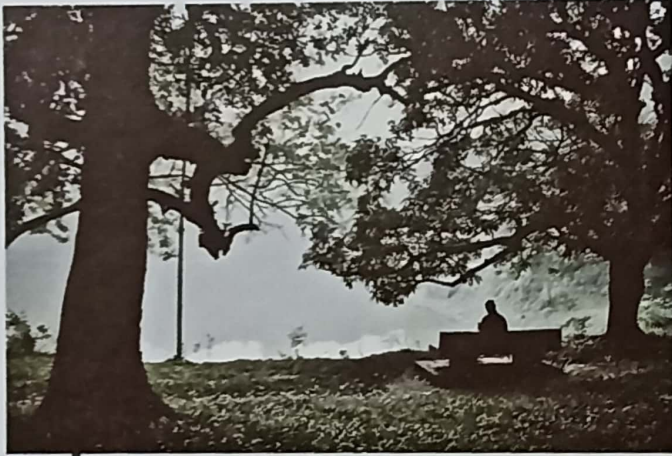
মহুয়া মৌলী



ক্লিনটন চাক্‌মা



ফাহিমদা বিনতে হোসেন মাহিম



ফাহিম আব্দুল্লাহ সাজিদ



অদিতি সবুর



আয়েশা সিদ্দিকা অর্না

জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

কলেজ

নির্বাচিত আলোকচিত্রীদের তালিকা

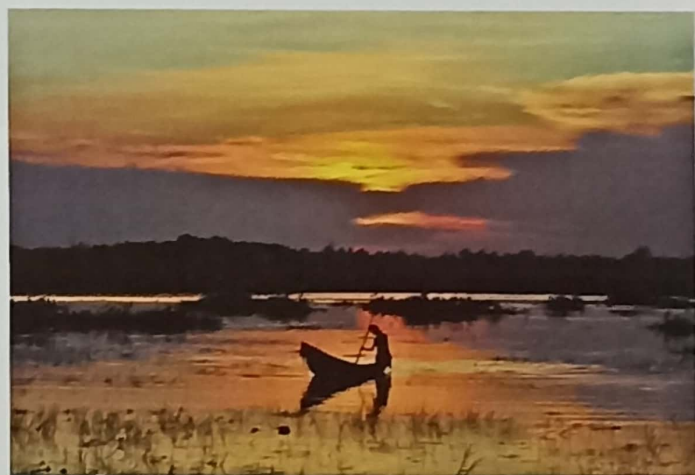
আলোকচিত্রী	প্রতিষ্ঠান	জেলা
মো:আতা ইসলাম খান মজলিস	বৃটিশ কাউন্সিল	ঢাকা
খান মো: জিয়াউস শাম্‌স	নটরডেম কলেজ	ঢাকা
ইশরার জায়ান	আইডিয়াল কলেজ	ঢাকা
মো:তৌফিক উদ্দীন	হাজেরা-তাজু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	চট্টগ্রাম
রিজওয়ান হাসান	ঢাকা কলেজ	ঢাকা
এ বি এম নাদিম পারভেজ	বগুড়া ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	বগুড়া
আপুন্নাহ আল জুহাইফা	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ	ঢাকা
এমদাদুল হায়দার	অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল	ঢাকা
আতিয়া আফরিন জেরিন	সরকারী আজিজুল হক কলেজ	বগুড়া
মো: আবিদুর রহমান	যমুনা সার কারখানা কলেজ	জামালপুর
ছাইফুর রহমান	নটরডেম কলেজ	ঢাকা
মো:সাজিদ বিন আশরাফ সামি	আররিবস ইন্টারন্যাশনাল কলেজ	নারায়ণগঞ্জ
শুভ কুমার নাথ	শহীদ এন এম এস জে কলেজ	চট্টগ্রাম
মো: পাভেল মাহাবুব	রিকাবি বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	মুন্সিগঞ্জ
আরমান হোসাইন মজুমদার	হিমালি বোর্ডিং স্কুল	দার্জিলিং
সুদীপ্ত জামান	বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ	ঢাকা
শাফকাত আমিন	নটরডেম কলেজ	ঢাকা
মো: প্রান্ত আনন্দময়	বুয়েট কলেজ	ঢাকা
মো: রাকিবুল ইসলাম	মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ	টাঙ্গাইল
তৌফিকুল হাসান	ক্যামব্রিয়ান কলেজ	ঢাকা



১ম | মো: আতা ইসলাম খান মজলিস



২য় | খান মো: জিয়াউস শাম্‌স



৩য় | ইশরার জায়ান



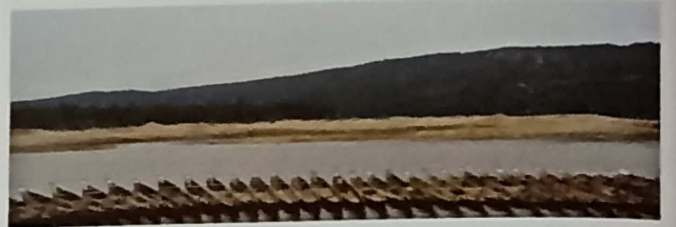
আতিয়া আফরিন জেরিন



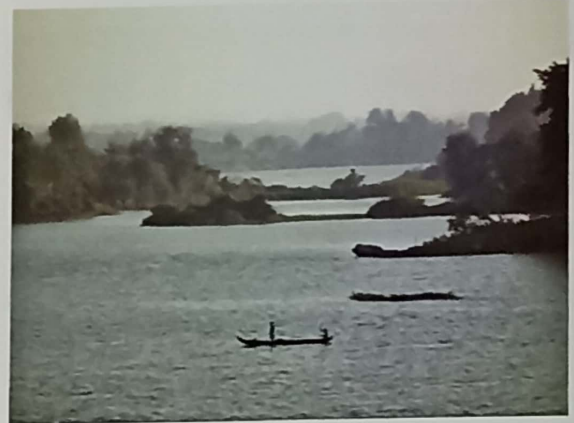
মো: আবিদুর রহমান



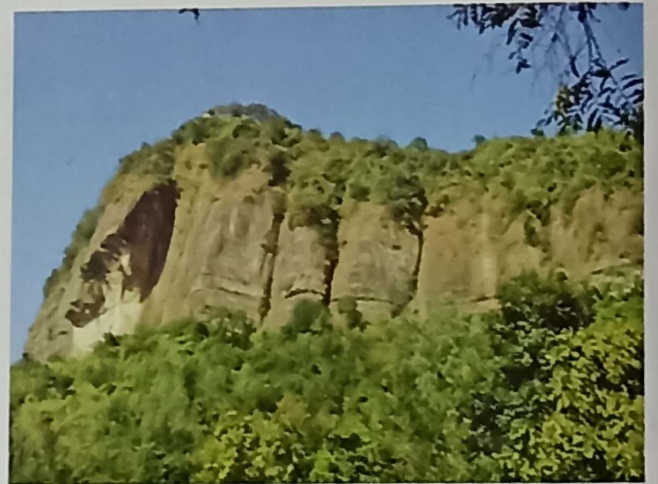
মো: সাজিদ বিন আশরাফ সামি



ছাইফুর রহমান



মো: সাজিদ বিন আশরাফ সামি



শুভ কুমার নাথ



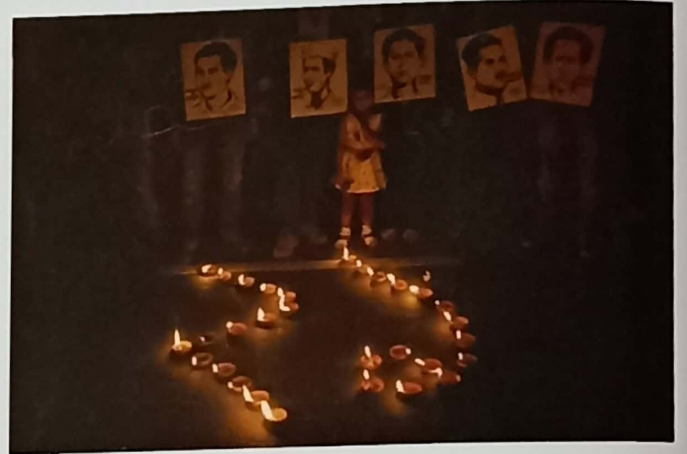
ইশরার জায়ান



রিজওয়ান হাসান



ইশরার জায়ান



রিজওয়ান হাসান



মো: তৌফিক উদ্দীন



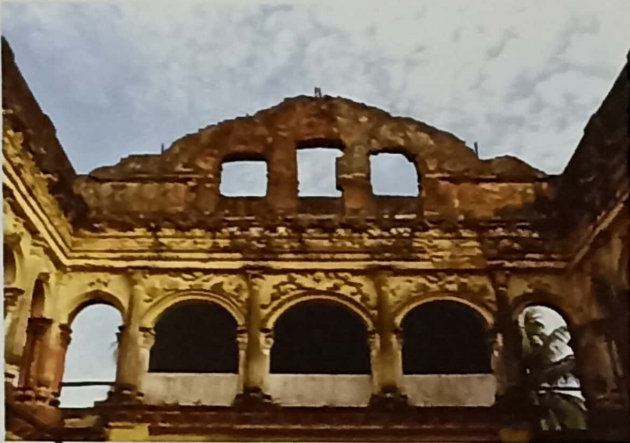
এ বি এম নাদিম পারভেজ



এ বি এম নাদিম পারভেজ



তৌফিকুল হাসান



আব্দুল্লাহ আল জোহাইফা



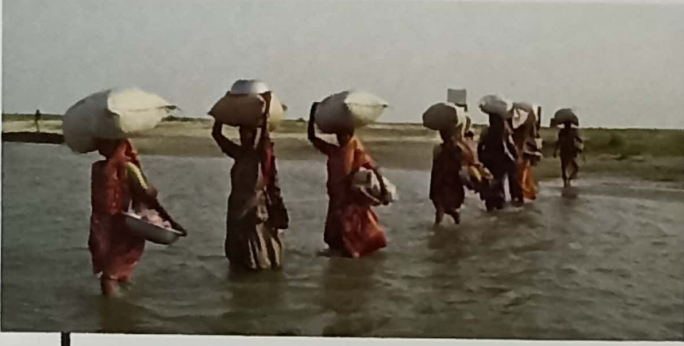
তৌফিকুল হাসান



মো:আতা ইসলাম খান মজলিস



এমদাদুল হায়দার



মো: পাভেল মাহাবুব



শাফকাত আমীন



আরমান হোসাইন মজুমদার



প্রান্ত আনন্দময়



সুদীপ্ত জামান



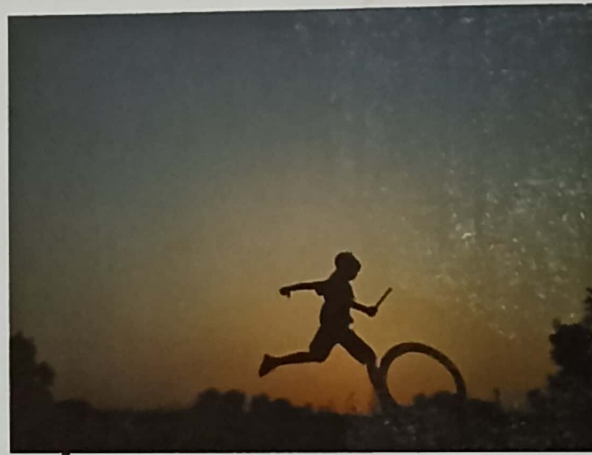
প্রান্ত আনন্দময়



খান মো: জিয়াউস শাম্‌স



মো: রাকিবুল ইসলাম



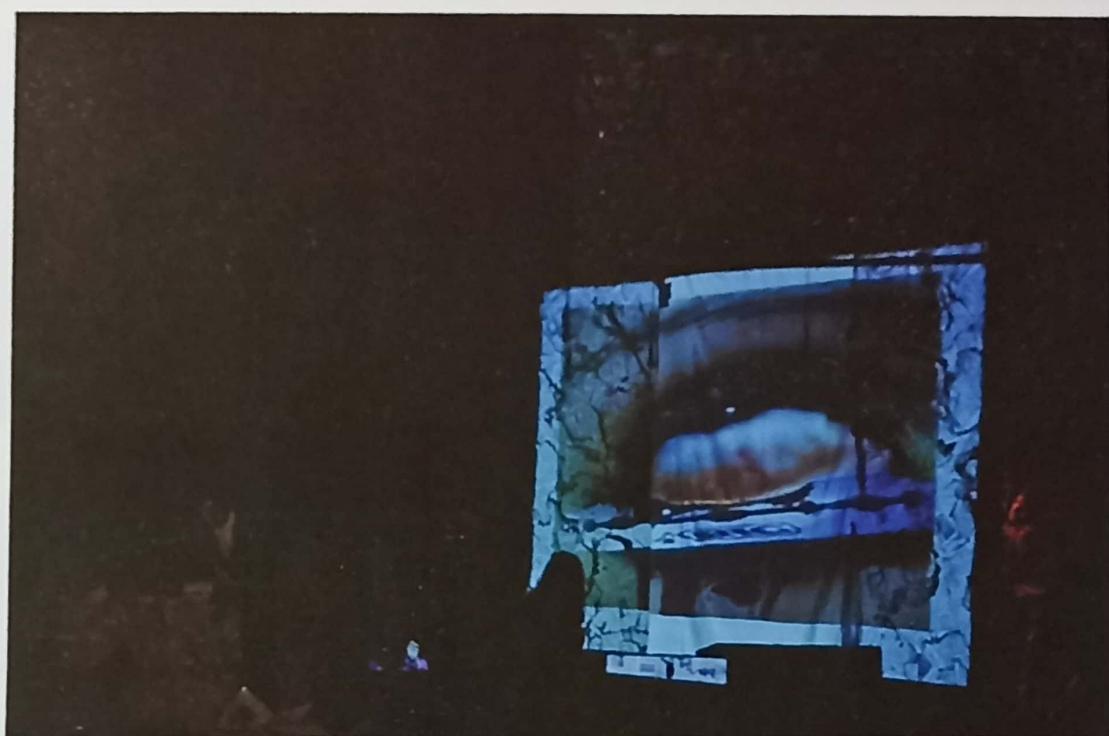
মো: রাকিবুল ইসলাম

জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাচিত আলোকচিত্রীদের তালিকা

আলোকচিত্রী	প্রতিষ্ঠান	জেলা
তারিক ইব্রাহীম সজীব	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
টি.এম.নাফিজুল ইসলাম রিজেন	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
ফাহিম হোসেন চৌধুরী	কুয়েট	খুলনা
এ.বি.এম রাকিবুল হক	শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়	সিলেট
দেবশীষ চন্দ	ইউএপি	ঢাকা
চৌধুরী আকিব ইশরাক হোসেন	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
মনিরুজ্জামান সুমন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
কায়সার আহমেদ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
নাজেম সাকিব সানী	শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
তওসীফ মোহাম্মদ	আইইউটি	গাজীপুর
তাসমিয়া তাজিন সিদ্দিকী	নিউ ক্যাসেল ল' একাডেমী	ঢাকা
দর্শন চাকমা	ইউ আই ইউ	ঢাকা
সাইফুল ইসলাম রনি	পাঠশালা	ঢাকা
মো: ইশতিয়াক মাহমুদ	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
মোহাম্মদ হাসান মুরাদ	হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ	চট্টগ্রাম
মাশরুর সাফাত নিটোল	কুয়েট	খুলনা
মোস্তাফিজুর রহমান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
খন্দকার মাহমুদ আরশীন আনান	এক্সটেরিয়র-ইন্টেরিয়র প্রাইভেট লিমিটেড	ঢাকা
এস.এম.অনীক জামান	সিসকো ভ্যালি	ঢাকা
অনিক পালিত	ইউ এস টি	চট্টগ্রাম
শেখ মেহেদী মোর্শেদ	ইউল্যাব	ঢাকা
মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম	এসিসিএ	চট্টগ্রাম
মো: আদনান বিন শামসুদ্দিন	ইউআইইউ	ঢাকা
আবু মো: খালেদুল কবির	ইউল্যাব	ঢাকা
ডমিনিক এস. হালদার	পাঠশালা	ঢাকা
জোয়াহের মুসাভভির	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
সুমন মৈত্র	ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
রিফায়াত জাবির খান	এআইইউবি	ঢাকা
নিগার সুলতানা	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
মো: ইমরোজ রাসেল	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
তাহরীম রুমান কবির	শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
মো:আহকামুল ইসলাম	এইউএসটি	ঢাকা
হুদয় খান	বুয়েট	ঢাকা
সাদমান শহীদ	পাঠশালা	ঢাকা
জাভেদ মিয়াদাদ	বুয়েট	ঢাকা
মো: মাহির রাশেদ	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী	বুয়েট	ঢাকা
আল মাহমুদ বাধন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা
নাজিয়া তাহসীন	ইডেন মহিলা কলেজ	ঢাকা
রাহুল তালুকদার	পাঠশালা	ঢাকা
তাহরীম রুমান কবির	শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি	ঢাকা
শাকিল মাহবুব হোসেন	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সিলেট
সুমন মল্লিক	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	খুলনা
সাইয়িদা ফাতিমা জাহান দিবা	সরকারি মহিলা কলেজ	চট্টগ্রাম
ফয়সাল কবির	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	রাজশাহী



১ম | তারিক ইব্রাহিম সজীব



২য় | মো: ফাহিম হোসেন চৌধুরী



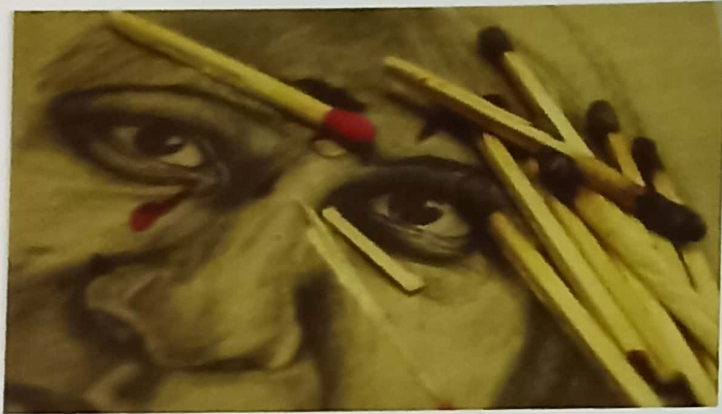
৩য় | মো: ফাহিম হোসেন চৌধুরী



টি. এম. নাফিউল ইসলাম রিজন



কায়সার আহমেদ



এ. বি. এম. রাফিকুল হক



তওসীফ মোহাম্মদ



দেবশীষ চন্দ



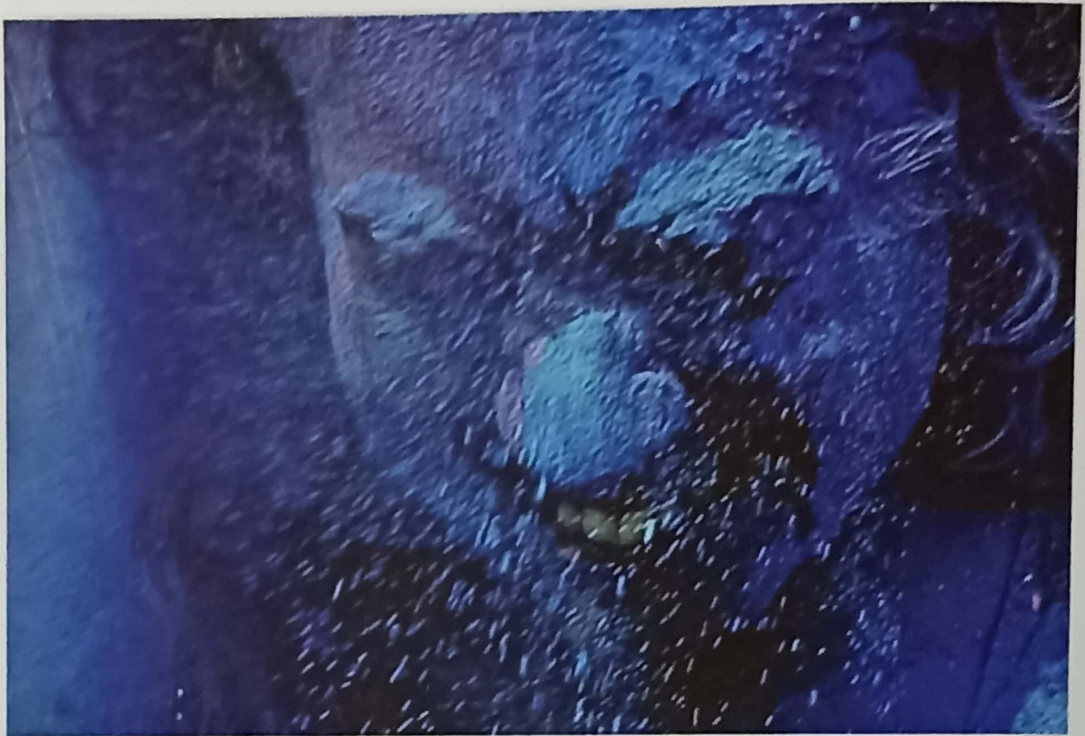
মনিরুজ্জমান সুমন



নাজেম সাকিব সানী



চৌধুরী অকিব ইশরাক হোসেন



১ম | তাসমিয়া তাজিন সিদ্দিকী



২য় | সাইফুল ইসলাম রনি



৩য় | দর্শন চাকমা



রাহুল তালুকদার



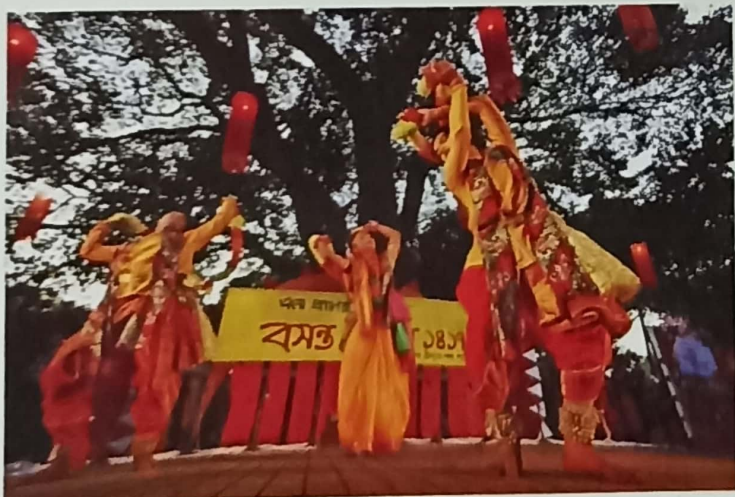
টি. এম. নাফিউল ইসলাম রিজল



মোঃ ইশতিয়াক মাহমুদ



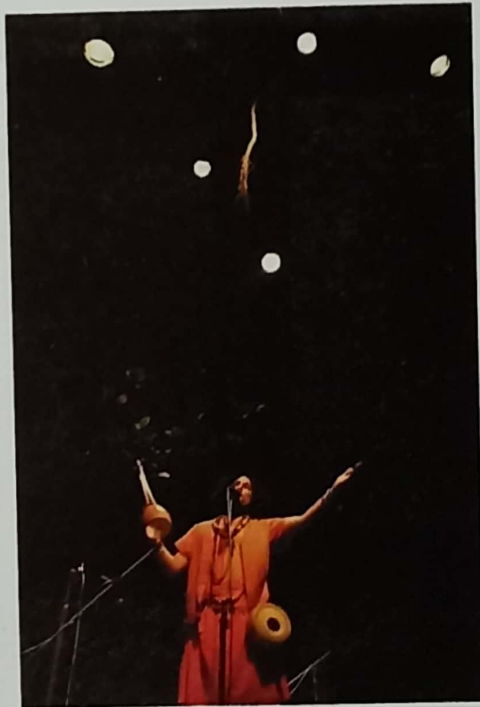
মোস্তাফিজুর রহমান



মাশরুর সাফাত নিটোল



মোঃ হাসান মুরাদ



সাইফুল ইসলাম রনি



১ম | খন্দকার মাহমুদ আরশীন আনান



২য় | এস. এম. অনীক জামান



৩য় | মো: হাসান মুরাদ



শেখ মোহেদী মোর্শেদ



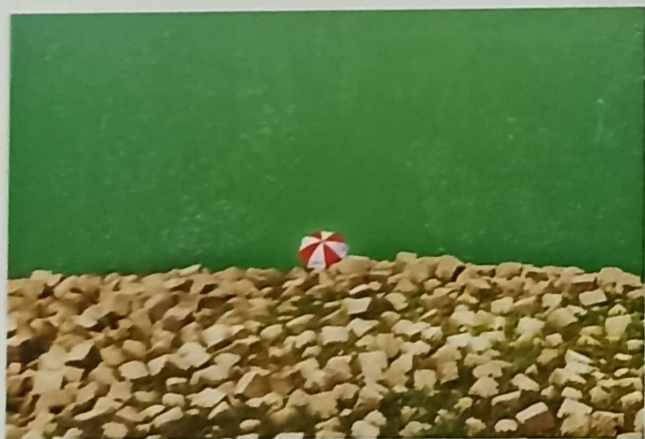
মো: হাসান মুরাদ



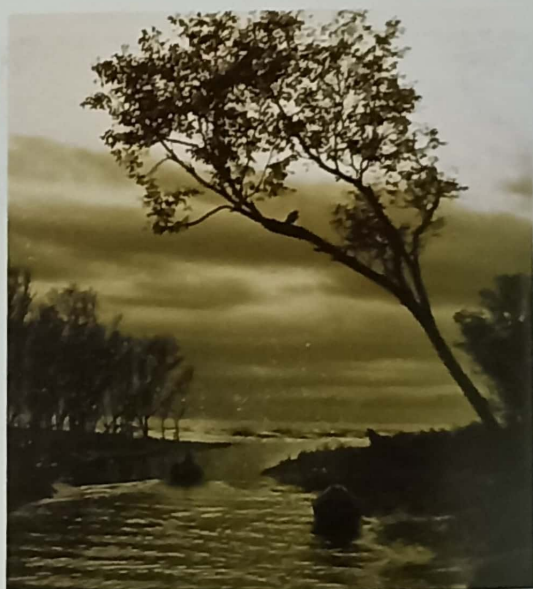
হৃদয় বান



মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম



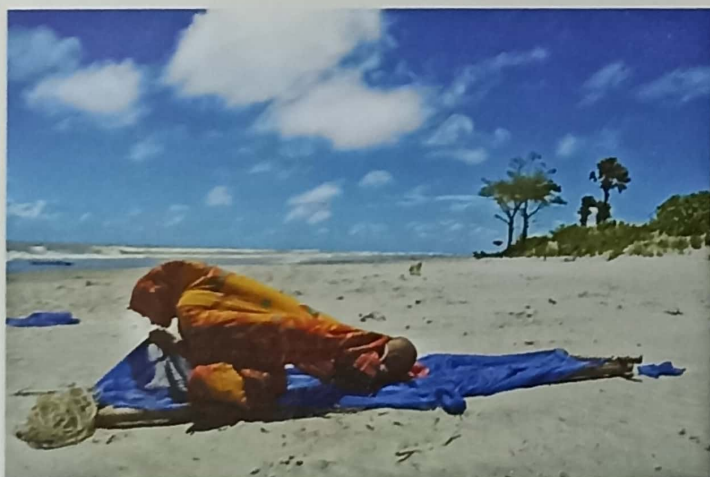
মো: কয়সাল কবির



অনিক পালিত



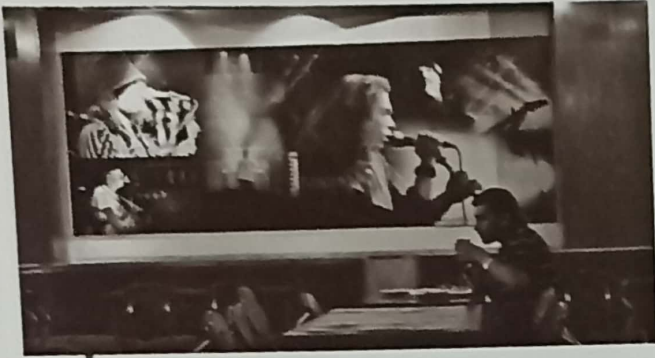
১ম | মোঃ আদনান বিন সামসুদ্দিন



২য় | মোঃ ফাহিম হোসেন চৌধুরী



৩য় | জোয়াহের মুসাভভির



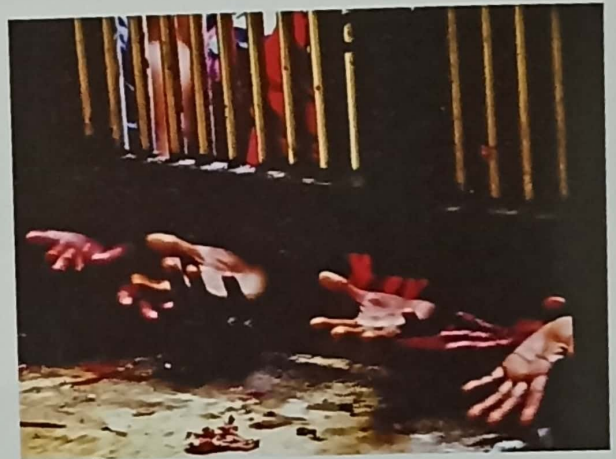
আবু মোঃ খালেদুল কবির



সুমন মৈত্র



ভূমিনিক এস হালদার



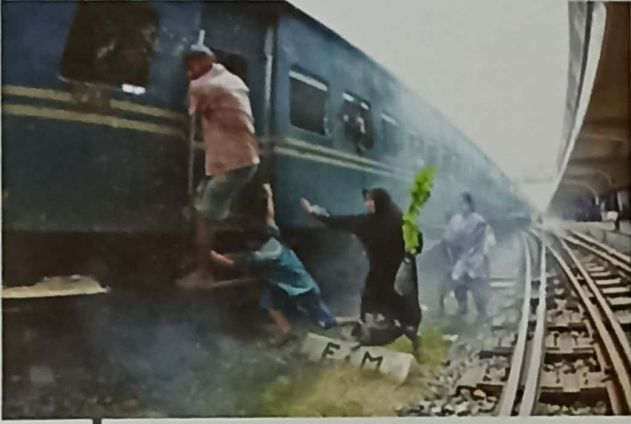
নিগার সুলতানা



সুমন মৈত্র



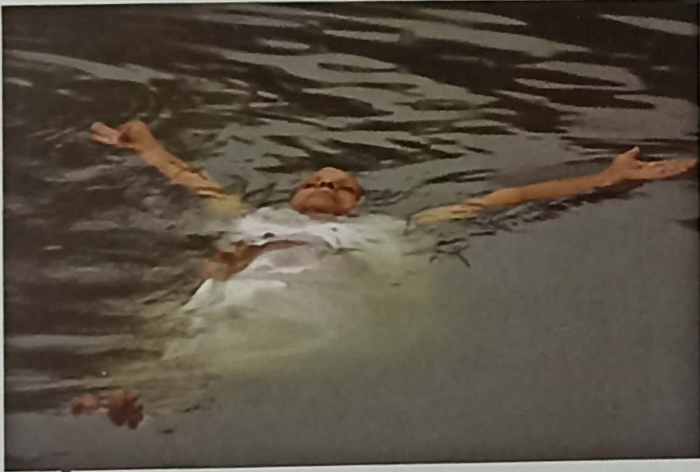
তাহরীম রুশ্মান কবির



রিফায়াত জাবির খান



হৃদয় খান



মোঃ ইমরোজ রাসেল



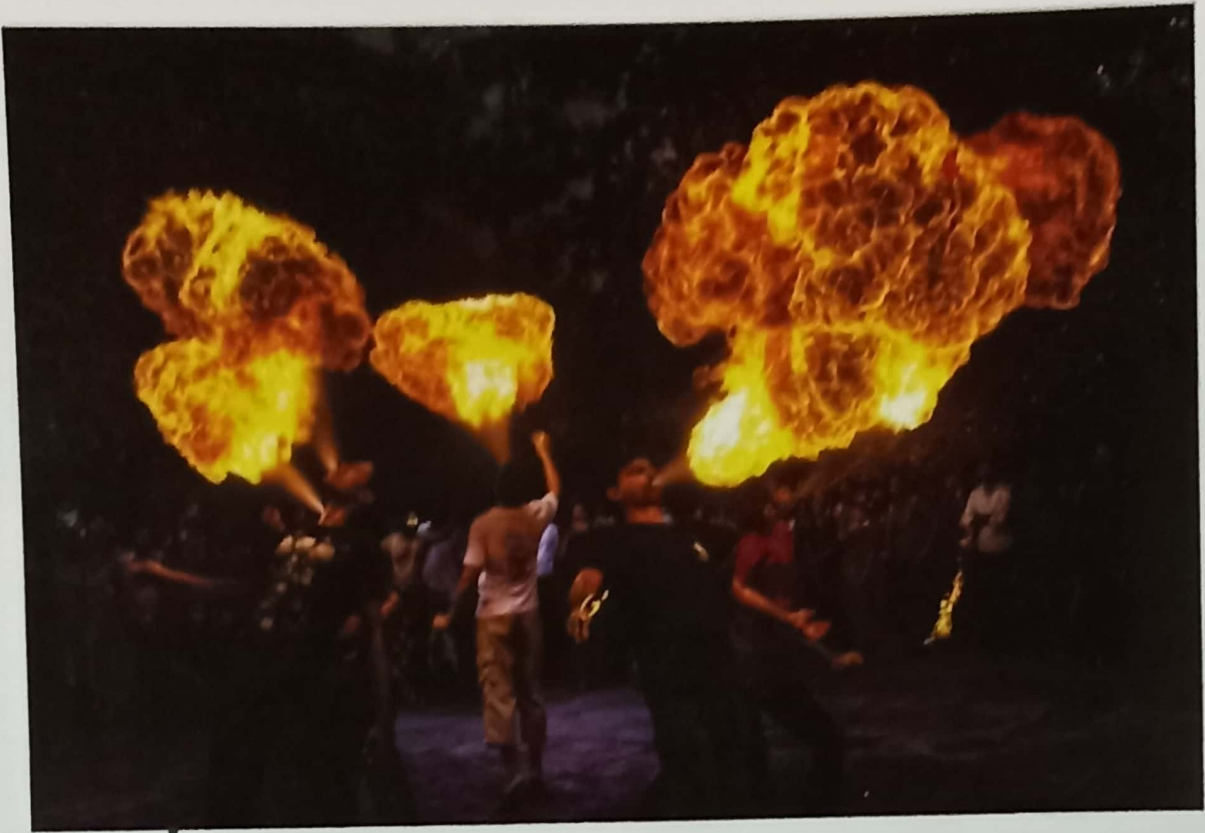
সাদমান শহীদ



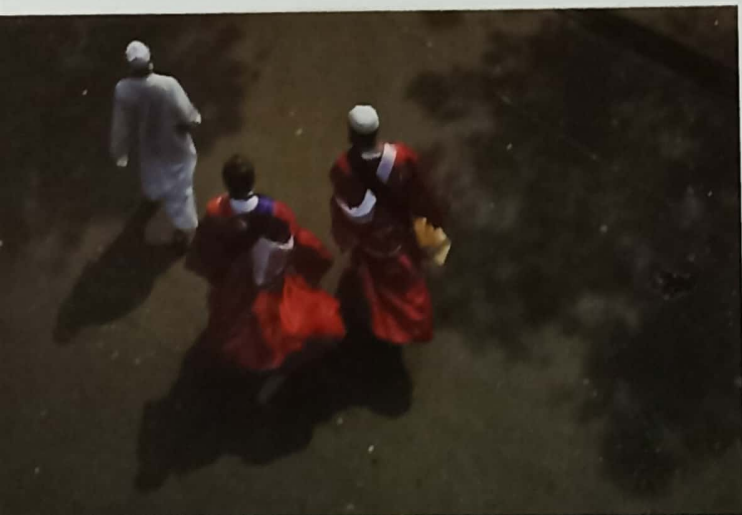
মোঃ আহকামুল ইসলাম



রাহুল তালুকদার



১ম | জাভেদ মিয়াদাদ



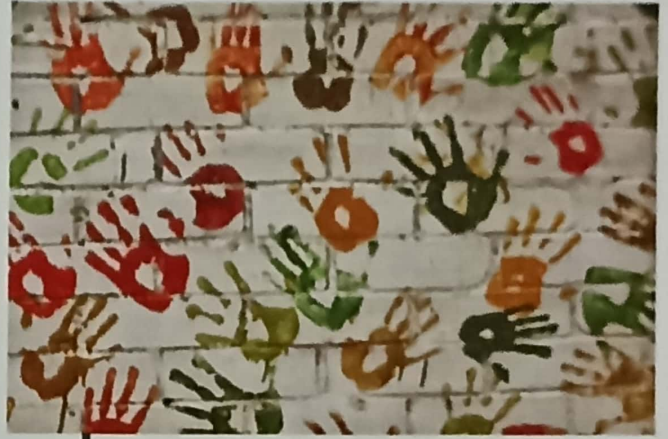
২য় | তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী



৩য় | মোঃ মাহির রাশেদ



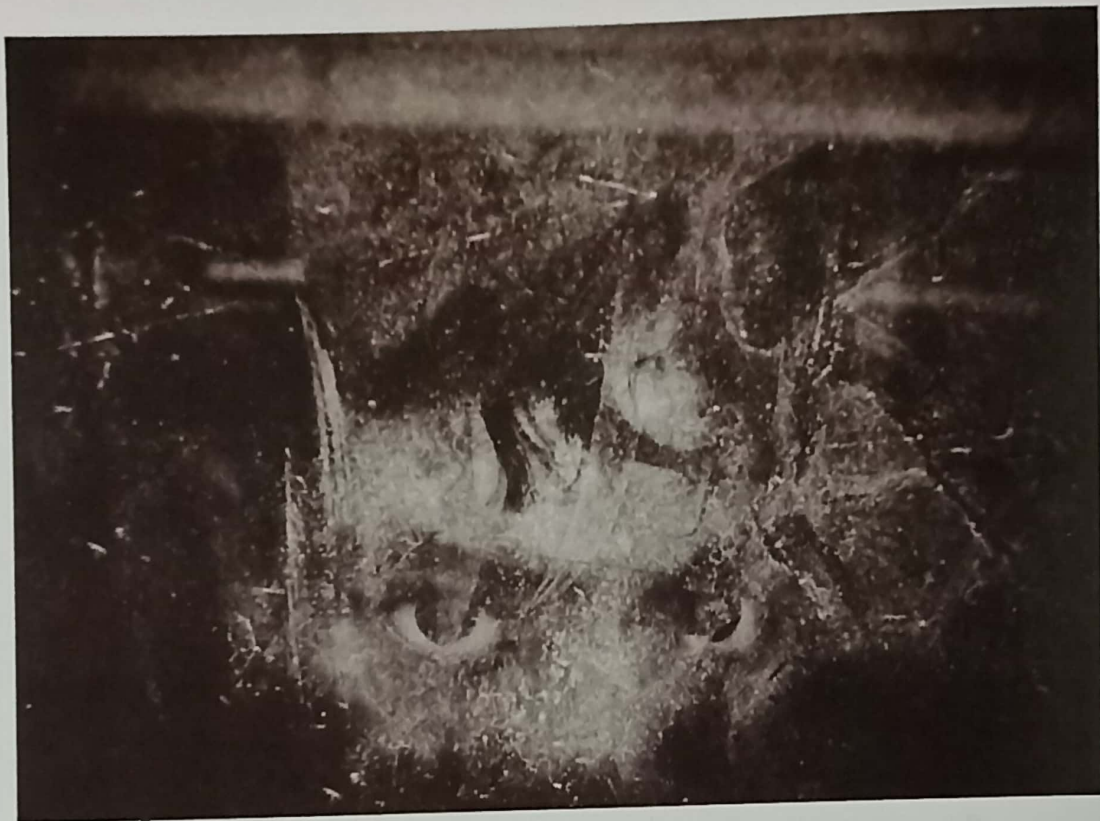
তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী



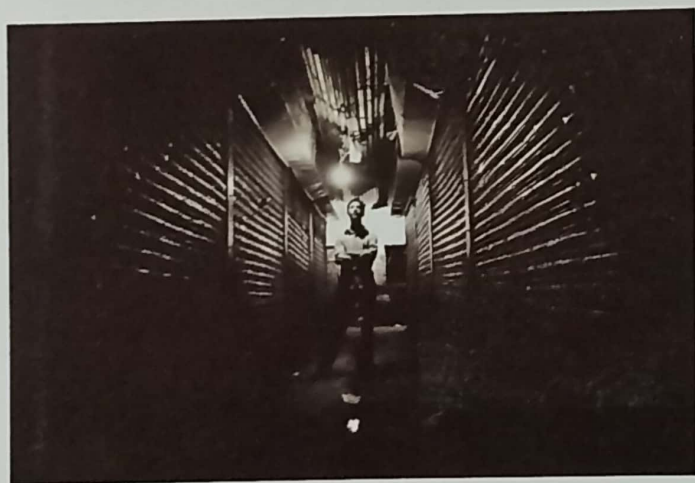
আল মাহমুদ বাঁধন



নাজিয়া তাহসীন



১ম | রাহুল তালুকদার



২য় | তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী



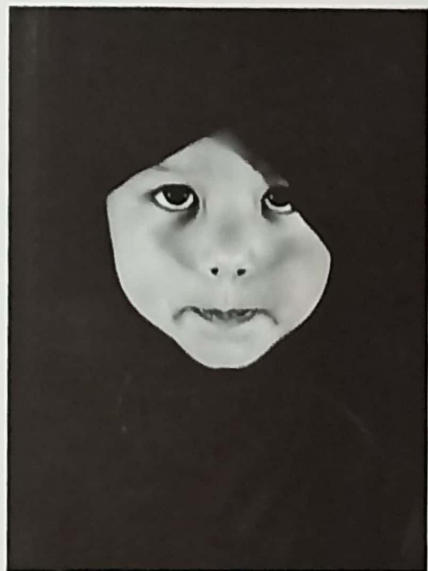
৩য় | শাকিল মাহবুব হোসাইন



কারসার আহমেদ



শাকিল মাহবুব হোসাইন



সাইয়িদা ফাতিমা জাহান দিবা



তাহরীম রুশ্মান কবির



মোঃ ফরসাল কবির



সুমন মল্লিক

ডিইউপিএস মে
বার্ষিক আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

নির্বাচিত আলোকচিত্রীদের তালিকা

আলোকচিত্রী

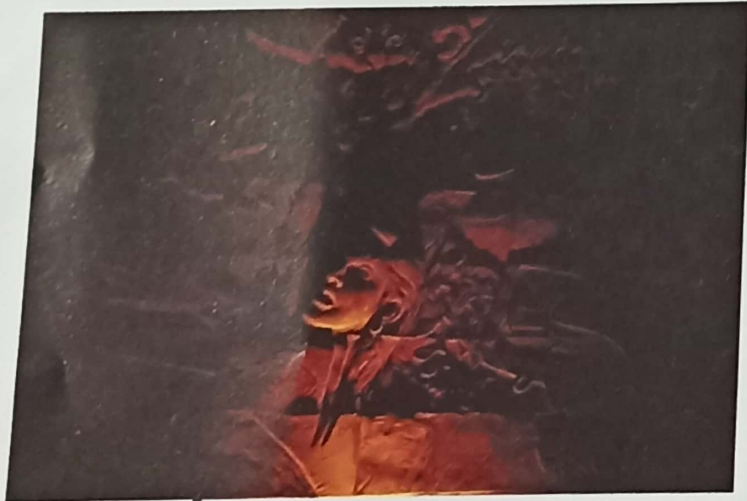
শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
মহসীন কবীর
ইমতিয়াজ- আল- তারেক
জাকিয়া খানম
শিশির আইচ
পূর্বা চৌধুরী জয়া
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
মোহাম্মদ রাসেল
মো: আকরাম হোসেন
বিবি আমিনা
আজরিন আফরিন
নাফিউল হাসান নাসিম
কাজী মুনীর
সাদিয়া আরিফিন শান্তা
নাফিসা নাওয়াল ইসলাম

বিভাগ

ভূতত্ত্ব
প্রাচ্যকলা (চারুকলা)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
মার্কেটিং
মার্কেটিং
বাংলা
বাংলা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ইতিহাস
মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান
সমাজ বিজ্ঞান
গ্রাফিক ডিজাইন (চারুকলা)
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং



১ম | মোহাম্মদ রাসেল



২য় | জাকিয়া খানম



৩য় | শিশির আইচ



ইমতিয়াজ-আল-তারেক



নাফিসা নাওয়াল ইসলাম



নাফিসা নাওয়াল ইসলাম



মোহাম্মদ রাসেল



মোঃ আকরাম হোসেন



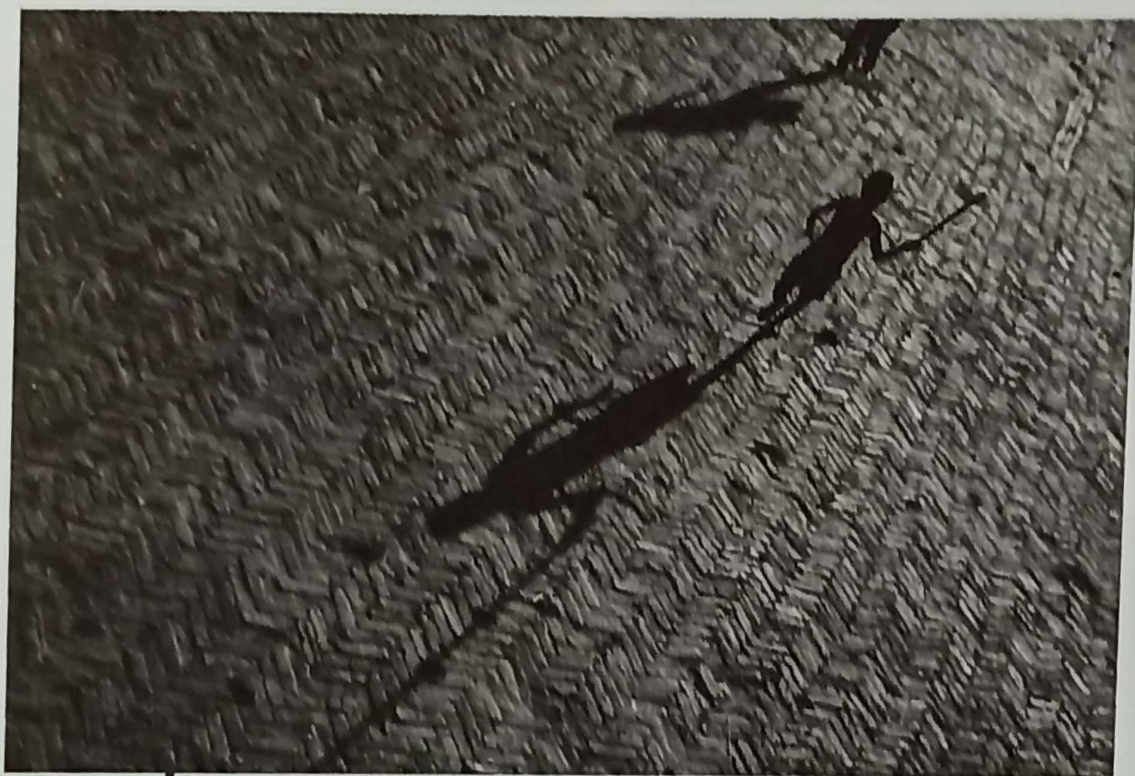
মহসীন কবীর



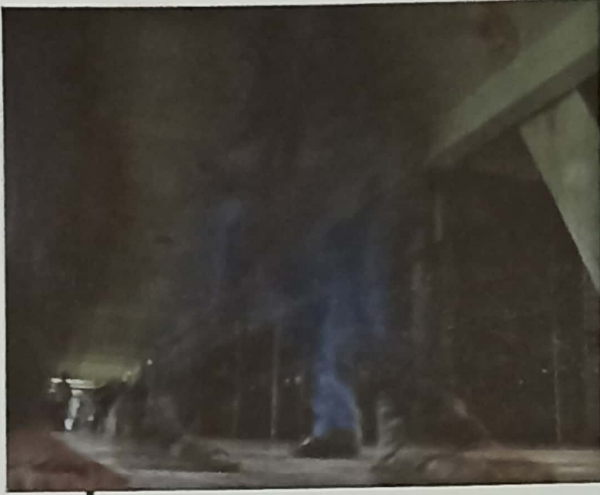
বিবি আমিনা



সাদিয়া আরিফিন শান্তা



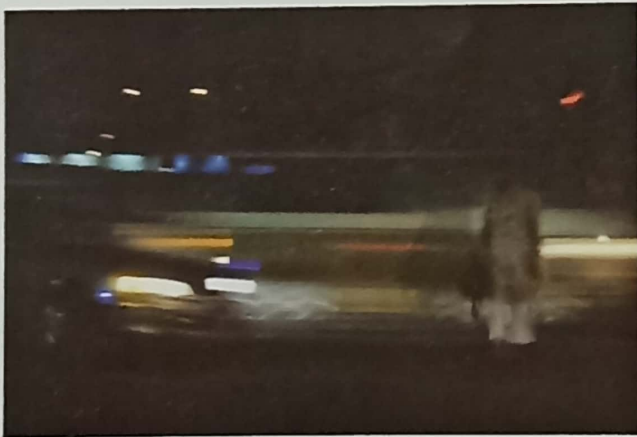
১ম | মোহাম্মদ কামরুল হাসান



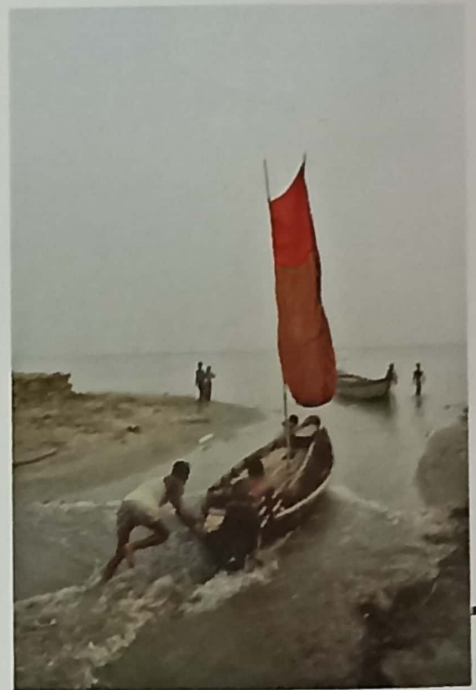
পূর্বা চৌধুরী জয়া



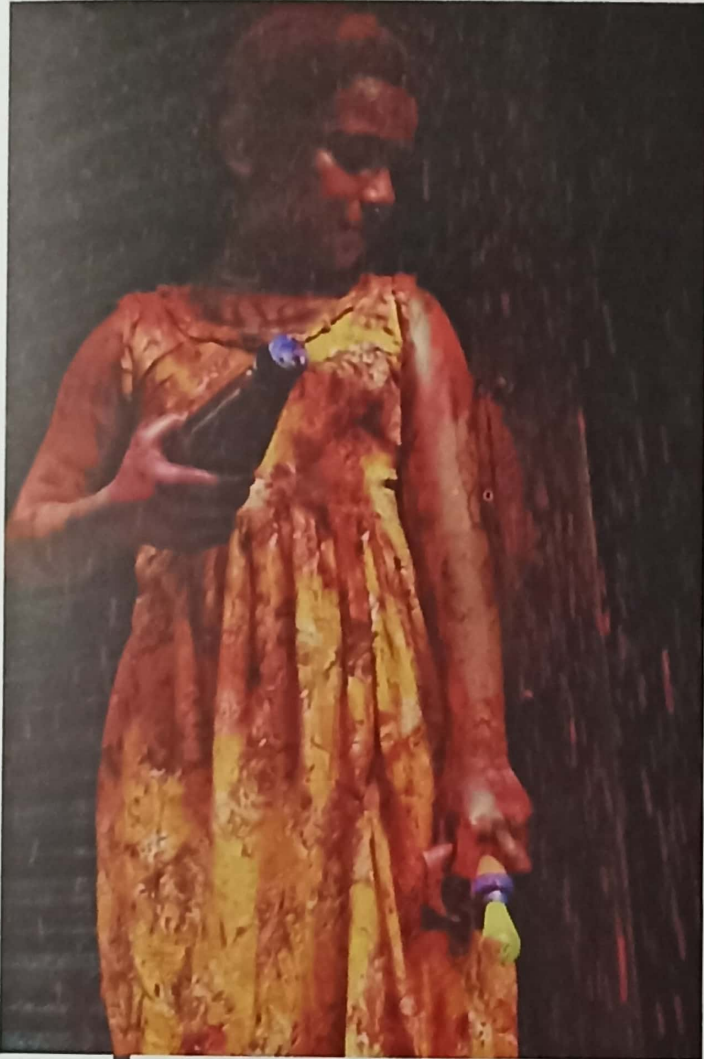
মোহাম্মদ কামরুল হাসান



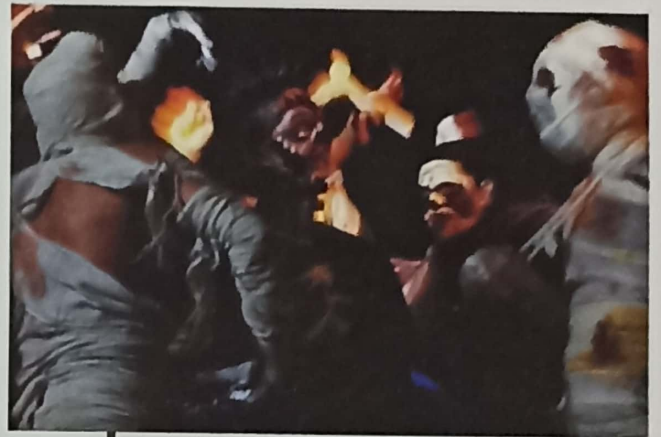
সুভাশীষ রঞ্জন সরকার



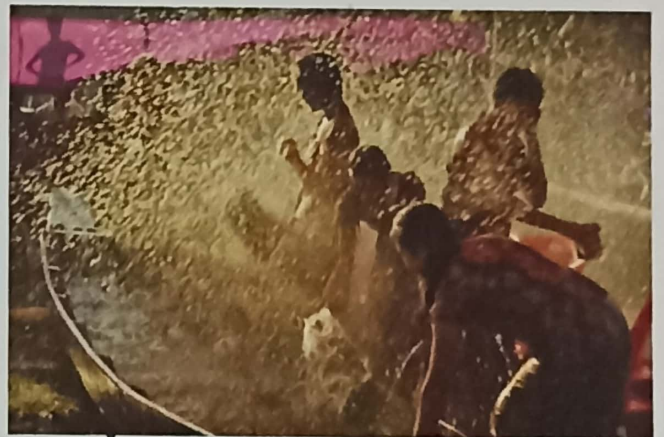
সাদিয়া আরিফিন শান্তা



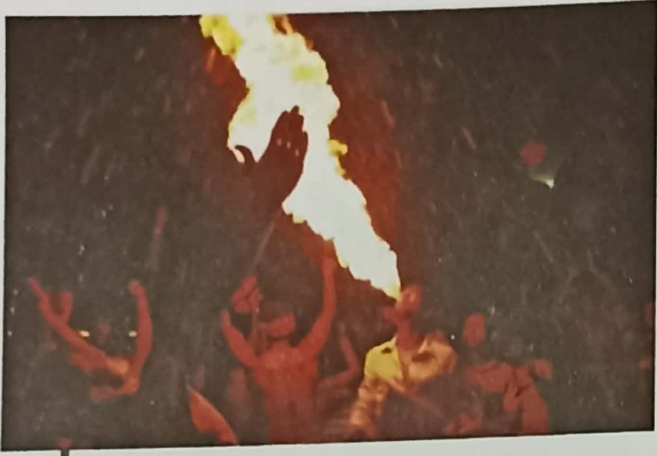
১ম | শুভাশ্রীষ রঞ্জন সরকার



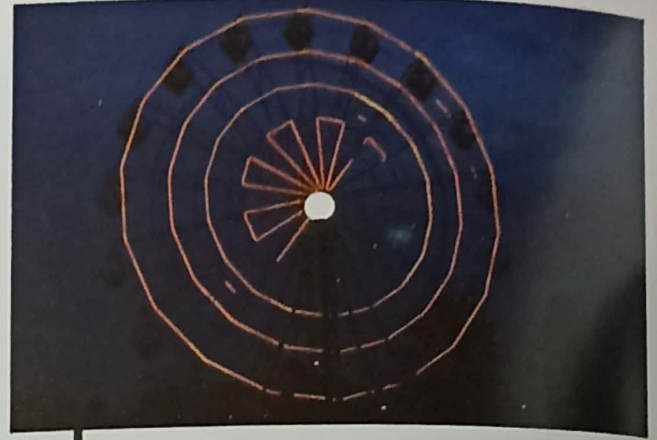
২য় | মহসীন কবীর



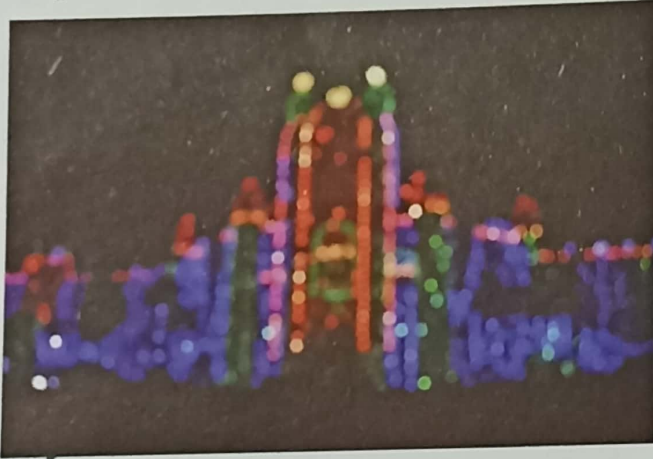
৩য় | জাকিয়া খানম



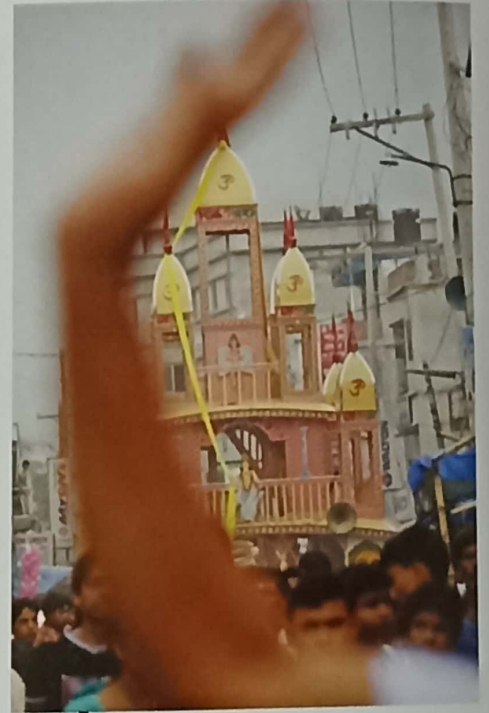
শুভাশীষ রঞ্জন সরকার



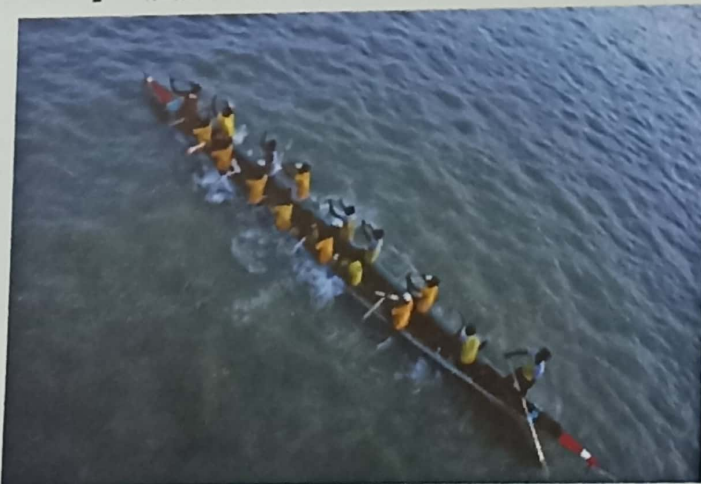
ইমতিয়াজ-আল-তারেক



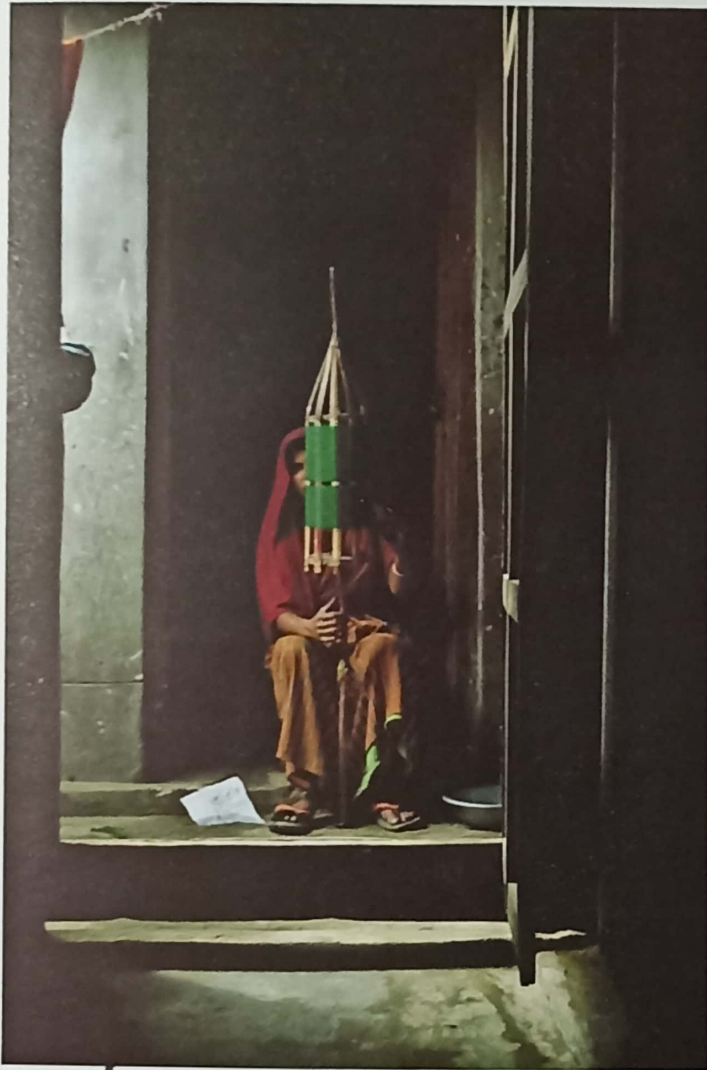
আজরিন আফরিন



মহসীন কবীর



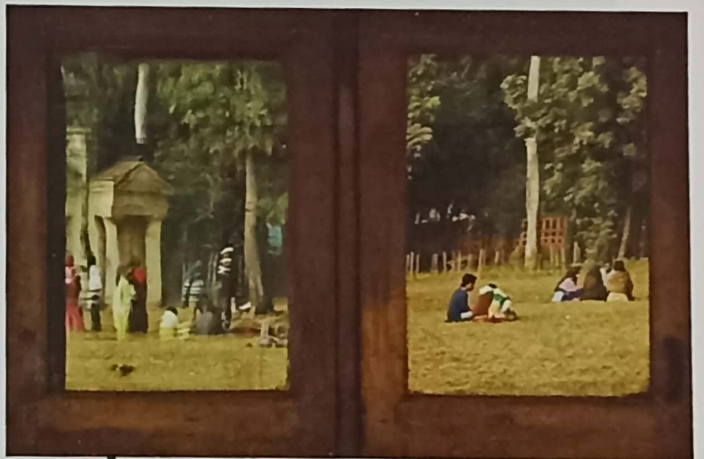
মহসীন কবীর



১ম | শিশির আইচ



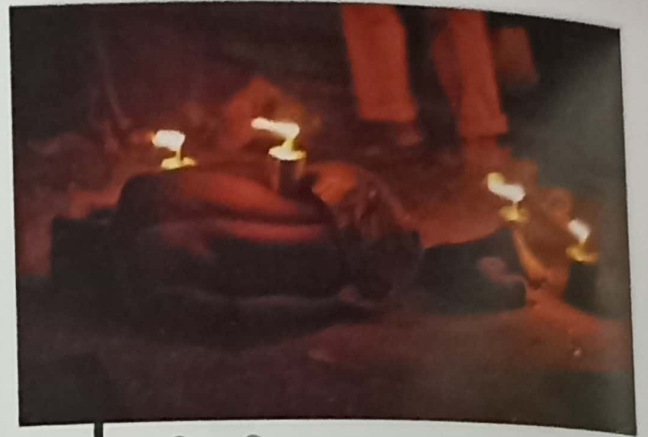
২য় | জাকিয়া খানম



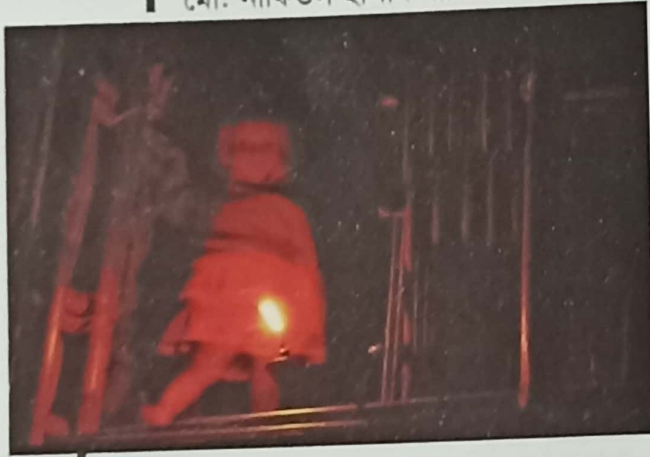
৩য় | মহসীন কবীর



মো: নাসিউল হাসান নাসিম



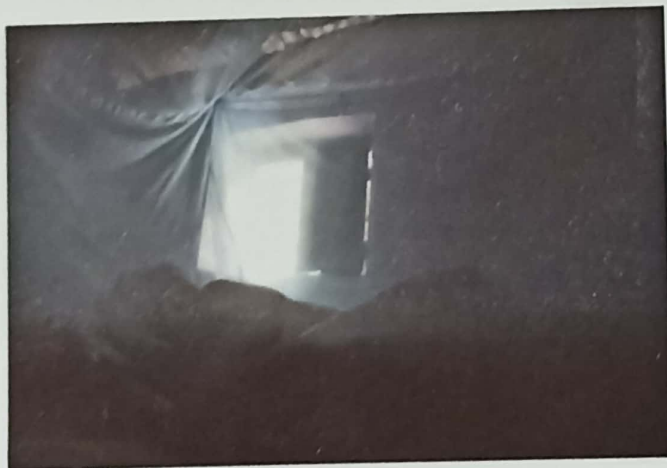
মহসীন কবীর



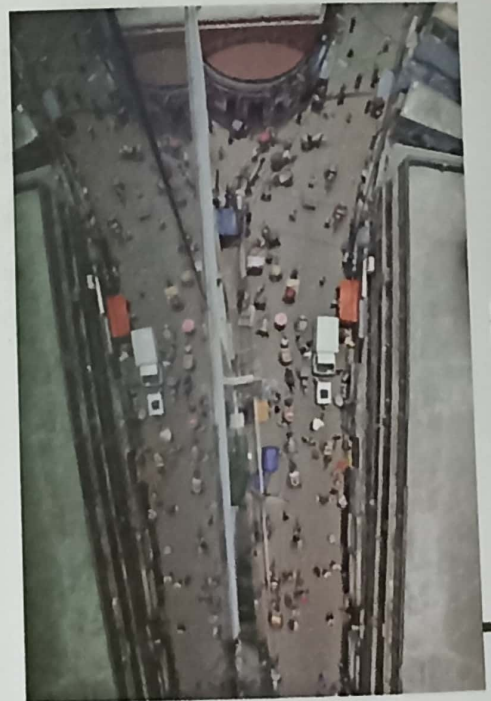
শুভাশীষ রঞ্জন সরকার



মোহাম্মদ কামরুল হাসান



মোহাম্মদ কামরুল হাসান



মোহাম্মদ কামরুল হাসান



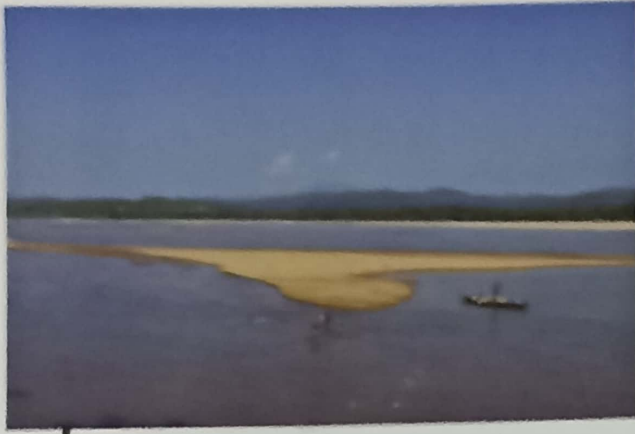
১ম | মহসীন কবীর



২য় | পূর্বা চৌধুরী জয়া



৩য় | আজরিন আরফরিন



জাকিয়া খানম



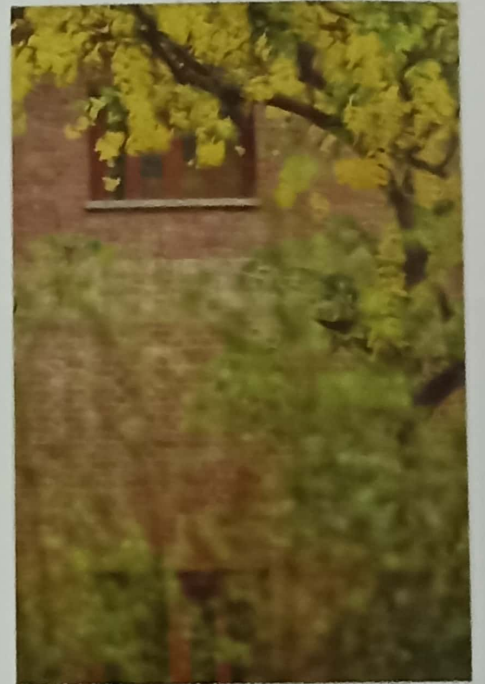
মহসীন কবীর



পূর্বা চৌধুরী জয়া



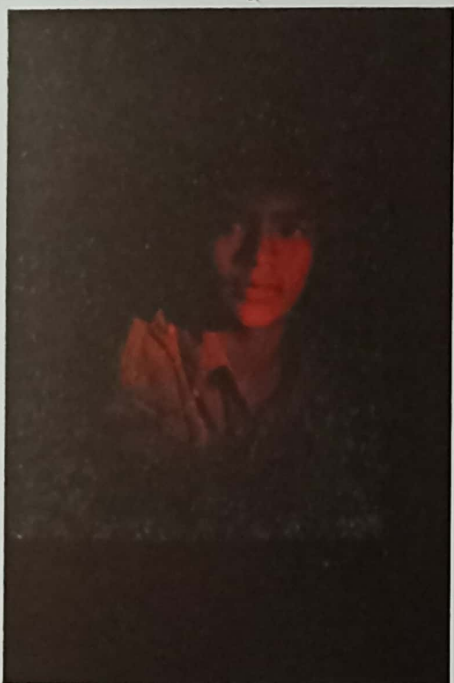
মহসীন কবীর



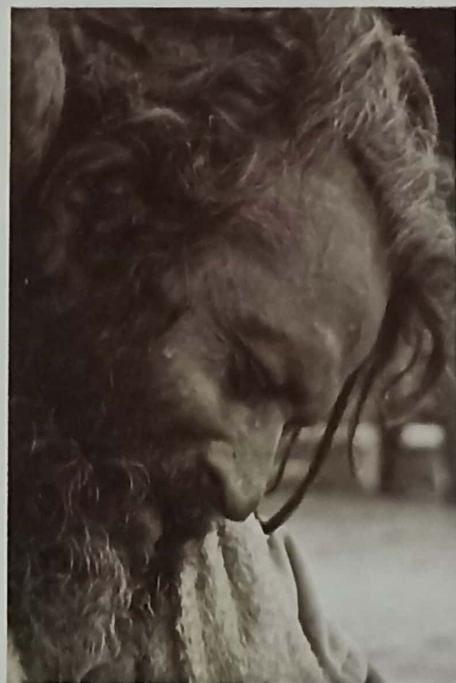
ইমতিয়াজ-আল-তারেক



১ম | কাজী মুনীর



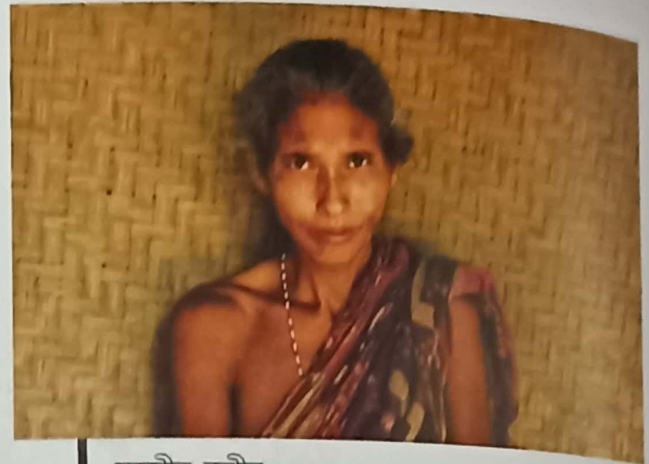
২য় | ইমতিয়াজ-আল-তারেক



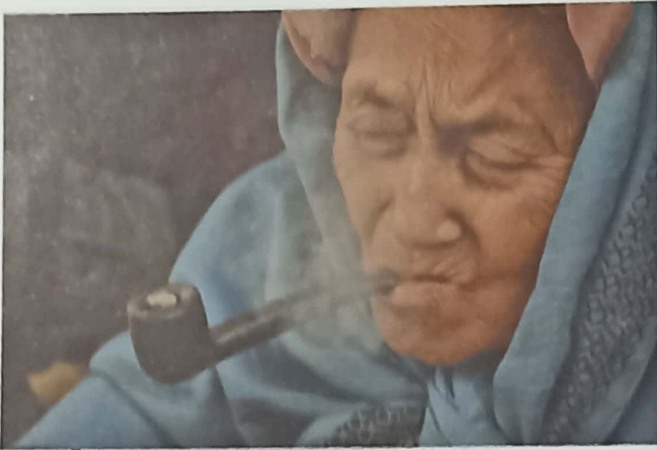
৩য় | মহসীন কবীর



জাকিয়া খানম



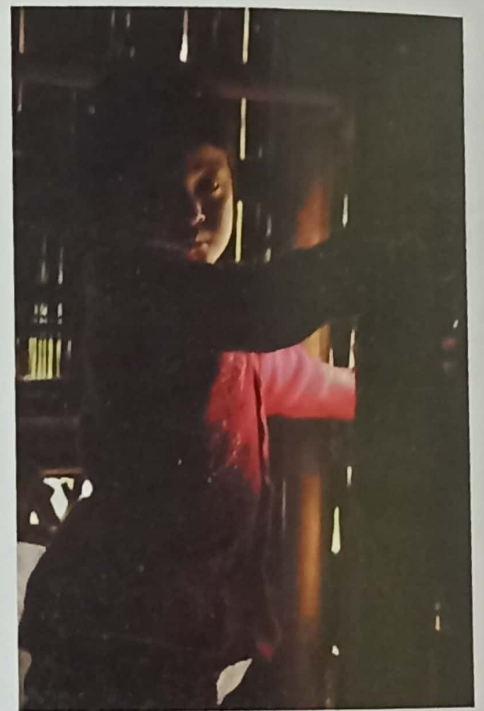
মহসীন কবীর



জাকিয়া খানম



শুভাশীষ রঞ্জন সরকার



শুভাশীষ রঞ্জন সরকার

সেমিনার

আলোয় আঁকি আগামী পৃথিবী

DELL DUPS

১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব'১২

“বাংলাদেশের আলোকচিত্রঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা”

ভেন্যু: নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২

প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক

ডঃ শহীদুল আলম

আলোকচিত্রী, প্রতিষ্ঠাতা, দৃক ও পাঠশালা

আলোচক

ডঃ শফিউল আলম ভূঁইয়া

চেয়ারম্যান, টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুনীরা মোর্শেদ মুন্সী

আলোকচিত্রী ও শিক্ষক পাঠশালা

এস কে এনামুল হক

চিফ ফটোজার্নালিস্ট, দি ডেইলি স্টার

এস এম গোর্কি

চিফ ফটোজার্নালিস্ট, দৈনিক যুগান্তর

সিরাজুল হোসেইন

আলোকচিত্রী

সঞ্চালক

শুভাশীষ রঞ্জন সরকার

সভাপতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

ছবি : সেমিনার



কর্মশালা

আলোয় আঁকি আগামী পৃথিবী

DELL DUPS

১ম জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব'১২

স্কুল পর্যায়

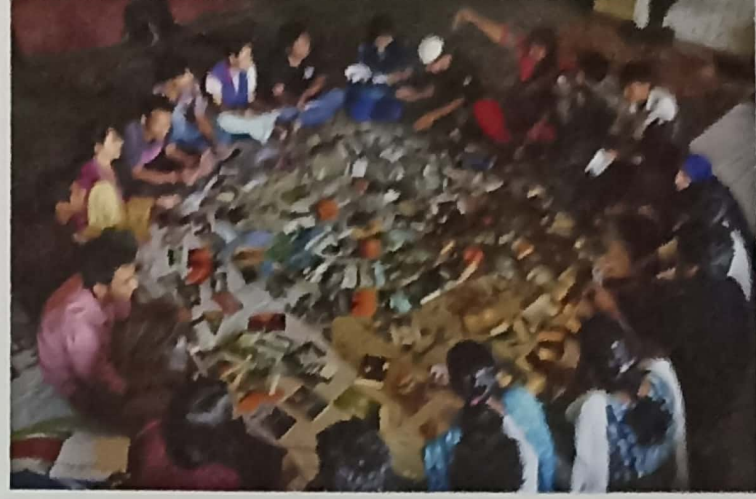
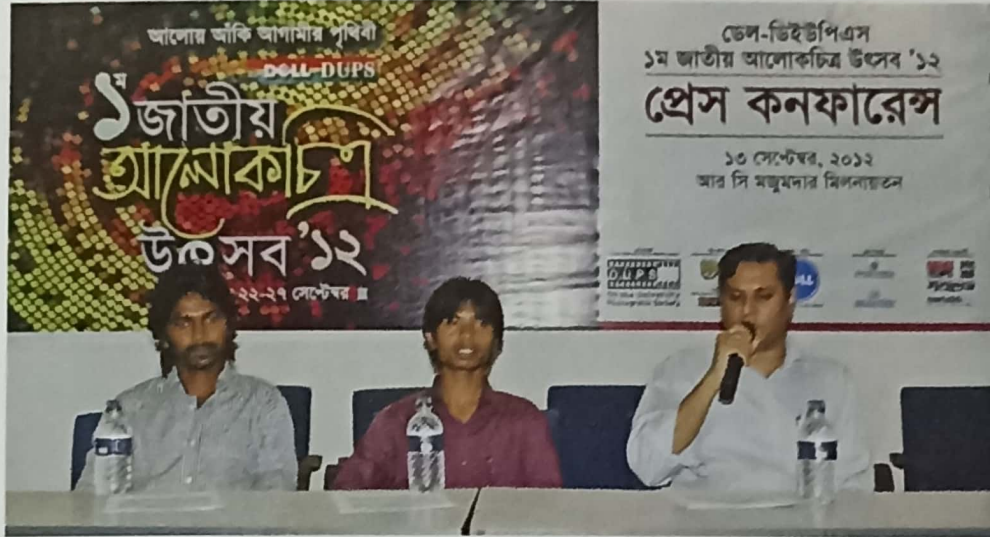
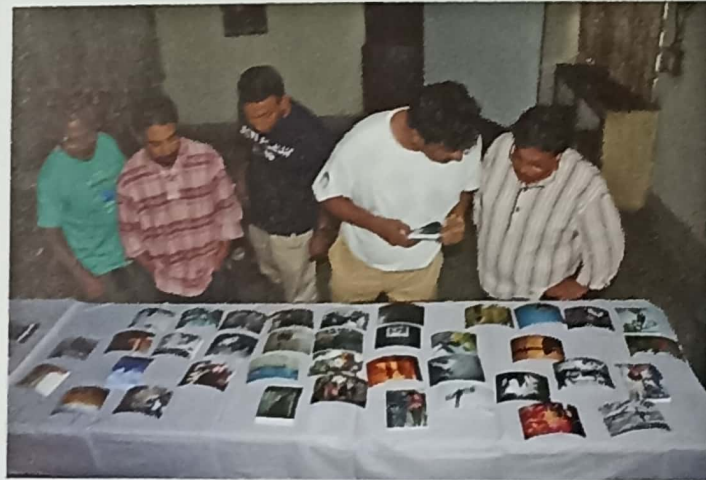
কলেজ পর্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২



ছবি : উৎসবের আয়োজন



ছবি : ডিইউপিএস এ্যালবাম







১১তম কার্যকারী কমিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

কার্যকারী কমিটি:

১. সভাপতি	:	শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
২. সহ-সভাপতি	:	সিদ্ধার্থ প্রবাল
৩. সাধারণ সম্পাদক	:	ম ই ম ফুয়াদ
৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	শিশির আইচ
৫. কোষাধ্যক্ষ	:	মহসীন কবীর
৬. সহ-কোষাধ্যক্ষ	:	জাকিয়া খানম
৭. দফতর সম্পাদক	:	ইমতিয়াজ-আল-তারেক

সাধারণ সদস্য:

১. পূর্বা চৌধুরী জয়া
২. মোহাম্মদ রাসেল
৩. মোহাম্মদ কামরুল হাসান
৪. বিবি আমিনা
৫. আজরিন আফরিন
৬. রিফাত মোশাররফ বর্ণ
৭. সৌরভ কুমার কুন্ডু
৮. মো: নাফিউল হাসান নাসিম
৯. কাজী মনিরুল ইসলাম
১০. মো: আকরাম হোসেন

প্রাথমিক সদস্য:

১. সায়মা খায়ের
২. আরিফিন শুভ
৩. মো: আরাফাত উল হক
৪. শফিকুল ইসলাম
৫. কাশফিয়া রাব্বী নূর
৬. সাফাতুল ইসলাম
৭. নাকিবা বারী জুঁথি
৮. উম্মে লায়লাতুল ফেরদৌসি
৯. সাখাওয়াত হোসেন
১০. মো: আশরাফুল গনি
১১. লামিয়া মুনির
১২. সাদিয়া আরিফিন শান্তা
১৩. নাজমুস সাকিব
১৪. আহমাদ কৌশিক
১৫. সুমাইয়া ফরহানা সুমি
১৬. ফরহাদ হোসাইন
১৭. শামীম রায়হান তামীম
১৮. রাকিবুল ইসলাম
১৯. নাফিসা নাওয়াল ইসলাম
২০. এস. এম. কায়সার
২১. মাসুদুর রহমান

সাইদা খানম

তিন কালের সাক্ষী: বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী

শুধু বাংলাদেশে নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও সাইদা খানম ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নারী আলোকচিত্রী। সুদীর্ঘ বছর ধরে দেশে এবং দেশের বাইরে একজন প্রথম শ্রেণীর আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ করেছেন সাইদা খানম। কখনো প্রেস ফটোগ্রাফার, কখনো ফিল্মাস্টার ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন। বহু জাতি-ধর্মের মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রার সাথে যেমন পরিচিত হয়েছেন, তেমনি পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে শধু ছবিই তুলেননি, তাদের অন্তরের কাছাকাছি গিয়ে স্নেহসিক্ত হয়েছেন সাইদা খানম।



সাইদা খানম জন্মগ্রহণ করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। শিক্ষিত রুচিশীল পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাইদা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও লাইব্রেরী সাইন্সে এম এ করেন। আলোকচিত্র সাংবাদিক হিসেবে বেগম পত্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেন। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি তোলেন। তিনি রানী এলিজাবেথ, জাপানের রাণী, মাদার তেরেসা, মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রথম চাঁদে পদার্পণকারী নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স প্রমুখের ছবি তোলেন।

১৯৬২ সালে চিত্রালী পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের ছবি তুলতে কলকাতা যান। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সহ অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি তোলেন সাইদা খানম।



১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, পাকিস্তান, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস-এ তিনি বেগম পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ভি.পি.আই এনজিওর ৫২ তম সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

স্বীকৃতি:

১৯৫৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন জার্মানি থেকে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান ফটো কনটেস্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ইউনেস্কো অ্যাওয়ার্ড জাপানসহ বহু দেশী ও বিদেশী আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন। সাইদা খানম বাংলা একাডেমীর একজন আজীবন সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন লেখিকা সংঘের সদস্য ছিলেন। আলোকচিত্রের পাশাপাশি তার অনেক সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মৃণাল সরকার

বাংলাদেশের আলোকচিত্রের জগতে নিভৃতচারী ব্যক্তিত্ব 'মৃণাল সরকার'। ১৯৩৪ সালের ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি রংপুরের কেরানীগঞ্জ-এ জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ সরকার স্কুল-শিক্ষক। মা প্রভারানী সরকার গৃহবধু। প্রাথমিক শিক্ষা রংপুরে। পরে বাবার সাথে খুলনায়। ওখানে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৪৮ সালে। কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে চারুকলায় তালিম। পরে ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে আগমন-ফরেস্ট ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউটে আলোকচিত্রী পদে যোগদান। বাংলাদেশের আলোকচিত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। ১৯৮৩ সালে তাঁর হাত ধরেই যাত্রা শুরু হয় চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটির। এছাড়াও তাঁকে সভাপতি করে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে সেটির বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের আলোকচিত্র জগত থেকে যোগ্য প্রাপ্তি আর সম্মান না পেলেও আলোকচিত্রের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রেখে ২০০০ সালের ১৭ জুলাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।



The power to do more

J.A.N. ASSOCIATES LTD.

Canon
EOS 1100D

- 18.0 Megapixels
- Advanced Creative Functions
- 3" LCD Screen
- ISO 100-6400
- 3 fps Shooting Speed



12.2

With EF-S 18-55mm IS Kit

Tk. 55,000

Canon Back-Street Photo Mode (B)

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon BG-E6 Strap
- Canon WB-E6 Remote Switch

Canon
EOS 600D

- 18.0 Megapixels
- Advanced Creative Functions
- 3" Wide-angle LCD
- ISO 100-12800
- 5.3 fps Shooting Speed



18.0

Body Only

With EF-S 18-55mm IS Kit

Tk. 65,000

With EF-S 18-135mm IS Kit

Tk. 95,000

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon BG-E6 Strap
- Canon WB-E6 Remote Switch

Canon
EOS 600D

- 18.0 Megapixels
- Advanced Creative Functions
- 3" Wide-angle LCD
- ISO 100-12800
- 5.3 fps Shooting Speed



18.0

Body Only

With EF-S 18-55mm IS Kit

Tk. 99,000

With EF-S 18-135mm IS Kit

Tk. 115,000

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon BG-E6 Strap
- Canon WB-E6 Remote Switch

Canon
EOS 7D

- 20.0 Megapixels
- 11.5 FPS Continuous Shooting
- ISO 100-6400
- 3.4 fps Shooting Speed



Canon EOS Professional
EOS 5D Mk II

- 21.1 Megapixels
- 11.5 FPS Continuous Shooting
- ISO 100-6400
- 3.4 fps Shooting Speed



21.1

Body Only

With EF 24-105mm IS Kit

Tk. 180,000

Tk. 260,000

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon BG-E6 Strap
- Canon WB-E6 Remote Switch

Canon
EOS 1D Mk IV

- 16.1 Megapixels
- 15 FPS Continuous Shooting
- ISO 100-102400
- 10 fps Shooting Speed



16.1

Body Only

Tk. 350,000

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon WFT-E6B Transmitter
- Canon BG-E6 Remote Switch

Canon
EOS 1D Mk III

- Full Frame CMOS Sensor
- ISO 100-32000
- 5 fps



21.1

Body Only

Tk. 510,000

KEY ACCESSORIES

- Canon LP-E6 Battery
- Canon WFT-E6B Transmitter
- Canon BG-E6 Remote Switch

CANON EF LENSES (1/5000th sec. max. shutter speed) (5-Image Stabilizer to reduce camera shake) (L-All weather professional lens with ultimate performance)

Wide-angle Zoom Lenses

- EF 24-105mm F4 L IS USM
- EF 24-70mm F2.8 L IS USM
- EF 24-105mm F4 L IS USM
- EF 24-105mm F4 L IS USM
- EF 24-105mm F4 L IS USM

Telephoto Zoom Lenses

- EF 70-200mm F2.8 L IS USM
- EF 70-200mm F4 L IS USM
- EF 70-200mm F4 L IS USM
- EF 70-200mm F4 L IS USM
- EF 70-200mm F4 L IS USM

Wide-angle Prime Lenses

- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM

Standard Prime Lenses

- EF 50mm F1.8
- EF 50mm F1.8
- EF 50mm F1.8
- EF 50mm F1.8
- EF 50mm F1.8

Short Telephoto Prime Lenses

- EF 85mm F1.8 USM
- EF 85mm F1.8 USM
- EF 85mm F1.8 USM
- EF 85mm F1.8 USM
- EF 85mm F1.8 USM

Long Telephoto Prime Lenses

- EF 100mm F2.8 L IS USM
- EF 100mm F2.8 L IS USM
- EF 100mm F2.8 L IS USM
- EF 100mm F2.8 L IS USM
- EF 100mm F2.8 L IS USM

Macro Lenses

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

Perspective Control Lenses

- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM
- EF 24mm F1.4 L USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

EF 100mm F2.8 Macro USM

- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM
- EF 100mm F2.8 Macro USM

FLASH CANON SPEEDLITE



- 270EX Speedlite
- 320EX Speedlite
- 430EX Speedlite
- 580EX Speedlite
- MR14EX MacroLite
- MT24EX MacroLite

Lens Hood & Filter

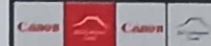


- All Type of Lens Hood & Filter...

Camera Bag & Pouch



- Wide Range of Camera Bag



FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OR VISIT OUR WEBSITE

www.jan-bd.com

*T&C: Subject to availability Prices vary over time

Head Office: 8624102, 8624292, 9660601, 9660359 • Dhanmondi: 9664101
BCS Computer City: 8124941 • Elephant Road: 9672462 • Motijheel: 9515181
Shanti Nagar: 01716021448 • Camera Service Center: 9143790 • CanonLink: 9138125

We Provide

1 year warranty

J.A.N. ASSOCIATES LTD.

Canon

PowerShot A2200



- 14.1 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- 4x Optical Zoom
- Blue Reduction Mode

14.1 MP

Color: Silver/Red/Black

PowerShot A2300 IS



- 16.0 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- DIGIC 4 processor
- 28mm wide-angle Lens

16.0 MP

Color: Silver/Red/Black

IXUS 115 HS



- 12.1 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- 4x Optical Zoom
- CMOS Sensor
- 28mm wide-angle Lens
- High Sensitivity

12.1 MP

Color: Orange/Grey/Blue/Pink/Silver

PowerShot A2400 IS



- 16.0 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- DIGIC 4 processor
- High Sensitivity
- 28mm wide-angle Lens

16.0 MP

Color: Silver/Blue/Pink/Black

PowerShot A3200 IS



- 14.1 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- DIGIC 4 processor
- 28mm wide-angle Lens

14.1 MP

Color: Silver/Blue/Orange/Pink

IXUS 125 HS



- 16.1 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- 5x Optical Zoom
- CMOS Sensor
- 28mm wide-angle Lens
- High Sensitivity

16.1 MP

Color: Orange/Green/Blue/Pink/Silver/Black

PowerShot SX240



- 12.1 Megapixels
- 3" TFT LCD Screen
- DIGIC 5 processor
- High Sensitivity
- 25mm wide-angle Lens

12.1 MP

Color: Silver/Red/Black

PowerShot S100



- 12.1 Megapixels
- 3" TFT LCD Screen
- DIGIC 5 processor
- High Sensitivity
- 24mm wide-angle Lens

12.1 MP

Color: Silver/Black

IXUS 220 HS



- 12.1 Megapixels
- 2.7" TFT LCD Screen
- 5x Optical Zoom
- 24mm wide-angle Lens
- High Sensitivity

12.1 MP

Color: Black/Silver/Red

PowerShot SX40



- 12.1 Megapixels
- 2.8" TFT Vari-angle LCD
- DIGIC 5 processor
- High Sensitivity
- 24mm wide-angle Lens

12.1 MP

Color: Black

PowerShot G12



- 10.1 Megapixels
- 2.8" TFT Vari-angle LCD
- 5x Optical Zoom
- DIGIC 4 processor
- High Dynamic Range
- 28mm wide-angle Lens

10.1 MP

Color: Black

LEGRIA CAMCORDER

HFR 406
(SD Flash Memory Camcorder)

- Card Slot
- 37x Optical 2000x Digital
- 2.7" Widescreen LCD
- MPEG2 Video Recording
- Size: App. 3.1"x2.3"x4.8"
- Weight: Approx. 220g

Color: Black

HFR 46
(SD Flash Memory Camcorder)

- 8GB Built-in & Card Slot
- 37x Optical 2000x Digital
- 2.7" Widescreen LCD
- MPEG2 Video Recording
- Size: App. 3.1"x2.3"x4.8"
- Weight: Approx. 220g

Color: Silver/Red/Blue

HFR 46
(HD Flash Memory Camcorder)

- 8GB Built-in & Dual Card Slots
- 37x Optical 2000x Digital
- 2.7" Widescreen LCD
- MPEG2 Video Recording
- Size: App. 3.1"x2.3"x4.8"
- Weight: Approx. 220g

Color: Black

HFR 46
(HD Flash Memory Camcorder)

- 12GB Built-in & Dual Card Slots
- 18x Optical 200x Digital
- 3" Widescreen Touch LCD
- Cinema-Like Filters
- Starry Creator
- Decorasion

Color: Black

IXUS 310 HS



- 12.1 Megapixels (CMOS)
- 4.4x optical zoom
- 3.2" Touch Screen
- High Sensitivity

12.1 MP

Color: Brown/Pink/Silver



FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OR VISIT OUR WEBSITE
www.jan-bd.com

We Provide
1 year warranty



শুরু হল
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
এবং
WESTERN UNION MONEY TRANSFER
- এর একত্রে পথচলা।

এখন থেকে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় **WESTERN UNION** এর মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্স এর অর্থ তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবে।

আমাদের সকল সম্মানিত
গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানানো
যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিকমানের ব্যাংকিং সফটওয়্যার T-24 এর
মাধ্যমে ব্যাংকের ১০২টি শাখায় এখন সম্পূর্ণ অনলাইনের
আওতায় লেনদেন শুরু হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে ব্যাংকের ওয়েবসাইট দেখুন।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
website : www.agranibank.org
রেমিট্যান্স Help Desk : ০১৭১৩৪৮০১০৯, ০১৭১৩১৮৫১৬২

জাহাঙ্গীর

ফ্রেম দ্বার

মোঃ জা

(এখানে উন্নতমানের দেশী বিদেশী ফ্রেম হারি বাধাই করা হয়)

ফোন: ৮৮২১৪৯, ৮৮২১৫০

আপনি যেমনটি চেয়েছেন জনতা ব্যাংক নিয়ে এল
তৈমল দুটি সঞ্চয়ী ঋন
অন্য টাকা ৬ বছরে বিতন (সঞ্চয়ী) **মাসিক আদানাত প্রকল্প** (সঞ্চয়ী)



৫০,০০০ টাকা এক বছর
 বার্ষিক অঙ্কের অর্থ একমাসের
 মধ্যে করতে ৬ বছরে শেষে অঙ্ক
 সমাপ্তি হতে পারে।

মাসিক আদানাত প্রকল্প

ক্রম	উদ্দেশ্য	প্রতি মাসের অর্থ	মাসের শেষে
০১	১০০০	১০০০	১০০০
০২	২০০০	২০০০	২০০০
০৩	৩০০০	৩০০০	৩০০০
০৪	৪০০০	৪০০০	৪০০০
০৫	৫০০০	৫০০০	৫০০০
০৬	৬০০০	৬০০০	৬০০০
০৭	৭০০০	৭০০০	৭০০০
০৮	৮০০০	৮০০০	৮০০০
০৯	৯০০০	৯০০০	৯০০০
১০	১০০০০	১০০০০	১০০০০

নির্দিষ্ট সময় ও পেমেন্ট অনুযায়ী জনতা ব্যাংক থেকে ঋন শাখায় ফোনে করা যায়।

প্রধান কার্যালয়
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
 ১০০ ফার্স্ট ফ্লোর, ঢাকা-১০০০

ফোন : +৮৮০-১৭-১৭১৭১৭, ১৭১৭১৭, ১৭১৭১৭, ফ্যাক্স : +৮৮০-১৭-১৭১৭১৭, ১৭১৭১৭
 ইমেইল : info@janatabank-bd.com, web@janatabank-bd.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
Janata Bank Limited
 উদ্ভাসের আশ্রয়স্থল বিশ্বের অর্থনীতির

design printing painting & photography



চিত্রকল্প
CHITRAKALPA

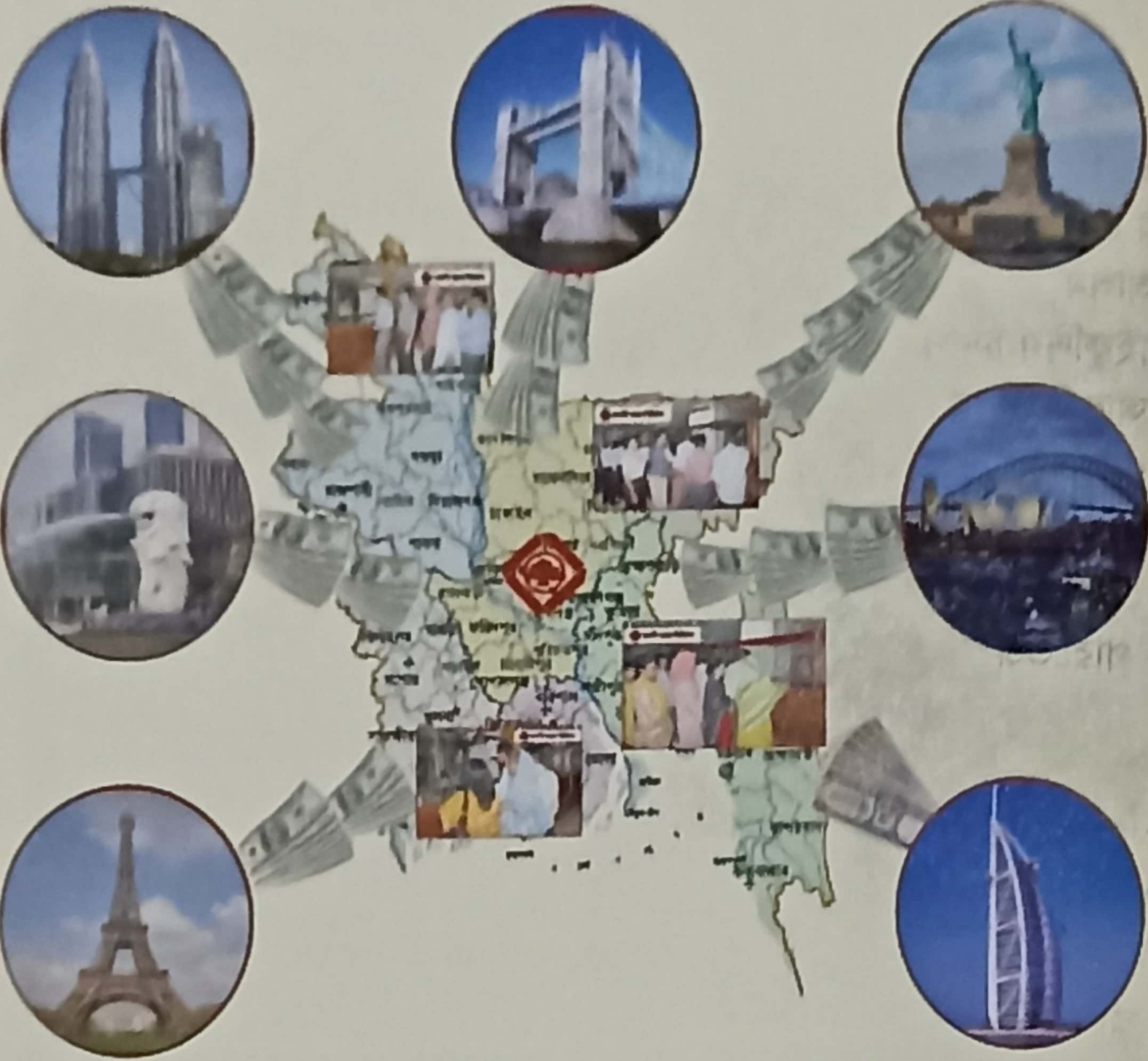
179/3 Fakirerpool, Motihjeel, Dhaka-1000
 01712 534856, 01712 661509
chitrakalpabd@gmail.com
www.chitrakalpabd.com

সংবাদ উন্মোচন



www.unmochon.com

ডলার পাঠান, টাকা নিন



সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গ্রাহককারীদের জন্য
রয়েছে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা

বিক্রে যে কোন দেশ থেকে বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স পাঠালে **রূপালী ব্যাংক**
লিমিটেডের সকল শাখা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিশোধ করা হয়।

রেমিট্যান্স সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
Rupali Bank Limited

রেমিট্যান্স বিভাগ
এখান কার্যালয়: ৫৪, দিলকুশা রোড, ঢাকা-১০০০।

SWIFT: RUPBDDH

E-mail: rblhold@bdcom.com

উপ-মহাব্যবস্থাপক: ০১৭১১৭০০২২০

সহকারী মহাব্যবস্থাপক (রেমিট্যান্স সেল): ০২-৭১২৫০০৫, ০১১৮৮১০০৪২

জয়েন্ট ইন্ট্রিন (সিএসসি ইন্টার্ন): ৯৫৬৯১৫৯, ০১৭১৬৫০৫২৮৬

সাক্ষাৎকার

আনোয়ার হোসেন
শহিদুল আলম
হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন
শফিউল আলম ভূঁইয়া
সাইফুল হক অমি
ডেভিড বারিকদার
এস এম গোর্কি
শাহাদাত পারভেজ

প্রবন্ধ

মানস কুমার চৌধুরী
ড. ফাহিমদুল হক
রফিকুল ইসলাম
মউদুদুল আলম
হাসিব জাকারিয়া
দীন মোহাম্মদ শিবলী
আব্দুল্লাহ এইচ কাফি
নাজমুল হোসেন

অনুলিখন

পাভেল রহমান
শামসুল হক টেংকু
শফিকুল আলম কিরণ

স্মৃতিচারণ

আনোয়ার হোসেন
আলী যাকের

তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

ফারজানা বিনতে মনজু
হৃদন পণ্ডিত
নিগার সুলতানা

আলোকচিত্রের সংগঠন

আর.পি.এস
এস.পি.এস
এ.ডি.পি.এস
এস.এস.ইউ.পি.সি
কুয়েট পি.এস
এস.ইউ.পি.সি
ইস্টওয়েস্ট পি.সি
এস.পি.এস
জে.পি.এস
বুয়েট পি.এস
ইউ.আই.ইউ.পি.সি
বি.ইউ.পি.সি
এ.আই.ইউ.বি.পি.সি
ডিইউপিএস

আনোয়ার হোসেন

যে কয়েকজন আলোকচিত্রীর কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের আলোকচিত্রের পথচলা শুরু হয় আনোয়ার হোসেন শুধু তাঁদেরই একজন নন, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণও বটে। আলোকচিত্রের প্রতি অগাধ ভালবাসা থেকেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত না হয়ে তিনি এখনও ক্যামেরা হাতে ছুটে চলেন। দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর অর্জনের বিপরীতে বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পের জগতে তাঁর অভাব পরিলক্ষিত হয় অনেকটা। এ অভাব প্রভাবিত করে সকল প্রজন্মের আলোকচিত্রীদের, এদেশের আলোকচিত্র শিল্পের। শিল্পবোধের সেই অভাব অনুভব থেকেই তার এই সাক্ষাতকার গ্রহণ। মহসীন কবীর-এর সহযোগিতায় সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন শুভাশীষ রঞ্জন সরকার।

শুভাশীষ: ফটোগ্রাফিকে কেউ দাবি করেন এটি শিল্প, কেউ শিল্প না। কেউ বলে এটা শিল্প এবং বিজ্ঞান দুটোরই মিশ্রণ। এ বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

আনোয়ার হোসেন: এটা খুব সহজ ব্যাপার। এসব নিয়ে যারা ব্যস্ত, তাদের এসব জায়গাতে থাকতে দাও। তাদের ছবি দেখারও দরকার নাই, ছবি তোলার ও দরকার নাই। আমি খুব একটা বিস্মিত হই না বাংলাদেশে, কারণ যে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কে দিল তা নিয়েই ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে আজ পর্যন্ত ঝগড়া-ঝাটি হচ্ছে। দেশের উন্নতি হচ্ছে না। তো তাদের কাছে ফটোগ্রাফি শিল্প কি শিল্প না, এটা অনেক ছোট প্রশ্ন। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা বা হাফ বুদ্ধিজীবীরা পিক্কেল বুঝেন না, জিলেটিন বুঝেন না, অথচ তারা চলচ্চিত্র তৈরি করেন। চলচ্চিত্রের বোর্ডে থাকেন এবং সরকার থেকে অনুদান পান। তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করা যায়? আলোকচিত্র শিল্প একটা শিল্প কিনা এটা এস্টাব্লিশ হবে? আর বাকি যারা ছবি তুলেন তাদের মধ্যে ধান্দাবাজি এতো বেশি আছে, ছবিটাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য, ওনাদের প্রফেশনালি Voting এর জন্য, বিশ্বব্যাপী বা ফাইন্যানশিয়ালি ওনারা ওটা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকেন অসং উদ্দেশ্যে এটা তো শিল্প হিসেবে প্রমাণ করতে গেলে সেটা কম হবে। একটা জিনিস তখনি শিল্প যখন সেটি আত্মার খোরাক যোগায়। কিন্তু বিদেশে বহু বছর আগে ফটোগ্রাফির আবিষ্কারের সময় থেকেই মোটামুটি একটা শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। আর বিশেষ করে ১৫০ বছরের বেশি ইতিহাসের মধ্যে গত ১০০ বছরে এটা ভাল মতোই স্বীকৃত উচ্চমানের শিল্প।

শুভাশীষ: স্যার আমাদের দেশে ছবি শিল্পের চেয়ে পণ্য হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয় বলে কি আপনার কাছে মনে হয়?

আনোয়ার হোসেন: না, এখনকার সমাজে তো Industrialization খুব বেশি, যেখানেই তাকানো যাক না কেন পাবলিসিটির সমারোহ। কোম্পানিগুলো একেকটা পণ্যের দামের বেশিরভাগই খরচ করে প্রচারের কাজে। আলোকচিত্র শিল্প একটি সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় শিল্প। অর্থাৎ এটা একটা মাধ্যম, যা দিয়ে ছবি তোলা হয়। সেই ছবি পাসপোর্টে, আইডি কার্ডে লাগে এবং নেতা-নেত্রীদের চেহারা তুলে ধরার জন্যও লাগে। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কিছুদিন আগে। সদ্যপ্রয়াত পেইন্টার ফখরুলের প্রদর্শনী হচ্ছে এখানে(অলিয়স ফ্রসেজে)। ওদের আলোকচিত্র, ওদের নিজস্ব একটা পোর্ট্রেট ছাড়া চেনাই মুশকিল হবে, কে ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, কে ছিলেন ফখরুল। সে হিসেবে আলোকচিত্র শিল্প একটা Essential science, যেটা ব্যবহার করে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পাসপোর্টই বলা আর ফেসবুকই বলা বা রাষ্ট্রপতির ভাষণই বলা, স্টিল ফটোগ্রাফ বা ভিডিও ছাড়া সম্ভব না। সেটা যদি একটা শিল্প না হওয়ার কারণ থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা হলো না। যেমন- নকশি কাঁথা একটা কাঁথা যা গ্রামের বধূকে বা গ্রামের মাকে উষ্ণতা দেওয়ার জন্য গায়ে দিত। এটা তো এমনি থাকতে পারতো। কাঁথায় কেন নকশা করার

দরকার ছিল? বা জামদানি একটা প্যাটার্ন বিহীন থান কাপড় হতে পারত। মানুষ তো প্রস্তুত যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জীবিকাতে, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে মনের কথাটা বলার জন্য দেয়ালে হোক, পাথরে হোক, নকশি কাঁথায় হোক, এমনকি পাতায় হোক কিছু ঐকেছে। কিছু আঁচড় দিয়েছে সেটাকে মনের শিল্প হিসেবে মানতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারি হোমড়া চোমড়ারা। কিন্তু, ছবি তুললেই কেন যেন মেশিনটার উপস্থিতির জন্য এটা অশিল্প হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এই এর শিল্প স্বীকৃতিটা দেয়া হয়নি। এটা আমাকে খুবই বিক্ষুব্ধ করে। আমার খুব বড় একটা অভিযোগ হলো যে, বাংলাদেশে একটা হতভাগা পরিস্থিতি আছে। সে পরিস্থিতি হলো এখানে ঈশৎ বোঝাই বলবো; বেশি বোঝে কয়জন জানি না। ঈশৎ বোঝা কিছু তথাকথিত শিল্প রসিক বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী, বড় বড় কর্পোরেশনের মালিক, যারা তোমাদেরকে যথেষ্ট পয়সা দিতে পারছেন না অনুষ্ঠান করার জন্য। তো তারা ফট করে কোন একটা শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে এল। একই চিত্র বিশবার আঁকা হচ্ছে, এই জাতীয় কাজ আমি দেখেছি যেটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ টাকায় 'শিল্প' হিসেবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওটা আন্তর্জাতিক ভাবে প্রায়শই দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্তরের কাজ; সেগুলোকে শিল্প হিসেবে লুফে নেয়া হচ্ছে। এগুলো বাসায় টাঙানো হবে বা কর্পোরেশনে টানানো হবে। অথচ, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গত ২০-৪০ বছর ধরে প্রথম স্তরের আলোকচিত্র শিল্পের একটা বড় প্রদর্শনী হলেও তো কেউ কেনে না। আমার প্রদর্শনী অলিয়াস ফ্রসেজে কয়েকবার হয়েছে। অথবা অন্যান্য জায়গায় হয়েছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ে না যে বিশহাজার, চল্লিশহাজার অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের আলোকচিত্র বিক্রি হয়েছে। আমাকে যারা পায়ে ধরে সালাম করে, আজকেও একজন আমাকে পায়ে সালাম করেছে ইউল্যাবে পড়ানোর সময়। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। এখানে যিনি ফটোগ্রাফি শেখান, মুজিব, তিনি যদি হঠাৎ তোমাদের সামনে এসে পড়েন। সে আবার অনেক সময় আমার পায়ে পড়ে যায় অ্যাম্বাস্যাডারের সামনেও। এটা আমার জন্য কিছুটা আপত্তিকরও কিছুটা বিস্ময়করও! আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যারা আমার পায়ে ধরে সালাম করে এ জাতীয় শিল্পীদের কাজও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চল্লিশ-ষাট লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। কারণ, ওইগুলোকে শিল্প মনে করে সরকারি কর্মকর্তারাও কিনে নেয়, কর্পোরেশনও কিনে নেয়। এবং বড় লোকদের কালেকশনতো আছেই। এই যে পাইছি চাচা বা পাওয়া: To possess এই sense থেকে শিল্পের পর্যায়ে গেছে। ভালো কাজ অবশ্যই আছে; জয়নুলের কাজ, কামরুল হাসানের কাজ। অবশ্যই আমাদের ইয়াং জেনারেশনের অনেকেই ভালো ছবি আঁকে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে, আলোকচিত্র শিল্পের প্রতি কেমন যেন একটা অনীহা রয়েছে এবং আলোকচিত্র শিল্পকে খেলো পণ্য আকারে রাখা হয়েছে। পন্যকে সার্ভ করার অথবা পিকচার এজেন্সি নামে কিছু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশে। যেটা দেশে-বিদেশে আমাকে বলা হয়েছে বারবার It's a pity Anwar you spent almost thirty five years, a significant period of your life working in a significant country. It's a pity. আমাকে ফ্রান্সের অন্তত পাঁচ-ছয় জায়গায় বলা হয়েছে। তখন যখন আমি ওদের সাথে তর্ক করলাম, তারা আমাকে বলে, There is too much dignity in your works. মানে আমরা ছবি তুললে সেটা Dignity হয়ে যায়। আর পেইন্টিংয়ে কেউ ভিক্ষা করছে কিংবা জয়নুল আবেদীনের 'মন্ডস্তর' হলে সেটা শিল্প হয়ে যায়। এই তো, নাকি!

গুভাশীষ: জি, স্যার।

আনোয়ার হোসেন: বাংলাদেশে মহা কোটিপতি অথবা সরকার জয়নুল আবেদীনের কাজ যদি এখনো হাতে পায় সাথে সাথেই কিনে নিবে; আমার পরিচিত এমন লোকও আছে যাদের ঘরে এমন কাজ আছে। তারা বলে যে, "আনোয়ার ভাই এক কোটি টাকা অফার দিচ্ছে, ক্যাশ বাড়িতে এসে দিয়ে যাবে। আমি এখনি ফোন করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দিয়ে যাবে"। আর এখন আনোয়ার হোসেন বা অন্য কারো যেমন চন্দনের কাজ যদি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত হয়, তা বিক্রি হবে না কোনো দিন। আমি এ জাতীয় ছবি

কখনোই তুলি না। কারণ মন্বন্তর হলে অবশ্যই ছবি তোলার ব্যাপার থাকে, আমার এক বন্ধু সুজিত তুলেছে, যদিও আমি ওই জাতীয় ছবি সাধারণত তুলি না। তাহলে আমার ছবি কেউ কিনবে বলে তোমার মনে হয়? কেউ কিনবে না।

শুভাশীষ: প্রত্যেকটা শিল্পমাধ্যমেরই একটা বানিজ্যিক উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, একজন পেইন্টারের আঁকা ছবি, কিংবা একজন গায়কের গান ও কিংবা বিক্রি হয়। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও সেটা লক্ষ্য করা যায়।

আনোয়ার হোসেন: হ্যাঁ, সেটাই। যারা ফটোগ্রাফটাকে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কারণে যেখানে সেখানে বিক্রি করেন, তারা ই সাকসেসফুল। আমি যেখানে নিজেই দশ হাজার টাকার ছবি বিক্রি করতে পারি না, একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে বা চন্দনও হয়তো পারে না, সেই জায়গায় আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা ডেইলি চল্লিশ হাজার টাকা আয় করে। এবং যারা বাংলাদেশে এ্যাড ফিল্মের কাজ করছে 'গ্রামীণ' জাতীয় শিল্প বানাচ্ছে। যারা আমার থার্ড, ফোর্থ লেভেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতো তারা এখন ষাট হাজার টাকা পার ডে আর্ন করে। তুমি এক বছর, দু বছর, বিশ বছর ছবি তুলে এক বছর খেটে একটা প্রদর্শনী করলে, তাতে অনেক টাকা খরচ হলো। সেখানে তোমার যদি দশ হাজার টাকায় একটা ছবি বিক্রিই না হয়। আর সে জায়গায় আমি যদি জাস্ট গিয়ে গ্রামীণফোন বা লাক্স এর একটা এ্যাড করি এবং আমি দিনে ষাট হাজার টাকা পাবো। তাহলে তোমার জীবনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এখন আমি আসল কথায় ফিরে আসছি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে। যখন ডিগনিটি নিয়ে প্রশ্নটা আসল, তখন ওরা আমাকে কি বলেছে জানো? "Anwar, as far as Bangladesh is concerned, we are interested in presidential killings, flood, famine, torture on women, throwing of acid, Islamic fundamentalism, poverty." তারা আমাকে জানালো। তারা ভালো মতই খবর রাখে, বাংলাদেশে কি ঘটে এবং কি বিক্রি হয়। সেগুলো ওরা বেঁচে আছে। ভালো ফটোগ্রাফার যে নাই তাতো না, ওদের কাছে ওটাই শিল্প। মায়ের দূরবস্থা, দেশের দূরবস্থা, আমার সন্তানের দূরবস্থা, এগুলোকে তুলে ধরে পৃথিবীর কাছে যেটা তারা 'খায়'। The word 'খায়'। কোন জিনিস খায় আর কোন জিনিস খায় না এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশে এটার জন্য আমি বলব যে, অনেক আলোকচিত্র শিল্পীই দায়ী। ধর, বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পীরাই যদি এ ধরনের ছবি কম তুলে বা না তুলে বা এ তোলার মধ্যে তথাকথিত আমার Dignity টা উপরে থাকে, যে একটা জিনিসের দাম উপরে এসেছে এবং ওরা যদি বলে আমরা এটা বেচবো না। আর বিদেশীরা আমাদের দেশে এসে ক'টাই বা ছবি তুলতে পারবে? ক'টা ফটোগ্রাফার আসতে পারবে এদেশে? এভাবে ছবি তুলে বেড়াতে পারবে? তখনতো একটা দাম ফটোগ্রাফির আসে। শিল্পটা এস্টাব্লিশ করার জন্য এই সেই স্বার্থান্বেষী কিছু পেইন্টার, ক্রিটিক, রাজনৈতিক লোকজন বা গুন্ডাপান্ডা যারা উল্টাপাল্টা টাকা কামায় এবং Possession হিসেবে শিল্পকে রাখতে চায়। তারা শিল্পকে শিল্প হিসেবে দেখে না তো। তুমি খোঁজ নাও, বাংলাদেশে ভালো শিল্প কয় জায়গায় আছে প্রাইভেট কালেকশনগুলোর ক্ষেত্রে? সে লোকগুলোদের দাঁড় করিয়ে যদি জিজ্ঞেস কর তো, 'এই ছবিটা আপনার ভালো লাগে? কত দিয়ে কিনেছেন? ১ কোটি টাকা বা ৫০ লক্ষ টাকা? কেন ভালো লাগে বলেন তো?' মুখ নষ্ট করার আগে তাদের প্যান্ট নষ্ট হবে। I am sorry to put it like that. কাজেই তারা যে শিল্প বুঝে এগুলো কিনেছে তা নয়। সারা পৃথিবীতেই এটা ঘটে। It's a safe investment। অর্থাৎ যেকোনো একটা পেইন্টিং এক কোটি টাকায় কিনলে ওটার Sell value পড়ে গিয়ে দেড়-দু কোটি। Plus I possess নারী, আমার পাওয়ার, আমার মস্তিষ্ক, আমার শিল্প, আমার ধনসম্পত্তি। I think it is from a sense of possession। তো ওই ভাবে পেইন্টিংগুলো এসেছে। বাংলাদেশের মধ্যে যারা পেইন্টিং করে, তাদের মধ্যে বহু ভালো কাজ হয়। অনেক আলোকচিত্রীর চেয়ে ভালো কাজ হয় অনেক পেইন্টিংয়ে আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি বারবারই বলবো, দেশের জেগে ওঠার সময় এসেছে অনেক আগেই। বাংলাদেশে আলোকচিত্রশিল্প অথবা চলচ্চিত্র শিল্পকে শিল্প হিসেবে যদি

ভালোভাবে অন্তর থেকে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তাহলে তো আমাদের খবর আছে। অলরেডি খবরতো হচ্ছেই। আমি গত কয়েকদিন ক্লাসে চলচ্চিত্র দেখলাম, Cinema Paradiso, ইটালির একটা ছবি, যেটা কানে এওয়ার্ড পেয়েছিল। সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও তো তাই শুরু হয়েছে। এর কারণটা কি? বাংলাদেশে ছবি তোলাটাকে শিল্প হিসেবে সম্মান দেয়া হয় না। ভারতবর্ষে সবচেয়ে কনিষ্ঠ অর্থাৎ কমসময়ে পদ্মশ্রী পেয়েছেন একজন লোক, জানো?

শুভাশীষ: রঘু রায়।

আনোয়ার হোসেন: He is a photographer! বাংলাদেশের এক PR জাদুকর, আমার মতে, ছেবলামো কুমার, আমার এনালাইসিসে এবং গ্লোবাল এনালাইসিসে নিকৃষ্ট লেভেলের মাইম আর্টিষ্টকে এওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, নাম বলতে চাইনা। একুশে পদক দেওয়া হচ্ছে থার্ড গ্রেড মাইম আর্টিষ্টকে তার থার্ড গ্রেড ছেবলামির জন্য। আর ফটোগ্রাফার যাদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাদের দেওয়া হয়েছে করুণা করে। আর কিছু পলিটিক্যালি দেওয়া হয়েছে। মরণোত্তর পুরস্কার এম এ বেগ কে, মরণোত্তর মিস্তককে, মরণোত্তর তারেক মাসুদকে দেওয়া হয়েছে। আর কাকে কাকে মরণোত্তর দেওয়া হবে, তা হয়তো মারা যাওয়ার পর তালিকা তৈরি করা হবে। ঐ হিসেবে ফটোগ্রাফিকে ঠিক সম্মান দেওয়া হয় নাই আজ পর্যন্ত। সরকারী লেভেলে কোনোদিনই ফটোগ্রাফিকে ঠিকমত সম্মান দেওয়া হয়নি।

শুভাশীষ: আরেকটা কথা হচ্ছে স্যার, যেটা আপনার কথাতেই উঠে এসেছে, আমাদের ফটোগ্রাফাররাই তো এটার জন্য দায়ী।

আনোয়ার হোসেন: দায়ী! অবশ্যই। দেশের অবস্থার জন্য দেশের প্রধানরাই দায়ী থাকে, ঠিক সেই ভাবেই দেশের আলোকচিত্র শিল্পের এই অবস্থার জন্য দেশের ফটোগ্রাফাররাই দায়ী। যে কোন কারণেই হোক না কেন তারা দায়ী।

শুভাশীষ: স্যার আপনি বললেন যে, বাংলাদেশে ফটোগ্রাফিতে একটা সময় এসেছিল আশির দশকে। ঐ সময়টাতে আপনি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করেন, তখন আলোকচিত্রের একটা ভালো জোয়ার চলছিল।

আনোয়ার হোসেন: আমি শুরু করলাম কোথায়? আমি তো মাঝামাঝি একটা সমুদ্রে। আমার আগেও তো অনেক প্রবীণ ফটোগ্রাফাররা ছিলেন। তাদের দু-চারজনার নাম তো এখন জানোই, তাদের নামই তো লোকে ভুলে গেছে। কাল না কবে এক তরুণের সাথে কথা হলো, বললাম মৃণাল সরকার, তার নামই নাকি শোনে নাই। গোলাম কাশেম ড্যাডি, আমানুল হক, তারা তো বোধহয় এখনো বেঁচে আছেন। তারা তো দেশের রত্ন, এরা তো দেশের ফটোগ্রাফির জন্য কিছু কিছু জিনিস Introduce করা, ফটোগ্রাফিকে চালু করা, এর জন্য প্রাণ দেওয়া এসব ব্যাপার শিখিয়েছেন। আমি এবং আমাদের জেনারেশনটা এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের সময় যে নতুন যুগ শুরু হলো তা শুধু ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রেও, বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও। আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন যুগ আসে। যেমন রেনেসাঁর নাম শুনেছো, দাদাইজমের কিউবিজমের? দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার অধঃপতন ঘটেছে, ফটোগ্রাফিও সেটার সঙ্গী হয়েছে। এটা একটা সহজ ব্যাপার। এটা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

শুভাশীষ: এই ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক বলে মনে করছেন?

আনোয়ার হোসেন: স্বাভাবিক বলে মনে করছি না। Art is very much related to life and culture. ফটোগ্রাফিকে যদি শিল্প করতে হয় তার আগে জীবনকে ও শিল্প করতে হবে। বাংলাদেশের ডাইনে-বামে-উপরে-নিচে যা দেখি, সেটাকে তো শিল্প আমি

বলতে পারবো না। রাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে, অর্থনীতিতে সততার এমন একটা অভাব পাই, তাতে শিল্প আসবে কোথা থেকে? এখন আলোকচিত্রের নতুন প্রজন্ম যারা, তোমরা যদি নতুন কোনো কাজ করতে চাও যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে আর ওতে যদি কোনো সাপোর্ট না পাও, এপ্রিসিয়েশন না পাও তাহলে তো হবে না। আর যাদের কাছে তোমরা সাপোর্টের জন্য যাও তারা যদি এক নাম্বার, দুই নাম্বার বা তিন নাম্বার চরিত্রের হয়, তাহলে তো হবে না। কোনো শিল্পই বিচ্ছিন্ন নয়। Man behind the camera আর world in front of the camera এই দুটো মিলেই তো শিল্প। আমার সৌভাগ্য, আমি এখনো লেন্সের ভেতর তাকিয়ে শুধু সাদা, শুধু কালো, শুধু লাল দেখি না। বাকি যা দেখি, তাতে মন ভরে না অনেক সময়; যদিকে মনটা ভরে সেদিকে কিক করি, বাকি ছবি তুলি না, অন্য দিকে তাকাই না। যারা ফটোগ্রাফিকে জীবিকা হিসেবে নিতে চায়, তাদেরকে প্র্যান করে সমাজের সে মুহূর্তের প্রবাহের সাথে চলতে হয়। সে কারনেই কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি হয়। ঐ যে আমাকে বলা হলো Too much dignity in your work। প্রায়শই Non-dignity work গুলোই বিদেশে বিক্রি হয়, তালি পায়, পদক পায়।

স্বত্বাধীশ: তখনকার প্রজন্মের চেয়ে এখনকার প্রজন্মের ফটোগ্রাফির বিষয়টা অনেক সহজ হয়েছে। আপনারা ফিল্মে কাজ করতেন, এখন ডিজিটাল ফরমেটে ফটোগ্রাফি সবার কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

আনোয়ার হোসেন: এগুলোতে কিছু আসে যায় না। শিল্পের উদ্দেশ্যই হলো আলটিমেটলি একটা গ্লোবলাইজেশন করা। এটাতে আমি তো কোনো সমস্যা দেখি না। এখন ভালো হয়েছে যে, সবাই ছবি তুলতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে ছবি তুলতে গেলে আমার খুব মজা লাগে। ১০-১৫ জনের ফটোগ্রাফারের দল নিয়ে যাই, সেখানে মেয়েও থাকে, যারা ভাল ফটোগ্রাফি করে। গ্রামের অনেক রিকশাওয়ালাদের ভিড়ে ছবি তুললাম, হয়তো চায়ের দোকানের আশেপাশে ছবি তুললাম। এভাবে সবাই মিলে ছবি তোলার ফলে ২০০-৩০০ ছবি হলো। কথার কথা বলছি। অথবা গ্রামে কেউ চাষ করছে বা মই দিচ্ছে বা রূপালী আলোতে চাষী তার সন্তানসহ কাজ করছে, মাঝিদের স্কেনেও তা প্রযোজ্য। দেখা গেল, আমাদের অনেকগুলো ছবি ক্লিক করার ফলে আমরা খুব খুশি। ঐদিন কে যেন আমাকে বলল আমার চেহারা জ্যোতির্ময়। আমি রসিকতা করে বললাম, এটা তো আমার চুল আর দাড়ির জন্য, জ্যোতি তো আর কিছুতে নাই, চুল আর দাড়ি সাদা বলে এটা জ্যোতির্ময় মনে হয়। এই সব কিছুর পরে আবার আমার আশেপাশে যারা আমার ছবি তুলছে, আমার ছাত্রছাত্রীরা, তাদের মাথায় লাল গামছা, পরনে জিনস, Levis-Strauss এর শার্টপ্যান্ট। সবাই মিলে ছবি তোলা মানে It's a fantastic combination. কিন্তু পট করে যে জিনিসটা আমাকে খুব বিস্মিত করে তা হল যে আমাদের ছবি তোলার পর্বটা বা ফেস্টিভালটা শেষ হলো। সাথে সাথে ধর গ্রামের ঐ মাঝিটা, রিকশাওয়ালাটা, যে কাজ করছিল লুঙ্গি পরে তারা তাদের কোছা থেকে মোবাইল বের করে ক্লিক করলো। That is life! And it is excellent! তুমি চিন্তা কর এখন যদি গ্রামের একটা রাখাল বা রিকশাওয়ালা বা কৃষক ছবি তুলতে পারে সেটাই তো শিল্প। এবার সরকার যাই বলুক না কেন, এই হেন লীগ তেন লীগ, পার্টি-ফার্মি, পার্লামেন্ট যে যা বলার যাই বলুক না কেন The common man in the street makes a photo. ফটোগ্রাফী শিল্প হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, এটা জনগনের শিল্প। এটা তো মনের তাগিদ থেকেই আসছে। ও কি এটা গ্রামীণের কাছে বেচবে বা নাকি সে কোনো মেয়েকে Seduce করার জন্য তুলেছে? তা তো না। গ্রামের রাখাল কিংবা মাঝি ক্যামেরা বের করে যে ছবিটা তুলেছে তা It has been already accepted as শিল্প। এতে তো আমি টেকনোলজির কোনো সমস্যা দেখি না।

এমন অনেক আলোকচিত্রী আছেন যারা বউয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে ছোট ক্যামেরা ব্যবহার করতো কারণ তাঁর বউ ছবি তোলা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ছবি তুলতে গেলে বলতেন বাজার করার শখ হয়েছে কারণ বাজার করা মানে বের হয়ে যেতে পারবো। আর ছোটো ক্যামেরা হওয়ার কারণে বাজারের থলেতে ইলিশ মাছের ফাঁকে ঢুকাতে সুবিধা হবে। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি! উনি খুব

সাক্ষাৎকার

ভালো লোক কিন্তু, গানটান করেন, পিএইচডি করা, হাই ফ্যামিলির। আমি তখন বললাম, আপনি বৌকে সামাল দিতে পারলেন না? আপনি ছবি তুলবেন, আপনি পিএইচডি করা, আপনার ছেলেমেয়েরা এখন মাস্টার্সে পড়ছে, আপনি মানুষের ছবি তুলবেন। তখন তিনি বলেন, আনোয়ার ভাই মাঝে মাঝে উইকেন্ডে বউয়ের চার-পাঁচটা ছবি তুলে দেই। এ জাতীয় জটিলতা তো থাকবেই। আমি একবার ছবি তুলতে গিয়ে এরকম জটিলতার মুখোমুখি হই। আমি তো অফিসিয়াল কাজ তেমন একটা করিই না। তো একবার ছবি তুলতে গিয়ে সিকিউরিটি Avis ইন্টিলিজেন্সের লোকজন কানে ফিসফিস করে বলছে, ‘আপনি এখানে দাঁড়াবেন না।’ আমি বললাম, ‘আমার খুশি আমি এদিকে দাঁড়াবো। এ অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলতে সুবিধা, আপনাদের কোনো সমস্যা আছে?’ সিকিউরিটির জন্য আমাকে চেক করে দেখতে পারেন। তখন তারা বলে, ‘The leader doesn’t like to be photographed from this angle. Could you believe it?’ তো উনি আয়নাতে নিজের চেহারাকে শিল্প মনে করেন তাইলে ঠিকই জানেন অ্যাঙ্গেলটা কোনটা। এটা স্বীকৃত হয়ে গেছে শিল্প হিসেবে। আমার কথাগুলি তোমাদের কাছে ironic লাগবে iconic না হলেও। গ্রামের রাখাল ও যদি জানে আর দেশের প্রধান ও যদি জানেন অ্যাঙ্গেলটা কি আর ছবি কিভাবে তুলতে হয় তাহলে তো ফটোগ্রাফি শিল্প হয়ে গেল। So, there is nothing wrong with technology.. and don’t get upset with technology. এর মাঝে ফিল্টার হয়ে বেরিয়ে আসবে শিল্পগাঁথার ছবি। পৃথিবীতে যদি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর না কতো যেনো, আরেক জাতি বলে তেত্রিশ কোটি দেবতা, এই পরিসংখ্যান আমি জানি না, কম্পিউটারে বোধহয় ডাটাটা দিলে ব্রেকডাউন হতে পারে। তাহলে ব্যাপারটা গিয়ে দাড়ালো মহান ব্যক্তিত্ব, মহান ধর্মীয় নেতা বা মহৎ শিল্প অথবা মহান নেতা সমাজে এক দুজনই আসেন একশ বছরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত বলছি যতই ছবি তোলা হোক, যতোই তেত্রিশ কোটি দেবতা আসুক, ঠিক তেমনি যত ফটোগ্রাফার থাকুক না কেনো ভাল কাজগুলোই টিকে যাবে। তোমাদের এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। বরঞ্চ আমি মনে করি এটা একরকম ভালোই হয়েছে। হয়তো দেখা যাবে, খুব সাধারণ লোক যারা ছবি তুলতেই জানেনা, তাদের কাজগুলোই অমর হয়ে আছে। এখন ফেইসবুকে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। ফেইসবুক কনসেপ্টটা মাঝে মাঝে আবার আমাকে বিরক্তও করে। যদিও আমার তিনটা একাউন্ট আছে। ফেইসবুকের জন্য এবং ছবি exist করার জন্য এখন প্রায়ই পুরনো দিনের ছবি দেখি। এইতো সেদিন হুমায়ূন আহমেদের নাটকের শুটিংয়ের একটা ছবি দেখলাম, আরেকদিন দেখলাম শামসুর রাহমান লুঙ্গি-গেঞ্জি পড়া অবস্থায়, হাতে পানীয়, বন্ধুদের সাথে এনজয় করছেন। These are lovely, excellent! কে বা কারা ছবি তুলে ফেললো। এখন অনেক ছবি তোলা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে যেগুলো টিকে গেল ঐগুলোই হল ক্রীম। ওই সমাজের ক্রীম। আমি কিন্তু মহান অর্থে বলছি না। মানবজীবনের ক্রীম হবে, বাংলাদেশের হোক বা আমেরিকার হোক বা যারই হোক। There is nothing wrong in technology, how we use is important. আমার কিছু আসে যায় না, কোন ক্যামেরায় তোলা, কোন যুগে তোলা হল, কি তোলা হল। আমি একটা জিনিস সামনে দেখব আমার মায়ের মুখের মত, আমার সন্তানের মত, একটা গোলাপ ফুলের মত। এই যে জুঁই-চামেলী ফুলের গন্ধের মতো, এটা তো দেখাও যায়না। এটা যে অনুভূতি দিবে সেটাই আসল।

শুভাশীষ: ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বাইরের এজেন্সিগুলোর কিংবা পাশ্চাত্যের প্রভাবটা কেমন বলে মনে হয় আপনার কাছে?

আনোয়ার হোসেন: এই যে আমার এখানে রেকর্ডারটা লাগাইয়া দিলা, আমার এই ক্যামেরাটা, চশমাটা এইডা তো ইন্ডিয়ান মাল, সবই তো পাশ্চাত্যের। হোয়ার ইজ বাংলাদেশ? আমার রক্ত আমার জেনেটিকসের মধ্যে কতটুকু জাতি আছে, আল্লাই জানে। তা না বলাই ভালো। What do you mean by পাশ্চাত্যের প্রভাব? এখন পৃথিবীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বলে কোনো ব্যাপারই নেই। You click you can get all information. ফেইসবুক, টুইটার, উইকিপিডিয়া, উইকিলিকস, গুগল কতগুলো সাইট আছে, ঢাকায়

বিশিষ্ট টিভি চ্যানেল আছে, এতগুলো পলিটিক্যাল পার্টি আছে, ৮৫ টা লোক রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়ায়। হোয়াট ইজ পাশ্চাত্য অব প্রাচ্য? এটার কোনো ব্যাপারই নাই এখন। Everything is global, everything is same, technology has advanced that much, you should open your eyes and souls and judge accordingly.

শুভাশীষ: এসব টেকনোলজি কি আমাদের ফটোগ্রাফিতে প্রভাব ফেলেছে?

আনোয়ার হোসেন: মানুষ কখনো অপেক্ষায় ছিলো না টেকনোলজির জন্য। মানুষের মন সাংঘাতিক বড়। পাখির মনও বড়, মশার মনও বড়, নাইলে মশা তোমারে কামড়াত না। দুষ্ট লোকের বেশি কামড়ায় আরকি মশা। মানুষ যুগে যুগে তার অনুভূতি সম্প্রসারিত করেছে তখনকার পরিস্থিতিতে, তখনকার টেকনোলজি নিয়ে। এটা নিয়ে এত দ্বন্দ্বের কি আছে? Why you are bracketing it? এবং এটা নানা ভাবে চলতে থাকে, একেকটা যুগ আসবে সে যুগের মতো। মানুষের মন তো এখনো পাল্টায় নাই। It is not important, The important is যে দুটো ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, টাইম ফ্যাক্টরটা আমি মানি। একটি হচ্ছে বর্তমান যুগে যা হচ্ছে তা হচ্ছে আজকের সামাজিক, আর্থিক, ফিলোসফিক, ইকোনোমিক, টেকনোলজিক্যাল কনসেপ্ট থেকে। আর প্রস্তর যুগে যা হয়েছে তা হয়েছে সেই সময়ের পদ্ধতিতে, তখনকার তাগিদে। যেমন ২৫০০০ বছর আগে করা ফ্রান্সের গুহার হাতের ছাপটি আমি দেখেছি ভিজিট করেছি। সেখানে গুহার ভেতরে যাওয়াটা বেশ রিস্কি। অনেক মাটির নিচে যেতে হয় আর টেমপারেচারের একটা ব্যাপার আছে। সবমিলিয়ে অনেকগুলি রেসট্রিকশন আছে। একটা বৃদ্ধ খুব ভয় পাচ্ছিলো, পঁচাশি-নব্বই বছর বয়স হবে। আমি তখন কিউতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন এক সাদা চামড়ার মহিলা তার স্বামীকে একটু জোরে জোরে বলছিলেন, 'Do you understand john, you are going to see something which are painted 25000 years ago! Even if you die trying to see it what's the problem?' খুব মজার কথা। উনি ওনার স্বামীকে বলছেন, তুমি ওটা দেখতে গিয়ে মারা গেলেই বা কি? তো আমার বক্তব্যটি হচ্ছে ২৫০০০ বছর আগে যে লোকটি গুহার মধ্যে তার হাতের ছাপটি আঁকেন তার আজকের লেটেস্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে কেউ যখন শট নিচ্ছে এদের মনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি এটা শেল্লিক অর্থে হয়। একজন তার মধ্যে কিছু একটা দাগ কেটেছে আর একজন তার হাতের ছাপ আঁকেছে। আর আজকে যারা মনের থেকে কিছু ছবি তুলছে, আমার বেশিরভাগ ৯৫% কাজ যেরকম। যেমন বই হবে, না প্রদর্শনী হবে, কারো কাছে বিক্রি হবে কিনা এগুলো আমি ভাবিনা। আমার বয়স এখন ৬৪, আমার মনে এখনো একটা তাগিদ আসে। কিছু তুলতে পারলে তুলে ফেলি। তোমরাও যেমন শট নিচ্ছ। It has not changed। যতদিন পর্যন্ত মানুষের মনের শুদ্ধতা থাকবে অনুভূতির দিক দিয়ে, তত দিন পর্যন্ত শিল্প শিল্প হিসেবেই থাকবে, শুধু মাধ্যম বদলাবে। এতে কোন অসুবিধা নাই, এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করো না।

শুভাশীষ: স্যার, ফ্রান্সের রাস্তার অলিতে গলিতে ছবির যে প্রদর্শনীটা হয়, যাকে পোর্টউভার্ত (porte-ouverte) বলে। এটা কি আমাদের দেশে দেখানো যায় না?

আনোয়ার হোসেন: এখানে দেখানো প্রযোজ্য কিনা আমি জানি না, ঢাকা শহরের আজ যে অবস্থা! পোর্টউভার্ত (porte-ouverte) মানে উন্মুক্ত দরজা, আমি বাংলায় আবদ্ধ দরজার মধ্যেই নিরাপদ অনুভব করি না। আর উন্মুক্ত দরজা করলে শিল্প কতদূর থাকবে, শিল্পীদের সহ হাইজ্যাক করা হবে কিনা বা রেইপ করা হবে কিনা। Sorry for the use of the bad words. বা বাসার সবকিছু হাওয়া হয়ে যাবে কিনা, ক্যামেরা সহ সন্দেহ থাকে। কাজেই Society has to be prepare। আমি প্রথম দিকেই বলেছি যে, শিল্প একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। শিল্পের সাথে সমাজের আরো অনেক কিছুই জড়িত। ওটার থেকেই শিল্প আসবে।

কাজেই বাংলাদেশে পোর্টউভার্ত কতটা কার্যকর হবে আমি জানি না। কিন্তু আর্ট কলেজের সামনে যেমন ছবির হাট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা নাকি প্রতি বুধবার না অন্য কোন একদিন ছবি টাঙিয়ে দেয় গাছের মধ্যে বা অন্য কোথাও। এটা অসম্ভব কিছুই না, কিন্তু এটা কখন কোন সমাজে, কিভাবে করছে That is important.. এবং এইটা শুধু ছবির ব্যাপার না, সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পোর্টউভার্ত (porte-ouverte) এর ফ্রান্সের আইডিয়াটা আমাদের এলাকাতেও প্রতিবছর মে মাসের ফাস্ট উইকে হয়। আমি ৪-৫ বার অংশগ্রহণ করেছি। আমি সুবাস্ত নজর ভ্যালী বা এরকম একটা জায়গায় থাকি ঢাকায়। কত লোক উঠে নামে কাজের লোক থেকে শুরু করে মুরব্বি-সাহেব অনেক লোক। আমি সালাম দেই বা মাথা নত করি বা স্মাইল করি, কেউ জবাব দেয় না, জানো? ইয়ং জেনারেশন মনে করে আমার মতলব খারাপ। আর মেয়ে হলে তো কথাই নাই, হয়তো এর মধ্যেই আমি দুশ্রিত্র বলে রিপোর্ট হয়ে যাবে এক ঘণ্টার মধ্যে। আর দাড়িওয়ালা বা কিছু ধার্মিক টাইপের লোক হয়তো ভাবতেছেন, কি ব্যাপার? উনাকে দেখে তো মনে হয় না উনি নামাজ পড়েন। এখন আযান দিচ্ছে, আমি যাচ্ছি নিচে, উনি উপরে যাচ্ছেন কেন? উনার তো মসজিদে যাওয়া উচিত। গড় নোজ, কার মনে কি আছে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াল যে একটা লিফটে আমি উঠতেছি ঢাকা শহরে থেকে, কিন্তু কেউ কারো সাথে কমিউনিকেইট করছে না। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে ঠিক একই লেভেলে না, তারপরেও একই জিনিস প্রযোজ্য এখনকার নগরায়ণে। আনলে একজন শিল্পীর তার নিজের এলাকার লোকজনের মধ্যে পরিচিত হওয়ার জন্য পোর্টউভার্ত (porte-ouverte) টা একটা যথার্থ মাধ্যম। আমাদের এই ঈদের একটা ভালো উদ্দেশ্য আছে না? খালি কুলাকুলি কইরা কারো দমবন্ধ করার তো কথা না। কথা হলো যে, একটু কাছে ঘেঁষা, To open up your heart. আমি যতদূর জানি, রোজারও এইরকম একটা উদ্দেশ্য আছে। পোর্টউভার্ত সময় তিনদিনের জন্য সরকারি সহযোগিতায় একটা জায়গা খুলে দেয়, প্রতিটা শিল্পীর বাসায় যে কেউ ঢুকতে পারবে, শিল্পীর সাথে কথা বলতে পারবে, একটু কাজ দেখতে পারবে, তারপর চলে যাবে। এভাবে কমিউনিকেশনটা বাড়ে। It's a simple thing। এটা অবশ্যই করা যায়। যেমন ধানমন্ডির শিল্পীরা যদি সিদ্ধান্ত নেয়, আমাদের এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত প্রদর্শনী করাবো, তাহলেই হবে। গভর্নমেন্টের একটা সাপোর্ট লাগবে, সততার একটা ব্যাপার থাকতে হবে আর সিকিউরিটির কিছু ব্যাপার থাকে। এটা অবশ্যই করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের এখানে মুশকিল হলো যে চেনার জন্য পোর্টউভার্ত ঠিক দরকার নেই। কারণ দলীয়করণ করে, চাপাবাজি করে, ইনফুয়েন্স খাটিয়ে তুমি এই পনের কোটির মধ্যে হারিয়ে থাকলেও তোমাকে ঠিকই চিনবে লোকে। আর যে সমস্ত দেশে এগুলো একটু কম, যেখানে বিখ্যাত হওয়া ডিফিকাল্ট বা অনেক সময় বিখ্যাত হওয়াটা ইমপর্টেন্ট না। The important is to live, to feel, to give, to exchange. That is the idea. ওইভাবে তুমি যে এলাকায় আছো, তোমার নেইবরদের সাথে একত্র হওয়ার বিষয়টা থেকে পর্তুবাদের আইডিয়াটা এসেছে।

শুভাশীষ: বিষয়টা হলো সামগ্রিকভাবে দেখা

আনোয়ার হোসেন: এভরিথিং, এভরিথিং। আমরা অনেক সময় বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কিছু দেখি। হঠাৎ করে দু একটা নক্ষত্র উজ্জ্বল মতো এসে পড়ে পৃথিবীতে, ওরা বিচ্ছিন্নভাবে অনেককিছু করে ফেলে। কিন্তু যে যুগে যে যাই করেছে, যেমন ধরো লালন তার মতো করেছেন, নবীজী তার মতো করেছেন। কৃষ্ণ তার মতো লীলা করেছেন, রবীঠাকুর একটা ব্যাপার করেছেন। যখন যে যুগে যাই হয়েছে, পারিপার্শ্বিকতা, তখনকার সমাজ, তখনকার চিন্তাভাবনা, সেই জাতির চিন্তা ভাবনা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে।

সাক্ষাৎকার

শুভাশীষ: আমাদের দেশে আগে যারা ফটোগ্রাফি করেছেন তাদের ছবিগুলো সংরক্ষণের একটা বড় বিষয় আসে। যেমন, আমি যদি আপনার ছবিগুলো দেখতে চাই মানে আপনি যদি আপনার ছবিগুলো সংরক্ষণ করে রাখেন তা হলে আমি চাইলেই আপনার তোলা ছবিগুলো দেখতে পারবো।

আনোয়ার হোসেন: বাংলাদেশে আলোকচিত্রের সংরক্ষণ হবে....!!! দেশের যারা মহান নেতৃত্ব বা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওদের কোনো সংরক্ষণ আছে!? ওটা শিখতে হবে প্রথমে, How to preserve.. তারপরে শিল্প আসবে। আমাদের দেশে কোন সংরক্ষণ দেখি না।

শুভাশীষ: কিন্তু স্যার এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা তো হওয়াই উচিত।

আনোয়ার হোসেন: ওই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, সামাজিক অর্থের যে ব্যাপারটা, এটা দেশের যে জিনিসগুলো ভালো বা যে জিনিসগুলো ইমপোর্ট্যান্ট, এটা সংরক্ষণ করতে হবে। অন্তর থেকে সংরক্ষণের যে ব্যাপারটি আছে তা এখনো ঘটেনি। আমার আলোকচিত্র শিল্প নিয়ে কি সরকারিভাবেই এটা ঘটেনি। এটা একটা সার্বিক ব্যাপার। আলোকচিত্র যে বাংলাদেশের কথা বলছে এতো বছর ধরে, ৭১ এর পর থেকে এটা হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেই ভাবে ঐ অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসলে সংরক্ষিত হবে। তো ঐ নেগেটিভ ছবিগুলো তুলে, বিদেশে বিক্রি করে বা এজেন্সি চালানো বা হাই বাজেট করে অ্যাড চালানো পণ্য বিক্রির জন্য, এভাবে তো সংরক্ষণ হলো না।

শুভাশীষ: এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক যে অভাব আমাদের দেশে আছে ফটোগ্রাফটাকে শেখানোর জন্য। টেলিভিশন এণ্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ গত পরশু দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন হয়েছে যা অনেক আগে হলে এ সেক্টরে অনেক এগিয়ে যেত। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছে স্যার কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এই জায়গাটি কোথায়? ফটোগ্রাফিটা এখনও এই জায়গায় আসেনি।

আনোয়ার হোসেন: না কেন? এসেছে না। তোমাদের এখানে তো অনেকগুলো সংগঠন আছে আলোকচিত্র শেখানোর জন্য। না না, এখানে দুই একটা ইনস্টিটিউটে ফিল্ম আছে, ফটোগ্রাফি আছে। প্রাইভেট লেভেলে আছে, ওরা শেখায় তো।

শুভাশীষ: প্রাইভেট লেভেলে আছে কিন্তু ওটা তো বেশ ব্যয়বহুল। পাবলিক ও প্রাইভেটে তো অনেক ভিন্নতা আছে। একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ও পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টের খরচের একটা তফাৎ থাকে। এ সেক্টরেটাকে যদি পাবলিক করা যেত। তাহলে আসার জায়গাটা বেড়ে যেত।

আনোয়ার হোসেন: এরশাদ সাহেবের সময় কিছুটা আমাদের আন্দোলনের জন্য শিল্পকলা একাডেমীতে একটা আইন পাশ হয়েছিল। এর মাধ্যমে শিল্পকলাতে একটা ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট চালু হওয়ার কথা ছিলো। পার্লামেন্টে পাশ হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। কিন্তু কিছু প্রাইভেট অর্গানাইজেশন গড়ে উঠেছে। এখন কেন হয়নি তার একটা খোঁজ নিয়ে দেখ যে কে এটা কেন সেবোটা করল। এরশাদ সরকারের সময় এটা হয়েছিল, আইন হিসেবে পাশ হয়েছিল অধ্যাদেশ নাম্বার হেনতেন। একটু খোঁজ নিলে অনেক বিড়াল বেরিয়ে পড়বে।

শুভাশীষ: ওই আন্দোলনের সঙ্গে আপনি কি জড়িত ছিলেন?

আনোয়ার হোসেন: কিসের? আমি কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম না। আমার আন্দোলন আমার অন্তরে, আমার শাটারে। এখনও বেশ শক্ত আছি। আমি তো আন্দোলন করি না। হা হা হা!!

শুভাশীষ: স্যার আপনার একটা সাক্ষাৎকারে পড়েছি পশ্চিমা এজেন্সিগুলো অনেক সময় আপনার ছবি এবং কাজগুলো পছন্দ করেনি।

আনোয়ার হোসেন: আগেই তো বললাম There is too much dignity in my works .

শুভাশীষ: ওরা কি সব সময় এমনটা করত?

আনোয়ার হোসেন: ওটা শুধু আমার ছবির ক্ষেত্রেই নয় বাংলাদেশের যেকোন ছবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলাদেশের রূপ সম্বন্ধে যে ইম্প্রেশন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, যে জিনিসটা তারা বিক্রি করে। আমি ঝগড়া করাতে ওরা বলল But Anwar, I have to run my office. আমার অফিস চালাতে হবে, স্টাফদের বেতন দিতে হবে। যখন যে দেশের জন্য যা প্রযোজ্য ঐ জাতীয় জিনিস দিয়ে সারভাইভ করে। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলোও এটা করে থাকে।

শুভাশীষ: বাংলাদেশের প্রবীন ফটোগ্রাফার হিসেবে আপনি এখন বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখেন, কিরকম দেখেন?

আনোয়ার হোসেন: বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ বরাবরই উজ্জ্বল ছিল। আমাদের যে কটা মাধ্যমে ক্রেডিট আসছে পৃথিবীতে ফটোগ্রাফির স্থান Logistically, Statistically খুবই উঁচুতে। আন্তর্জাতিক লেভেলে যদি বড় করে পৃথিবী দেখেছি, ইভেন, ইন্ডিয়াতে আমাকে অনেকে বলে, সাম্প্রতিককালে কলকাতার লোকেরাও বলে পৃথিবীর সব জায়গায় বাংলাদেশে আলোকচিত্রীদের এতো ভালো কাজ দেখি এতো সুনাম দেখি। কিন্তু ফেইলারটা হয়েছে অনুধাবনে। আমাদের দেশের যারা বুদ্ধিজীবী, আমি দুঃখিত যে তারা ভিজুয়ালি কিছুটা Dull। ঢাকা শহরে অন্যায় ও অবিচার মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে গেলো, এটা বলা ইজি বা 'চুল তার তার ভিজুয়ালি কিছুটা Dull। ঢাকা শহরে অন্যায় ও অবিচার মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে গেলো, এটা বলা ইজি বা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এক লাইনে সারা যায়। এটা বলার জন্য একজন মানুষের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তখন ঐ একটা লাইন আসে কবিতাটাকে যদি ঐ সম্মানটা দেয়া হয়। তাহলে একটা ভালো ছবি বা সাংঘাতিক ভালো ছবি যিনি তুলেন তিনিও ঐ লেখকের সারা জীবনের জীবনবোধ, অভিজ্ঞতার প্রকাশ করেন। এটা আর একটু কঠিন একটা খাতা নিয়ে জয়নুলের স্কেচটা নিয়ে একটু আবার ঠিকঠাক করতে পারতেন। নজরুল, রবীন্দ্র তো কাটাকুটি করে এটাকে শিল্পই করে ফেললেন। কিন্তু একজন ফটোগ্রাফারকে ডিসিশন নিতে হয় সাথে সাথে। You don't have time, You don't even have one second. মানে যেই ডিসিসিভ মোমেন্ট বা ছবি তোলার জন্য যে কারেন্ট টাইম যা এক সেকেন্ড বা তার চেয়ে কম। এটার যে সম্মানটা দেওয়া উচিত, এই অনুধাবনটা এখনো বাংলাদেশে আসেনি, বুদ্ধিজীবী মহলে আসেনি। এটা একটা বিরাট ব্যর্থতা, এর জন্য ভালো কিছু হলো না।

শুভাশীষ: ভবিষ্যতে এর কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

আনোয়ার হোসেন: সম্ভাবনা! পৃথিবীর সব দেশের মতোই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। সম্ভাবনা; ধরে নাও আজকে ৭১। ভেবে নিতেই পারি ৪০ বছর পরে কি হবে, সেটা দেখেই সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। যে সম্ভাবনাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলোর জন্য আমরাই দায়ী। কিছু লোক, কিছু আলোকচিত্রী, কিছু ব্যবসায়ী। আত্মশুদ্ধি না হলে শিল্পশুদ্ধি কি করে হয়? শুদ্ধ শিল্প সৃষ্টিইতো হয় না, শিল্প শুদ্ধি তো পরের কথা। আত্মার সৃষ্টি তো হয়েই গেছে কিন্তু প্রেতাত্মারাও আছে।

শুভাশীষ: আপনার শিল্পী জীবনের সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা শুনতে চাই।

আনোয়ার হোসেন: গত ২০১০ সালে আমার আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে আমার ছবিগুলো অনেককেই ভাবিয়ে তোলে। আমি অনেকের সামনে কলকাতায় তোলা আমার ছবিগুলো দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এর কোনটি পঞ্চাশ ডলারের ক্যামেরা দিয়ে তোলা আর কোনটা 7D

বা 5D দিয়ে তোলা? এবং আমি বললাম, কেউ যদি এর সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তাকে আমি আমার ছবির প্রিন্ট গিফট করব। কিন্তু কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারে নি। পরে সবাইকে বলার পর আমার পঞ্চাশ ডলারের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলো দেখে বিস্মিত হয়। এবং জিজ্ঞেস করে, এটা কিভাবে সম্ভব! আমি ব্যাখ্যা করি এই ক্যামেরাটা পঞ্চাশ ডলারের হলেও এটা আমার নিজের ক্যামেরা এবং আমার ভালোবাসা থেকেই এই ছবিগুলো তৈরি হয়েছে, তাই এটা সম্ভব। সব আলোকচিত্রী বা শিল্পীর ক্ষেত্রেও এই 'ভালোবাসা' সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

সুভাষীষ: বাংলাদেশের আলোকচিত্র নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কি?

আনোয়ার হোসেন: আমার খুব ভাবতে অবাক লাগে, এদেশে চলচ্চিত্রের ফেডারেশন আছে, থিয়েটারের ফেডারেশন আছে এমনকি বাস্তহারাদের কিংবা রিকশা শ্রমিকদেরও ফেডারেশন আছে কিন্তু এখনও ফটোগ্রাফিক ফেডারেশন হয়নি। তাহলে এদেশে আলোকচিত্র শিল্পের বিকাশ কেন ঘটবে, কিভাবে ঘটবে? ফেডারেশন, সোসাইটি, কাব, ফোরাম, পিকচার এজেন্সি এগুলোর পার্থক্য বোঝার সময় এসেছে অনেক আগে। এগুলোতো এক নয়। অর্থ উপার্জন করার জন্য পিকচার এজেন্সি কিংবা একটা আঞ্চলিক তৃপ্তির জন্য ফটোগ্রাফি কাব বা সোসাইটি, আর জাতীয় পর্যায়ে আলোকচিত্র শিল্পকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সুদূরপ্রসারী সম্মুখে এগিয়ে নেয়ার নিমিত্তে একটি ফেডারেশন অনেক উচু মানের একটি সংগঠন। বিভিন্ন ফটোগ্রাফিক সোসাইটি, একটি সংসদ হয়তো বা পিকচার এজেন্সি একটি জাতীয় ফেডারেশনের অঙ্গসংগঠন হতে পারে মাত্র।

বাংলাদেশের আলোকচিত্রকে পৃথিবীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যে কয়েকজন আলোকচিত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের অন্যতম হলেন শহিদুল আলম। দূক এবং আন্তর্জাতিকমানের ফটোগ্রাফি স্কুল পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ছবিমেলায় মূল আয়োজক হিসেবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এছাড়াও দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটোগ্রাফির শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কর্মী মহসীন কবীর এবং মোহাম্মদ কামরুল হাসান।

মহসীন কবীর: বাংলাদেশে আলোকচিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এখনো সেভাবে গড়ে উঠেনি, এর কারণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

শহিদুল আলম: বাংলাদেশে আলোকচিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি গড়ে না উঠার পেছনে কয়েকটা কারণ আছে, প্রধানত আমি মনে করি যারা আমাদের দেশের সিদ্ধান্তকারী, কর্ণধার এইসব ব্যাপারে, তারা ফটোগ্রাফির ব্যাপারে অজ্ঞ।

কামরুল হাসান: তার মানে হচ্ছে যারা কর্ণধার তাদের ফটোগ্রাফির উপর জ্ঞান থাকা উচিত..

শহিদুল আলম: সেটা শুধু ফটোগ্রাফির ব্যাপার বলে নয়, আমি মনে করি একবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেকটি শিক্ষিত নাগরিক বলে যদি আমাদের মনে করতে চাই তাহলে আমার ফটোগ্রাফির ব্যাপারে জানা দরকার। যেমন ধরেন, আপনি যদি এখন বিজ্ঞান পড়েন এবং বলেন আমি কম্পিউটার জানি না, এটা কেউ গ্রহণ করবে না। সাধারণভাবে আমাদের চারপাশে আলোকচিত্র যেভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে, যেভাবে আমাদের জীবনকে একভাবে দাঁড় করায়, আমাদের মানস গঠন করার ক্ষেত্রে, আমাদের চিন্তাচেতনায় এতো বড় প্রভাব রাখে, সেখানে এই বিষয়ে না জানার কোনো যুক্তিই নেই। আমি মনে করি, এখন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ও এটা থাকা প্রয়োজন। একসময় হয়তো এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। শিল্পকলার দিক থেকে এখন এটা সবচাইতে মজার দিক যেখানে ভালো কাজ বের হচ্ছে, অগ্রগতি আছে, পরিবর্তন হচ্ছে, এক কথায় একটা বিপ্লব ঘটছে। সেখানে আমাদের এখানে চারুকলাতে আলোকচিত্রের প্রশিক্ষণই দেওয়া হয় না, এটা একটা অভুত জিনিস। কাজেই আপনি যেটা বললেন সেটা আমি গ্রহণ করি, যে জায়গায় আলোকচিত্র সংক্রান্ত জায়গা আছে সে জায়গায় থাকাই দরকার। যেমন আমাদের পত্রপত্রিকার মধ্যে পিকচার ডেস্ক নেই। একজন নিউজ এডিটর যে সিদ্ধান্ত নেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতাই তার নেই, কিন্তু তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কারণ ক্ষমতা তার কাছে। এই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই চলে এবং এটা একটা বড় কারণ। সেটা বলতে কোনো অসুবিধা নাই আলোকচিত্রের কারণে সারা পৃথিবীতে এখন বাংলাদেশ পরিচিত, বাংলাদেশ সমাদৃত। সারা পৃথিবীর আলোকচিত্রীরা তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশের দিকে দিকনির্দেশনার জন্য। অথচ আমাদের দেশেই এই বোধটা তো নেই এবং এটার স্বীকৃতিও নেই। এটা ঐ অজ্ঞতার কারণ।

কামরুল হাসান: বাংলাদেশে কিছুদিন আগে ফটোসাংবাদিকদের ওপর হামলা হল। ফটোসাংবাদিকদের ওপর পুলিশের এরকম ক্রমবর্ধমান হামলার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? মানে ফটোসাংবাদিকরা কি তাদের আলোকচিত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের এমন কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে যে তাদের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে?

শহিদুল আলম: আমি বলব যে, যেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে, আলোকচিত্রী এবং সাংবাদিকের কাজ দেশের মানুষের জন্য, সরকারের জন্য না। সরকারকে সাহায্য করা বা সরকারের প্রচার বাড়ানো বা সরকারকে ভালোভাবে দাঁড় করানো আলোকচিত্রীর কাজ না, বরং আমি বলব, জনগণের স্বার্থে যত রকমের ছবি তোলা, রিপোর্টিং করা দরকার সেটা করা তার কাজ।

আমাদের এখানে সমস্যাটা হয়ে গেছে সরকার যেহেতু গণমুখী না, সে তার নিজের স্বার্থ দেখে, জনগণের স্বার্থ দেখে না। সরকারের ক্ষেত্রেই না এটা ডাক্তারের ক্ষেত্রেও হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয়েছে। যখন কোনো প্রভাবশালী দল দেখেছে, তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা কাজ করছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে তারা হামলা চালিয়েছে। সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে তথ্য তুলে ধরা, জোরালোভাবে যুক্তি দাঁড় করানো, প্রামাণ্য দলিল দাঁড় করানো, সেটা করতে গেলে যারা প্রভাবশালী তারা স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি করেন, তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এটা যায়। সরকার তার স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে আলোকচিত্রীদের আক্রমণ চালায় পুলিশের মাধ্যমে। যেই পুলিশ জনগণের, যে পুলিশের বেতন আমি-আপনি আমাদের আয়কর থেকে দেই। প্রভাবশালী দল তাদের বিরুদ্ধে যখন যায়, তখনও তারা আক্রমণ করে এবং এটা খুব লজ্জাজনক যে আক্রমণগুলো করে তারা পার পেয়ে যায়। এটা কোনো কালেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এবং আমার মনে হয় এ ধরনের জিনিস আমাদের দেশে হয়েছে এ লজ্জা আমাদের আজ বহন করতে হবে এবং এটার প্রতিবাদ আমাদের করতেই হবে। শুধু তাই না, যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো আইনের চোখে অপরাধ এবং যারা যারা এগুলোর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কতটুকু হবে আমি জানি না কারণ আমাদের এখানে সরকার কখনোই গণমুখী হয় না, তার নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনো কিছু দেখেনি। এবং সেই কারণে সমস্যাগুলো তৈরি হয়। আশা করি আলোকচিত্রীদের কাজের মাধ্যমে এটা একসময় বদলাবে।

মহসীন কবীর: বাংলাদেশে সরকারীভাবে যে সকল প্রতিষ্ঠান- যেমন শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদিতে ফটোগ্রাফির নার্সিং হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি। এর অন্তরায় হিসেবে কী কী বিষয় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

শহিদুল আলম: সরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠানে আলোকচিত্রকে লালন পালন করার কথা তারা সেটা একেবারেই করেনি। শিল্পকলায় অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পরে '৮৯ সনে একটা বিল পাস করা হয়েছিল যে, শিল্পকলায় একটা ফটোগ্রাফি বিভাগ হবে। সে থেকে আজ পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়ন এতগুলো সরকার গেছে, কেউই করেনি। শুধু তাই না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো জায়গায় ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষণের একটা বিভাগ নেই। ইরানের মতো দেশে, তেহরানে পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটোগ্রাফিতে মাস্টার্স ডিগ্রি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে একটা বিভাগ পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি, এমনকি গণমাধ্যম যে বিভাগটা রয়েছে তার মধ্যে ও ফটোগ্রাফির যে অংশ রয়েছে সেটা অত্যন্ত নগণ্য একটা অংশ।

মহসীন কবীর: আমরা শুনেছি চারুকলায় নাকি একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছিল---

শহিদুল আলম: ডিপার্টমেন্ট কখনো ছিলো না, করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, করা হয়নি আজ পর্যন্ত। চারুকলার জন্য ফটোগ্রাফি বিভাগ ফটোগ্রাফির ডার্করুম ইত্যাদি করার জন্য একটা অনুদানও পাওয়া গেলো কিন্তু সেটা আর কাজে লাগানো হয়নি, অপচয় করা হয়েছে এবং এটাতে আমি আগেই বললাম যে, একবিংশ শতাব্দীতে শিল্পকলার সবচেয়ে মজার ক্ষেত্রই হচ্ছে আলোকচিত্র। আলোকচিত্র নিয়ে শুধু আলোকচিত্রী না আলোকচিত্রের বাইরে যারা আছে তারাও কাজ করছে। অনেক অসাধারণ কাজ হচ্ছে আর আমাদের দেশে এটা পড়ানোই হয় না। এটা হচ্ছে লজ্জাজনক আর তার চাইতে বেশি আমি মনে করি যে, এর মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বকল করা হচ্ছে, তাদের ঠকানো হচ্ছে। পরিস্কারভাবে তারা বেতন দিয়ে পড়তে আসছে আর যে জায়গায় তারা পড়ছে সেখানে এ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পড়ানো হবে না সেটা ভাবাই যায় না। বিজ্ঞান পড়তে এসে আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়ে আর একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ না হয়, সেই বিজ্ঞান পড়াকে কেউ গ্রহণ করবে না। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটা কিন্তু সমস্যাটা সেই একই জায়গায় যারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী তারা অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞ মানুষগুলোই আমাদের কর্ণধার, আমাদের দিকনির্দেশনা দেন, এদেরকে ঝেড়ে ফেলে ঢালাওভাবে বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে। একসময় আশা করি আপনারা সেই জায়গাটা যাবেন, সেই পরিবর্তনগুলো আনবেন। তো তার আগে এই বুড়োবুড়িদের দিয়ে সেটা হবে এটা আমি কখনো মনে করি না।

কামরুল হাসান: আপনি কি কখনো সরকারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে?

শহিদুল আলম: বহুবার, বহুবার এটাকে নিয়ে লেখালেখি করেছি, বলেছি, বাগড়া করেছি, করে যাচ্ছি। কিন্তু লাভটা হয়েছে কী? একটা হচ্ছে যে তার কান থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে তার বুদ্ধি থাকতে হবে। দুটোই যেখানে নেই সেখানে শোনার মানুষ তো নেই।

কামরুল হাসান: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আলোকচিত্রীদের বর্তমান অবস্থান কিরকম বলে আপনি মনে করেন?

শহিদুল আলম: সেটা আমি এক অর্থে আগেই বলেছি। সত্যিকার অর্থেই এখানে একটা বিপ্লব ঘটেছে। আমি যদি সহজভাবে বলি, আমরা ছবিমেলা ২০০০ সনে শুরু করেছি, ভারত আমাদের পাশের দেশ, এত বড় দেশ। এরা এত বছর ধরে আমাদের দেখে দেখে শিখেছে, আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছে। আমরা বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করেছি। আমাদের সহযোগিতা নিয়ে গত বছর প্রথম তারা ফটো ফেস্টিভাল করেছে। যেই আন্তর্জাতিক ফটো ফেস্টিভাল বাংলাদেশ ২০০০ সনে করেছে, ভারত সেটা করলো ২০১১ সালে। চীন করেছে আমাদের পরে, জাপানে এখন একটা ফটো ফেস্টিভাল। বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে এই অঞ্চলকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আমরা এটা করার পরে কম্বোডিয়ায় হয়েছে, এখন তারপরে মিয়ানমারে তারা এটা করার চেষ্টা করছে। অন্যান্য যে দেশগুলো যেমন সিংগাপুরে, মালয়েশিয়ায় হয়েছে। এরা আমাদের দেখাদেখি, এই শিল্পীরা আমাদের এখানে এসে অংশগ্রহণ করেছে, ফিরে গিয়ে আমাদের সাহায্যে তারা এ জিনিসগুলি করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশিরা যেভাবে পুরস্কার পায় আলোকচিত্র জগতে, অন্য দেশ গুলো তার ধারেকাছেও নেই। এই যে অলিম্পিকস হচ্ছে, এই হচ্ছে, ঐ হচ্ছে, একটা কিছু পেলেই আমরা সেটা নিয়ে এতো লাফালাফি করি। অথচ আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ যে প্রায় শীর্ষস্থানে, ছোট্ট একটা দেশ, আমাদের এতো আর্থিক সমস্যা, তারপরেও আমরা কতো এগিয়ে আছি। বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটা তীর্থস্থান আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র মহলে এবং লোকজন বসে থাকে কখন ছবিমেলা হবে এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে আসার জন্য। আমি গতকাল একটা ইমেইল পেলাম, অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় এগারোজনের একটি দলকে পাঠাচ্ছে ছবিমেলায়, তারা দেখবে বলে। তারা স্থান পায়নি ছবিমেলায়, কারণ আমরা যখন কাজ বাছাই করেছি ছবিমেলায়, তারা টেকে নি। তারপরেও তারা আসবে দেখার জন্য, শেখার জন্য। আমাদের দেশের এই পাঠশালার মাস্টাররা এখন অন্যান্য দেশেও মাস্টারি করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সেই জায়গায় আবার শুধু তাই না, আমরা এত সবার পরেও আমাদের কিন্তু কোনো এক্রিডিটেশন নেই, স্বীকৃতি নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের স্বীকৃতি দেয় না। অথচ তাদের মাস্টার্স এর ছাত্র-ছাত্রীদের কিন্তু আমাদের কাছে পাঠায় প্রশিক্ষণের জন্য, তো সেই অদ্ভুত কিছু কিছু জিনিস রয়েছে। সেটা না হয় দেশের কথা বললাম, আর আন্তর্জাতিকভাবে তো বলেছি, একেবারেই শীর্ষস্থানে বাংলাদেশ। লোকজন তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশ থেকে কি আসবে, বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে দেখে। এবং সেই জায়গায় আমাদের নিজেদের দেশেই স্বীকৃতি নেই, এটা একটা অদ্ভুত জিনিস।

মহসীন কবীর: বাংলাদেশের মতো একটা দেশে ফটোগ্রাফির জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটা ফটোগ্রাফি স্কুলই কি যথেষ্ট?

শহিদুল আলম: না, একেবারেই না, একেবারেই না। পাঠশালা একটা ছোট্ট স্কুল। কিন্তু অনেকেই মনে করেন এটা পৃথিবীর সেরা স্কুল। কিন্তু তারপরেও পাঠশালাকে ও আরো অনেকদূর যেতে হবে, পাঠশালার কাঠামো আরো শক্তিশালী করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের আরো সুযোগ দিতে হবে, আরো অনেক ছাত্রছাত্রীর জায়গা করে দিতে হবে।

মহসীন কবীর: এর পাশাপাশি আরো দুয়েকটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়ালে হয়তো এ প্রসঙ্গটি আসত।

শহিদুল আলম: আমি গ্রহণ করছি, তখন সেই তুলনাগুলো হবে। তুলনা না থাকলেও আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে আমাদের

আরো অনেকদূর যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা এক, নিঃসন্দেহে আমাদের আরো থাকার কথা, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথা, আমাদের ফর্মাল সেক্টরে যে প্রশিক্ষণগুলো থাকার কথা সেগুলো হওয়া দরকার। আশা করি একসময় হবে। আপনারা যে কাজগুলি করছেন সেগুলির মাধ্যমে, আমরা যে কাজগুলো করছি সেগুলোর মাধ্যমে ধাক্কা দিতে দিতে একসময় আশা করি টনক নড়বে। কিন্তু আপনা আপনি হবে না, নিরন্তর লড়াই করে যেতে হবে।

মহসীন কবীর: শিল্পচর্চার পাশাপাশি একজন আলোকচিত্রীর সামাজিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু ভূমিকা রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

শহিদুল আলম: প্রশ্নটা হচ্ছে, শিল্পচর্চার পাশাপাশি আলোকচিত্রীর সামাজিক দায়িত্ব পালনে কি ভূমিকা রাখা উচিত? আমি বরং ব্যাপারটাকে উল্টোভাবে দেখি। আমি নিজে আলোকচিত্রকে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শিল্পকলার দিক থেকে এটা আসলে একটা অসাধারণ দিক এবং এটাতে অনেক মজার মজার কাজ হচ্ছে, অসাধারণ কাজ বেরোচ্ছে। সারা পৃথিবী তাকিয়ে থাকে আলোকচিত্র আমাদের কি দেবে এবং সেটাকে আমি কোনোভাবেই ছোট করছি না। আমি নিজে আলোকচিত্রে এসেছি এটার সামাজিক ক্ষমতা আছে বলে, সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে বলে এবং সমাজের পরিবর্তনে এত বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে।

কামরুল হাসান: মানে একজন কেমিস্ট এর চেয়েও বেশি ভূমিকা রাখা যাবে বলে?

শহিদুল আলম: তা তো বটেই। এটা শুধু কেমিস্ট বলে বলছি না, বাংলাদেশে আর একজন রসায়নবিদের কতোটাই বা প্রয়োজন? সমাজকে আরো ভালোভাবে গড়ার ক্ষেত্রে একজন আলোকচিত্রী অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি একজন, তার আগে আরো অনেকেই এসেছেন এভাবে। বিশেষ করে ফটোসাংবাদিক যারা রশীদ তালুকদার, জালাল উদ্দিন হায়দার, আল নাজির এরা অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। আমাদের একান্তরের এই একমাত্র প্রামাণ্য দলিল এই আলোকচিত্রীদের কাছে রয়েছে। তারপরেও সেটা গুরুত্ব দেয়নি, বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত একটা ভালো আর্কাইভ নেই আমাদের একান্তরের ছবিগুলোর উপরে। আমরা সেখানে বসে বসে, রশীদ ভাই তো মারাই গেছেন, তার আগে উনি উনার সম্পূর্ণ নেগেটিভগুলো আমাদের দিয়ে গেছেন। একান্তরের দেড় লক্ষের বেশি নেগেটিভ আমরা স্ক্যান করেছি নিজেদের খরচে, নিজেদের আবেগের কারণে, সরকারের একটা দায়িত্ব ছিলো না? সেটা তারা পালন করে নি। তবে যাই হোক, সেগুলো ভিন্ন কথা, তবে আপনার মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। অবশ্যই আলোকচিত্রের একটা সামাজিক দিক রয়েছে, অত্যন্ত বড় ভূমিকা আলোকচিত্র সমাজে রাখতে পারে। এবং সেই কারণেই ভালো আলোকচিত্রীদের পেছনে পুলিশ দাবড়ানোর চেয়ে তাদেরকে আরো কিভাবে শক্তিশালী কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে, তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা কিভাবে আনতে পারে, তাদের কাজ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে কি ভূমিকা রাখতে পারে সেটাই হওয়া উচিত সরকারের দায়িত্ব।

মহসীন কবীর: তরুণ প্রজন্মের যারা বর্তমানে আলোকচিত্র চর্চায় আসছে তারা ঠিক কতোটা সঠিক পথে এগুচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? তরুণ আলোকচিত্রীদের কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত?

শহিদুল আলম: যেহেতু ছোট দেশ, সেই কারণেই আমরা অল্প কিছু করলেই বাহবা পাই। এটা হতেই পারে। আমার মনে হয়, একদম ভূতের মতো খাটার কোনো বিকল্প নেই। প্রচুর পড়াশুনা করার কোনো বিকল্প নেই। অনেকভাবে চর্চা করার কোনো বিকল্প নেই, তার সাথে যে জিনিসগুলো লাগে সেটা হচ্ছে সাহস এবং এই সাহস ওই বন্দুকের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নয়, নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস, নিজেকে শোধরানোর আজীবন চেষ্টা করার সাহস, আরেকজন থেকে শেখার সাহস, আমার চাইতে আরেকজন বেশি জানে, এটা গ্রহণ করা, স্বীকার করা এবং প্রকাশ্যে বলতে পারার সাহস। সেই জায়গাগুলি আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় থাকে না। আমি সেটাই বলবো এবং যেই জিনিসটা তার সাথে করতে হয়, আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে ভালো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, কারিগরি

দিক থেকে শেখার প্রয়োজন রয়েছে, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং পৃথিবী কিভাবে বদলাচ্ছে, এই প্রশ্নটা কিভাবে বদলাচ্ছে সেটার সাথে তাল মিলিয়ে সারাক্ষণ খেয়াল রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

কামরুল হাসান: পাশ্চাত্যে আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কিংবা মেজরিটি ওয়ার্ল্ডকে কোন চোখে দেখতে চায়?

শহীদুল আলম: পাশ্চাত্যের স্বার্থ সবসময় ভিন্ন। আমাদের দেশে আমাদের উদ্ধার করার জন্য তারা কখনোই আসেনি, তারা নিজের স্বার্থেই এসেছে। এনজিও মহল বলেন, ডোনার মহল বলেন আমি এদের ব্যাপারে খুব একটা যে ভালো চোখে দেখি তা নয়। কারণ যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে দারিদ্র্যমোচন করার প্রয়োজন থাকতো, তাহলে এত বছর এত টাকা ঢালার পরও আমরা এই অবস্থায় থাকতাম না। এর কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। পাশ্চাত্য বিশেষ করে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম আমাদের গরিবানাকে কাজে লাগিয়েছে।

কামরুল হাসান: আমাদের দেশের নেগেটিভ ডকুমেন্টেশন করতে ওরা বোধহয় খুব পছন্দ করে---

শহীদুল আলম: শুধু পছন্দ করে না, এটাই তাদের প্রয়োজন। তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে ওভাবে রাখতে হয়, দেখাতে হয় এবং আমাদেরকে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা নিজেরা অনেক সময় করি, আমাদের আলোকচিত্রীরা অনেক সময় ওই পাশ্চাত্যের কারণে, তাদের তাগিদে তারা যেভাবে বাংলাদেশকে দেখতে চায় সেভাবে উপস্থাপন করে।

মহসীন কবীর: আমাদের দেশের ছবির দেশীয় বাজারটা কি গড়ে উঠেছে?

শহীদুল আলম: এখন উঠেছে, এটা তো রাতারাতি গড়ে উঠে নি, বহু বছর লেগেছে। তারপরেও আমি বলবো, সেই জায়গাগুলি এখনো পরিষ্কার না। আমাদের এখানে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ছবি চুরি করে। যে ছবিগুলো নিজেদের আলোকচিত্রীদের তোলা সেখানেই তারা নাম দেয় না, অন্যদেরটা তো দেয়-ই না। এবং ডাহা, সরাসরি চুরি করে, আবার এগুলো নিয়ে প্রতিবাদ করলে তারা ক্ষেপে যায়। তো এই সংস্কৃতিটা এখানে দাঁড়িয়ে গেছে এটা তো রাতারাতি বদলাবে না। শুধু পত্রপত্রিকা না সব জায়গায়-ই।

মহসীন কবীর: আমাদের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারেও আমরা আলোকচিত্রের কপিরাইটের বিষয়ে আলাপ করবো-

শহীদুল আলম: আপনাদের সেমিনারে এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়, তাহলে আমি খুব খুশির ব্যাপার বলবো। এই সচেতনতা ভীষণ ভাবে দরকার এবং এই বড় বড় এজেন্সি যারা আছে অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি বলেন, প্রকাশক বলেন, পত্রিকা বলেন, তাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত, তারা যে দিনরাত চুরি করছে, এই বোধটা তাদের অন্তত থাকা উচিত। তারা বলে, নাম ছাপিয়ে দেয়া একটা বিশাল জিনিস। একজন আলোকচিত্রীর করে খেতে হয়, সে একজন পেশাজীবী। পত্রিকার ওরা পত্রিকা বিক্রি থেকে আয় করে, অথচ আলোকচিত্রীর কাজ সে বিনামূল্যে ব্যবহার করতে চায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না, চুরি করে ব্যবহার করে। এগুলি পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন, পরিবর্তন হয়েছেও। আমি তো ধরেন, চুরাশি সনে যা দেখেছি তার থেকে এখন অনেক ভিন্ন জায়গা দেখি। উন্নতিটা যেখানে হয়েছে, আলোকচিত্রীরা এখন নিজেরাই অনেক সচেতন, তারা প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদের ভাষা তারা শিখেছে এবং আইনগত ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যে কারণে সব জায়গায় তারা পার পেয়ে যায় না। কিন্তু আইন দিয়ে একটা জিনিস চালানো তো কঠিন, সমাজে ওই অভ্যাসগুলো যদি না দাঁড়ায়, শুধু আইন দিয়ে করা সমস্যাজনক। সেই অভ্যাস আস্তে আস্তে আমরা আপনারা সবাই মিলে নিরন্তর চর্চা করলে হবে হয়তো।

বাংলাদেশের আলোকচিত্রশিল্প জগতের অন্যতম এক দিকপাল হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন। পারিবারিক অনুপ্রেরণা এবং নিজস্ব ঐকান্তিক ইচ্ছায় আলোকচিত্রের জগতে পদার্পণ তার। ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্টতা। কয়েকটি প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। সমকালীন অন্যান্য আলোকচিত্রীরা যখন গতনুগতিতে রয়ে থাকে, বাংলাদেশে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির শুরু হয় তাঁর হাত ধরেই। সাধারণ মানুষের ছবি তুলতে। কলেজে ওঠার পর শাহীদিয়া ছবি তুলতে ব্যস্ত তখন তিনি বেরিয়ে পড়েন কমলাপুর রেলস্টেশনের সাধারণ মানুষের ছবি তুলতে। কলেজে ওঠার পর শাহীদিয়া ছবি তুলতে ব্যস্ত তখন তিনি বেরিয়ে পড়েন কমলাপুর রেলস্টেশনের সাধারণ মানুষের ছবি তুলতে। কলেজে ওঠার পর শাহীদিয়া ছবি তুলতে ব্যস্ত তখন তিনি বেরিয়ে পড়েন কমলাপুর রেলস্টেশনের সাধারণ মানুষের ছবি তুলতে।

অসুস্থতার কারণে ছেদ পড়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার। পুরাদস্তুর আলোকচিত্রশিল্পী হওয়ার সংগ্রামে নেমে পড়েন তখন থেকেই। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ম্যাপ এজেন্সি অব ফটোগ্রাফি। দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন এই ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে আলোকচিত্র। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন আলোকচিত্র শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি প্রজেক্ট এবং আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফি নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। এছাড়াও তিনি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আর্কিটেকচার বিভাগে আলোকচিত্রের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। মহসীন কবীর ও মোঃ আক্রাম হোসেনের সহযোগিতায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন শুভাশীষ রঞ্জন সরকার।

উত্তরশীঘ্র : আপনার ফটোগ্রাফির শুরুরটা কিতাবে?

চন্দন: আমি একদম প্রথম থেকেই খুব অল্পকথায় বলি। বেসিক্যালি আমার দাদার বড় ভাই মুন্সি রয়িস উদ্দিন মঙ্গল ১৯২৯-৩০ সালের দিকে ছিলেন গুরু ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর একজন শিক্ষক, (টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার) বাংলাদেশের। দাদার বাড়ি বগুড়া। উনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন এবং উনাকে পণ্ডিত বলা হতো। ট্রেনিংয়ের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করতেন। তখন ফটোগ্রাফি প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে উনি নিজেই ক্যামেরা বানাতেন, কাঠের বাক্স দিয়ে, লেন্স বানাতেন চোখের liding glass দিয়ে এক নিজেই ফিল্ম এবং পেপার বানাতেন। ৫"/৭" কাচের প্লেটে রাতে ইমালশন লাগিয়ে ক্যামেরার ভেতরে রেখে দিতেন। পরদিন লেন্সের মুখ খুলে ছবিটি উঠিয়েই সাথে সাথে বন্ধ করে রাতে ডেভলপিংয়ের জন্য রেখে দিতেন। পরের রাতে আবার কাগজের উপর ইমালশন লাগিয়ে ফটো পেপার বানিয়ে কাঁচের নেগেটিভটি উপরে রেখে হারিকেনের আলোতে এক্সপোজার দিয়ে ছবি প্রিন্ট করতেন। ওনার কাছ থেকেই আমার বাবা চাচার ফটোগ্রাফির ব্যাপারে উৎসুক হয়ে ওঠেন। ধারাবাহিকভাবে আমিও ছোটবেলা থেকে তাঁদের কাছ থেকে ফটোগ্রাফিতে উৎসাহ পেয়েই বড় হই। ফটোগ্রাফির উৎসাহের উৎসটা ওইখান থেকেই আসা। এবার আমার কথায় ফির আসি। আমার বাবা, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন ছিলেন কাগুই জলবিদ্যুত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলীদের একজন। ১৯৫১ সাল থেকে বাবার চাকরিসূত্রে আমাদের পরিবার কাগুইয়ে। জন্মের পর সেখানেই আমরা ভাই-বোনরা বেড়ে উঠি। কাগুইয় আরো কয়েকটি পরিবারের সাথে মাঝে মাঝেই আমরা লঞ্চে করে রাঙামাটি, বরকল, পাবলাখালী, মাইনিমুখ প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে যেতাম, সেখানে সবাই ছবি তুলত। পরিবারের সবাই সামনে দাড়িয়ে, পিছনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রেখে ছবি তোলা হতো। এভাবেই ছোটবেলা থেকে ছবি তোলা দেখে এসেছি। সে সময় মাঝে মাঝে চট্টগ্রামেও আসতাম, সেখানেই কোন এক আত্মীয়ের বসায় একদিন গিয়ে দেখি তার বাসায় দুটি কম দামী প্রাস্টিকের ক্যামেরা। ক্যামেরা দেখেই হাতে নিয়ে ক্লিক করার চেষ্টা করি। যদিও এর ভিতরে ফিল্ম ছিল না। তারপর আমি নাছোড়বান্দার মতো জিদ করে তাদের কাছে একটি ক্যামেরা চেয়ে বসি। বলি "আপনার কাছে তো দুটি ক্যামেরা, একটি আমাকে দিতেই হবে"। এরপর তাঁরা আমার আবদারে অনেকটা বাধ্য হয়েই আমাকে ক্যামেরাটি দিয়ে দিলেন। পরের দিন আমার বাবা ক্যামেরাতে একটি ফিল্ম ঢুকিয়ে দিলেন। তখনকার ফিল্মে ১২ টি সাদাকালো ছবি তোলা যেত। তো আমি ৫/৭ দিন-১০ দিন এদিক ওদিক ঘুরে এ একটা ফিল্মের ১২টা ছবি তুলে ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না, শুধু কিছু কিছু

জিনিস বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলো খুব কড়া রোদ হলে কি করব, অন্ধকারে কি করব আর বলে দিয়েছিলো ক্যামেরার লেন্সে যেন হাত না পড়ে এবং ক্লিক করার সময় যেন হাত না কাঁপে। আমার হাতের তোলা প্রথম ছবি ছিলো কাগুই এর ড্যাম, স্পিলওয়ে, পাহাড় ইত্যাদি। তারপর ছবিগুলো প্রিন্ট করা হলো। এরপর এক থেকে দেড় বছরের ফারাক। ঐ সময় আমার বাবার একটি উন্নতমানের 'মিনলটা' (টিএলআর ক্যামেরা) ক্যামেরা ছিল, যেটি বাবা আমেরিকা থেকে এনেছিলেন। একদিন বাবা তার নিজের ক্যামেরাতে ফিল্ম চুকিয়ে আমাদের ছবি তুলেন। সেইদিনই আমার বাবা নিজের আগ্রহে আমার হাতে ক্যামেরাটি তুলে দেন এবং শিখিয়ে দেন এটা এপারচার, এটা শাটার। শাটার কতক্ষণ খোলা থাকবে, এপারচার কতটা খোলা থাকবে। এখানে আইএসও, ফোকাস ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে প্রায় ৮-১০ মিনিট এর একটা শর্ট লেকচার দেন। তারপর বলেন, 'যাও এবার ছবি তোলা।' এরপর ডাবল এক্সপোজার বোঝালেন। সেকেন্ড রোল এর ফিল্মে ডাবল এক্সপোজারের একটি এক্সপোজার করেছিলাম সেদিন। মিটারিংও বুঝিয়েছিলেন বাবা। মিটারের কাটা কোথায় থাকলে ছবি স্পষ্ট হবে এসব বুঝিয়েছিলেন তিনি। এরপর ১৯৭০ সালের জুন মাসে আমার জন্মদিনের ছবি আমিই তুলি। সে সময় TLR ক্যামেরায় বাব্বওয়ালা ফ্যাশ ছিল। সেটি দিয়ে আমার কয়েকজন বন্ধুর ছবিও তুলেছিলাম। সেকেন্ড রোল এর ফিল্মে ফ্যাশ দিয়ে ফটোগ্রাফি করি। ৭০ সালে একবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম। তখন আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা ৮মি.মি এর একটি মুভি ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে আব্বা সমুদ্রের ছবি, আমাদের গোসল করার ছবি মুভি করলেন। সে সময় তিনি দেখিয়েছিলেন ওটাতে কিভাবে ফিল্ম ভরতে হয়। সেই ক্যামেরাটিরও শাটার, এপারচার ছিল। দুইটা রোল এ ৭/৮/১০ মিনিটের movie উঠতো। আমার ফটোগ্রাফির শুরুটা এভাবে বাবার কাছ থেকেই। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালে। ১৫ এপ্রিল সকাল ১০টায় পাকিস্তানি আর্মিরা কাগুইয়ে প্রবেশ করে। আর্মিরা প্রাথমিকভাবে আমার বাবাকে জানান, কাগুইয়ে কোন সিভিলিয়ানকে মারা হবে না। পরবর্তীতে দুপুর ৩ টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি আর্মিদের ২য় আরেকটি গ্রুপ কাগুইয়ে প্রবেশ করে। এবং তাদের মধ্যেই হঠাৎ করে এক মেজরের আদেশে চারজন আর্মি আমাদের বাসায় এসে আমার আব্বা ও তার এক সহকর্মীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাগুই প্রধান বাঁধের পশ্চিমপ্রান্তে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার আব্বার ঐ সহকর্মী অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। পরদিন পাকিস্তানি আর্মির দুজন সিনিয়র অফিসার এসে আমাদের পরিবারকে জানায় যে, ভুল করে আমার বাবাকে মারা হয়েছে। তাদের একজন সিনিয়র অফিসার ব্রিগেডিয়ার শফি আমাদেরকে বলেন 'যে মেজর তোমার বাবাকে মেরেছে, তার কোর্ট মার্শাল হয়ে গেছে'। ব্রিগেডিয়ার শফির এই কথা আমি মুভি ক্যামেরায় ধারণ করি, ব্রিগেডিয়ার শফি কাঁদছিলেন কথাগুলি বলার সময়। ক্লোজ আপ করে শফির কান্না তুললাম। মোটামুটিভাবে এভাবেই আমার স্টিল ও মুভি দু'টোরই হাতে খড়ি হয়...

এরপর পাকিস্তানি আর্মিদেরই একটি প্লেনে করে পরিবারসহ আমরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসি। এরপর একদিন আমার মেজো চাচা আমাকে ডেপথ অব ফিল্ড সম্পর্কে বোঝালেন। তখন ৩৫ মি.মি রিফল ফিল্মের দাম ছিল ১২ আনা। যারা বিক্রি করতো তারা বলতো ৩৬টি ছবি উঠবে, উঠতো ২৮টি। এরপর ৭৪-৭৫ সালের ঘটনা, আমরা যে বাসায় থাকতাম তার পাশের বস্তিতে একদিন আগুন লাগে। আমি ফিল্ম নষ্ট করতাম বলে সেসময় আমার বড় বোন ক্যামেরা লুকিয়ে রাখত। তাই সেদিন সেই আগুনের ছবি আমি তুলতে পারিনি। তৎকালীন আইজিপির ছেলে ইনান আমার ক্লাসমেট ছিল। সে ছিল আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড। সে একটা ৩৫ মি.মি নতুন ক্যামেরা কিনল। আমি ফটোগ্রাফি নিয়ে ওর সাথে আলোচনা করতাম। ওর ক্যামেরা মাঝে মাঝে ধার করে ছবি তুলতাম। তখন বেইলি রোডের ফটোমেটিক স্টুডিওতে ছবি প্রিন্ট করতাম। সেখানে দেখতাম কিভাবে ছবি ওয়াশ করে। চার আনা করে নিত 3R Size প্রিন্ট করতে। কালার ফিল্ম সহজলভ্য ছিল না সেসময়। বিদেশ থেকে কেউ নিয়ে আসলে কালার প্রিন্ট হতো। তাও দেশের বাইরে। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর, ১৯৭৭ সালে কলেজে পড়াকালীন একটি অজানা কারণে আমার হাতের লেখা বন্ধ হয়ে যায়। আঙুল ঠিকমত কাজ করতো না আমার। পরে ডাক্তার জানালেন এরকম অসুখ হয়, এবং সেটা দশ লক্ষ এক জনের। সেসময়

প্রমাণ করতে পারবেন না যে, এটা আপনার ছবি। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মনজুর আলম বেগ সাহেবের সাথে দেখা করতে বলেন আমাকে। তারপর আমি গেলাম বেগ সাহেবের সাথে দেখা করতে। তিনি আমাকে নেগেটিভটা আনতে বললেন। তখন আমি ঐ আত্মীয়কে, যার কাছে নেগেটিভটা দিয়েছিলাম তাকে একটি সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখলাম। আমার চিঠি পেয়ে তিনি নেগেটিভটা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

এরপরে একদিন বেগ সাহেব আমাকে বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের ফটোগ্রাফির কোর্সটা করতে পারেন। বারোটা ক্লাসের এক মাসের কোর্স। তার কথা শুনে আমি বেগ আর্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হই। তখন আমার মনে একটি বিষয় নাড়া দেয় যে, আমি ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে খুবই সামান্য জানি, কিন্তু এতো ছবির মধ্যে বাছাই করে আমার ছবি যেহেতু প্রদর্শনের জন্য সিলেক্ট হয়েছে তার মানে আমার নিশ্চয়ই কোন কোয়ালিটি আছে। আর আমার বাবা যেহেতু ফটোগ্রাফার ছিলেন তাই ফটোগ্রাফির সাথে আমার বাবার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই কোর্সটা করার পরই আমি তখন বিপিএস এর মেম্বর হয়ে যাই। তখন বিপিএস এ ১৯৮২ এর দিকে মাসিক একটা প্রতিযোগিতা হতো ‘ফটোগ্রাফার অব দি মাস’। যে মাসে আমি বিপিএস এর মেম্বর হই, সে মাসে প্রতিযোগিতায় আমি ১ম হই। তার পরের মাসগুলোতে অনারেবল প্রাইজ, তৃতীয় প্রভৃতি হই। এটা আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। তাই বিপিএস এ ফটোগ্রাফি শেখার জন্য আমি ফটোগ্রাফির উপর লিখা বই খুঁজতে থাকি। পরে একদিন বেগ সাহেবই আমাকে তার লাইব্রেরি থেকে Jacobson এর Negative Developing technique এর উপর বইটা বের করে দিলেন। ছোট থেকেই বই পড়ার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার ছিলো, বই নতুন আর পুরাতনই হোক, বুঝি আর না বুঝি। যে কোন বই পেলেই পড়ে ফেলতাম। তা Negative Developing technique এর বইটি পড়ে আমি অনেক মজা পাই। কারণ, বইটি chemistry related ছিলো। আর chemistry আমার অনেক প্রিয় ছিলো। আমি ক্লাস নাইনে থাকতে কেমিস্ট্রির অনার্স এর বই পড়তাম। বইটি পড়ার পর আমি ফিল্ম ডেভেলপিং শিখে গেলাম। আর তাই ফটো ডেভেলপিং করার জন্য বাজার থেকে বিভিন্ন ক্যামিকেল, দাড়িপাল্লা প্রভৃতি কিনে আনি। সেই থেকে আমার নিজে নিজেই ফটো ডেভেলপিং এর কাজ শুরু হয়।

শুভাশীষ : সেই সময় কোন কোন ব্যক্তি আপনাকে ফটোগ্রাফিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন?

চন্দন: ঐ সময় আমার আন্মা আইসিসিডিআরবিতে চাকরি করতেন। ওখানে আমার আন্মা বিদেশে একজনকে কার্ড পাঠাবেন। আন্মা আমাকে বললেন কার্ড কেনার দরকার কি, তোমার দুইটা ছবি প্রিন্ট করে দাও, বেলজিয়ামে একজনকে ব্রিফিংস পাঠাব। তা আমার তোলা দুইটা ছবি প্রিন্ট করে দিলাম। মা তাতে ঈদ মোবারক লিখে, সিগনেচার করে আনসার উদ্দিন স্যারকে দেখালেন। তিনি ভাবলেন, দেখিতো, আনসার উদ্দিন স্যার তো ছবি টবি তোলেন। স্যার আমার ছবি দেখে অনেক প্রশংসা করেন। মাকে বলেন, আপনার ছেলেরতো ভালো চোখ আছে। পরে যখন মা বাসায় এসে সন্ধ্যায় আমাকে এ ব্যাপারে বলেন তখন আমার অনেক আনন্দ লাগে। কেমন একটা অনুপ্রেরণা পেলাম। এটা আমার জন্য পুরস্কারের থেকেও অনেক বড় কিছু ছিলো। আর নওয়াজেশ আহমেদ সাহেব আমার চাচার বন্ধু ছিলেন। উনি একদিন আসলেন আমাদের বাসায় আমার চাচার সাথে দেখা করতে। আমার বড় চাচা আর উনি এডিবি ব্যাংকে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন গবেষক। সেদিন তিনি আমার ছবি দেখে, কম্পোজিশন দেখে একটু আলোচনা-সমালোচনা করলেন। এরপর আমাকে কিছু দিকনির্দেশনাও দিলেন। এগুলো ছিলো আমার জন্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার। তারপর আবদুল মালেক বাবুল, গোলাম মোস্তফা, কাশিনাথ নন্দী, কাজি মিজানুর রহমান, নাফিজ আহমেদ নাদভী, আনোয়ার হোসেন, আমানুল হকসহ অনেকের ফটোগ্রাফিই আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এরপর ১৯৮৩ তে আমি বিয়ে করি। সেপ্টেম্বর মাসে বিয়ে হল আমার। আমাদের বাসর ঘর ছিলো আমার ডার্করুমের ভেতর। মানে আমার থাকার ঘর আর ডার্করুম

একসাথেই ছিলো। তো ওটাই আমার বাসর ঘর হলো।

শুভাশীষ : পুরো জীবনটাই একদম ফটোগ্রাফির সাথে যুক্ত ছিলেন তাহলে?

চন্দন: হ্যাঁ। আমার স্ত্রী খুব ভালো গান গাইত। ছায়াবোর্ডের ক্যাসিক্যাল এ song course এ প্রথম হয়েছিলো। ও সানজিদা আপার খুবই ভক্ত ছিলো। আমিও শুনতাম ওর গান। তো ১৯৮৩ তে বিয়ে হলো, ১৯৮৪...তখন কিন্তু আমার নিজের ক্যামেরা ছিল না। অন্যের ক্যামেরা ধার করে ২-৩দিন রাখতাম। আর কোন competition হলে আমি আগে থেকেই থিম ঠিক করে রাখতাম যে, কোন কোন বিষয়ের উপর ছবি তুলব। তো বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ছবি তুলে আবার ক্যামেরা ফেরত দিতে হতো। যাই হোক, ১৯৮৪ তে আমার আম্মা আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিলেন। তো তখনকার সময়ের মোটামুটি জনপ্রিয় ও সস্তার মধ্যে জুম লেন্সওয়ালা ইয়াসিকা এফ এর্স থ্রি একটা ক্যামেরা কিনে দিলেন আমাকে। ওটা ছিলো আমার জীবনের প্রথম SLR ক্যামেরা। এরপর ঐ ক্যামেরা দিয়ে আমি বেশ কিছু ছবি তুললাম। কিছুদিন পরে আম্মা আমাকে আরো ভালো একটা বড় জুম লেন্স ৭০-২০০ ২x converter লেন্স কিনে দিলেন। তো ওগুলো নিয়ে বের হলাম দেশের ছবি তুলতে। আমার দাদাবাড়ি ছিল বগুড়াতে। আমি বগুড়াতে গেলাম, মহাস্থানগড়ে গেলাম। মহাস্থানগড়ে একটা বুড়ির ছবি তুললাম। তখন এভাবেই ছবি তুলে দিন চলে যাচ্ছিল আমার।

শুভাশীষ : আপনার মা যখন প্রথম এই ক্যামেরাটা আপনার হাতে তুলে দিল সে সময় আপনার অনুভূতি কেমন ছিলো? এ বিষয়টা আপনাকে কেমন উৎসাহিত করেছিলো?

চন্দন: Actually জিনিসটা হয়েছে কী, আমি তো বলছিই যে, '৭৮-৭৯ এ কলেজে থেকে আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে কিন্তু ওই অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে সবাই খুঁজত যে, আমার Profession কী হবে? চিন্তায় পড়ে গেল সবাই যে, Actually আমি কী হব, কী করব জীবনে? পেশা থাকতে হবে তো, তাই না? পেশা না থাকলে তো এভাবে জীবন চালানো যাবে না, ওটা নিয়েই চিন্তিত ছিল সবাই। এবং সে কারণেই তারপর আমাকে জামালপুরে পাঠানো হলো, ওখান থেকে আবার আমি চলে আসলাম। কিন্তু ফটোগ্রাফির Neck টা শুরু হয়েছে, ঐ যে আমার ছবি আরেকজনের নামে গেলো, যেটা বলেছিলাম তোমাকে। তো এইগুলো মিলিয়ে সবাই মোটামুটি একটু, এমনকি আমার আম্মারও কনফিডেন্স বাড়লো আমার উপর যে, আমি ফটোগ্রাফিতে বেশ ভালোই করছি। তখন আমাকে ক্যামেরাটা কিনে দিলো আম্মা। সেটার একটা Background ছিলো। সেজন্য ওই প্রথম ক্যামেরা হোক আর যাই হোক, অতটা Inspiring ছিল না আমার কাছে। কারণ, I have proved myself. আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, আমি যা করছি আমি ঠিক করছি, সেটাতে আমি নাম করছি। Confidently করতেছি আমি জিনিসটা। তো ১৯৮৪ সালে ওই ছবি-টবিগুলো তুললাম, আমার যতদূর মনে হয়, ১৯৮৪ এর শেষের দিকে National Photo Competition আরেকটা হলো বিপিএস এর, কিংবা বিপিএস এর Annual Competition এরকম কিছু একটা হলো। কয়েকটা ছবি দিলাম ওখানে আমি, সংসদ ভবনের পাশে তোলা একটা বসে থাকা বাচ্চার ছবি দিলাম, তারপরে কিন্তু দেখা গেল ওই ছবিগুলিতে আমি কোনো পুরস্কার পাই নাই ওখানে। আমাকে কিন্তু এই জিনিস গুলো Disturb করতো না। আমার মনে আছে, আমার এক চাচাতো ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, "তুমি যে এতো সুন্দর ছবি দিলা, সেটাতো কোনো পুরস্কার পেলো না।" আমি বললাম যে, "দেখো, এই ছবি একদিন পুরস্কার পাবেই, আর পুরস্কার না পেলেও কিছু আসে যায় না, কারণ আমি জানি এগুলো যে ভালো ছবি।" এতোটাই Confident ছিলাম আমি। তো হঠাৎ করেই, ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে আমার বন্ধু ইনান, সেও বিপিএস এর মেম্বর ছিলো, মোটরসাইকেল নিয়ে হাজির। বাসায় এসে বলল যে, চন্দন আমি International Photography Competition এর

একটা এন্ট্রি ফর্ম তুলেছি। তখন ঐটা আমি দেখলাম, তারপরে ওইটা নিয়ে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে গেলাম, কারণ একটা ফর্ম দিয়ে একজনেরই ছবি পাঠানো যায়, ওটা যে ফটোকপি করেও অংশগ্রহণ করা যায় সেটা আমার ধারণা ছিলো না। কারণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তখনো পার্টিসিপেট করি নাই। ওইটা নেয়ার পর বেগ সাহেব বললেন যে, তুমি তোমার ছবিগুলো নিয়ে চলে আসো রাত্রি বেলা। কাবে এন্ট্রি ফর্ম আছে, ওখানে অনেকেই দিচ্ছে চারটা করে ছবি। স্পেনে কম্পিটিশনটা “Europa 85” নামে পরিচিত। তো ওইটাতে আমরা ছবি দিলাম। তারপর কিন্তু আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছবি দিয়েছি। ঐ প্রতিযোগিতায় সেসব ছবিগুলোই দিয়েছিলাম যেগুলো এখানে (দেশে) কোন পুরস্কার পায়নি। তো হঠাৎ করে একদিন, আমার ঠিক মনে নাই জুন-জুলাই এর দিকে আমাকে বেগ সাহেব ডেকে পাঠালেন। বেগ সাহেব তখন BANCSDOK এ Chief Photographic Officer হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আমি উনার অফিসে সরাসরি চলে গেলাম। যাওয়ার পর উনি আমাকে Notification Card দিখিয়ে বললেন, তোমার ছবি কী হয়েছে এখানে লেখা আছে। সেখানে লেখা ছিলো A মানে Accept, R মানে Reject. দিখলাম যে চারটা ছবির মধ্যে তিনটি ছবির মধ্যে A দেয়া, মানে আমার তিনটা ছবি International Exhibition এ Accepted হয়েছে। পাশে আবার লেখা “মেডাইল অর ফিয়াপ” মানে কোন একটি মেডেলের নাম ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা। তো সব মিলিয়ে একটা হলুদুল কান্ড। এরপর সাথে সাথেই আমি গেলাম ‘অলিয়স ফ্রঁসেজ’ এ। গিয়ে দেখি ঐদিন ‘অলিয়স ফ্রঁসেজ’ বন্ধ। তারপর গেলাম আনোয়ার ভাইয়ের ওখানে। আনোয়ার ভাইকে তখনো ঐভাবে চিনি না, তার সাথে অতটা সখ্য তখনো হয় নাই। কিন্তু উনার বাসা ঠিকই চিনতাম। যাওয়ার পর উনি আমাকে খুলে বললেন ব্যাপারটা যে, “Chandan you have gold medal. মানে তুমি International Competition এ FIAP Gold medal পেয়েছো। এটা আমিও কখনো পাইনি”। এরপর, উনি তাড়াতাড়ি একটা ক্যাটালগ খুলে আমাকে দেখালেন যে, Medal to Aur মানে হলো গিয়ে Gold Medal. ‘Medal to Argenta’ মানে হলো Silver Medal to Bronge..। তো তখন আমি বিষয়টা ভালোমতে বুঝতে পারলাম।

শুভাশীষ : তার মানে আপনি ফিয়াপ গোল্ড মেডেল পেয়েছেন?

চন্দন: হ্যাঁ।

শুভাশীষ : আপনার আগে কোন বাংলাদেশী ফিয়াপে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলো?

চন্দন: না।

শুভাশীষ : তার মানে, শুরুর দিকটাতে আপনার জন্য নিশ্চয়ই এটা একটা বড় প্রাপ্তি ছিল?

চন্দন: নিঃসন্দেহে। ১৯৮৫, মানে তখন আমার বয়স পঁচিশ মাত্র। তো তখন আমি আমার চাচাতো ভাইকে বললাম, দেখেছো, আমি বলেছিলাম না এই ছবি একদিন অনেক বড় অ্যাওয়ার্ড পাবে।

শুভাশীষ : এই পুরস্কার পাওয়ার পেছনে কোন কোন জিনিস কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন?

চন্দন: এতটাই Confident ছিলাম। তা যাই হোক, তারপর আসলো Asian Cultural Center for UNESCO এর Competition, যেটা ACCU competition. ঐখানে দেয়ার জন্য আমি আর ইনান মিলে ছবি তুললাম একদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। ঐখান থেকে ১টা ছবি পাঠালাম। তারপরে '৮৬ সালে হঠাৎ করে আমি National Meusium এ জয়েন করলাম Photographer হিসেবে। কোন কাজ যদি আত্মবিশ্বাস নিয়ে করা যায় তাহলে সফলতা আসবে। আমি মনে করি আত্মবিশ্বাস

আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

শুভাশীষ : Bangladesh National Museum এ?

চন্দন: হ্যাঁ। ওখানে আমি '৮৬ এর মার্চের দিকে যোগদান করি। তো একদিন আমি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ করে দেখি আনোয়ার ভাই ছুটে আমার টেবিলের দিকে আসলেন। বললেন, "চন্দন তুমি বের হও। মানে চেয়ার থেকে উঠে বের হও।" তো আমি বের হলাম। কি ব্যাপার আপনি এ রকম ছুটে আসছেন কেন আমার দিকে? তো উনি এসে জড়িয়ে ধরে বললেন যে, তুমি তো Asian Cultural Center for UNESCO এর Grand prize পেয়েছো। সব চেয়ে বড় Award যেটা, তা ২২ টা দেশ মিলিয়ে হয়।

শুভাশীষ : আচ্ছা।

চন্দন: UNESCO এর যেটা। ঝড়, সেটা আমার ছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় বড় পুরস্কার। তারপর আসলো Nikon Photo Contest International. এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বাংলাদেশ থেকে আর কেউ কখনও পায় নাই। আনোয়ার ভাইয়ের কাছে গিয়ে কিংবা বেগ সাহেবের কাছে গিয়ে Nikon Photo Contest International এর ক্যাটালগগুলোতে দেখতাম, অদ্ভুত সব ছবি একেকটা। মানে সত্যিই একটা অদ্ভুত জিনিস। Nikon Photo Contest এখনও অনেক নামকরা Competition. ৫০/৬০টা দেশ থেকে প্রায় ২০ থেকে ৭০ হাজার ছবি যায় ওখানে।

শুভাশীষ : আচ্ছা....আচ্ছা।

চন্দন: তো এটা তো একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো।

শুভাশীষ : ঐ সময়টায় যেহেতু, এখন তো আরও বেড়েছে।

চন্দন: হ্যাঁ এটা কমে বাড়ে আর কি? আমি দেখেছি Highest 72000 ছবি।

শুভাশীষ : আচ্ছা....আচ্ছা।

চন্দন: আমি যেইবার Participate করেছিলাম আমার ঠিক মনে নাই। আমি কিন্তু Nikon এর জন্য চুপচাপ ছবি তুলে যেতাম। সেই ছবি আবার কোথাও ছাপানোও যাবে না আবার দেখানোও যাবে না। তাহলে ঐ ছবি আবার Nikon নিবে না। তো বেছে বেছে কিছু ছবি আলাদা করে রেখে দিতাম যে এইটা দিয়ে Nikon এ Participate করবো। আমি Nikon এ ২টা ছবি পাঠিয়েছিলাম মাত্র এবং ১টা ছবি সম্মানসূচক Honourable Mention পেয়েছিলো। So, সেটাও বাংলাদেশে প্রথম। এর আগে কেউ পায় নাই। বেগ সাহেব বলতো যে, এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা Competition. এখনও কেউ পায় নাই। তো আমি গেলাম বেগ সাহেবের কাছে। গিয়ে বললাম যে, আমি Nikon এর Award পেয়েছি। এরকমভাবে আস্তে আস্তে দুটা-চারটা পুরস্কার আসা শুরু করল। '৮৯ এর দিকে, ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ হত বিভিন্ন রকমের। ১৯৮৮ সালে জার্মানি থেকে একজন ফটোগ্রাফার আসলেন, টমাস লুথগে। উনি আমাদের একটা ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ করালেন। এটা ছিল প্রথম। তো ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ, বিদেশ থেকে কোন ফটোগ্রাফার ওয়ার্কশপ করতে আসবেন। সে একটা চ্যালেঞ্জ থাকত সবসময় যে, আমরা পারি কিন্তু তোমরা বিদেশ থেকে আস, আমরাও যে তোমাদের চেয়ে কম তা নয়। বিদেশ থেকে যখন কোন ফটোগ্রাফার আসত, আমরা যারা অংশগ্রহণ করতাম, আমাদের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ থাকত। তো ওটা হওয়ার পর, ২য় একটা ওয়ার্কশপ জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট আয়োজন

করেছিল। সেখানে ইয়কিম ব্রোম নামে এক ফটোগ্রাফার আসল, ইয়াং একজন ফটোগ্রাফার। ৩২ কি ৩৪ বছর বয়স হবে। সে আমেরিকাতে আর্ট ফটোগ্রাফির উপর পড়াশুনা করেছে। তখন ওই সময়টাতে কিন্তু সাধারণত ডকুমেন্টারি কিংবা জার্নালিস্টিক ফটোগ্রাফারকে আর্ট ফটোগ্রাফিতে কিং বলা হত। মানে ফটোগ্রাফিতে আর্টের ব্যাপারটা তখনও মানত। এখন যেভাবে দেখা যায়, ফটোশপ আসার পর অনেক কাজ ভাগ হয়ে গেছে এখনকার ফটোগ্রাফিতে, তাই না? জার্নালিজম, ডকুমেন্টারি ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমাদের জার্নালিস্টিক-সেটাতেও যে আর্ট নেই তা বলছি না আমি। যেমন যে, 'All photographs are documentary but all documentary photographs are not art'. ব্যাপারটা ঐ রকম। তো যাই হোক, ইয়কিম ব্রোম আসল। আমাদেরকে পাঁচটা ছবি দিতে বলল, আমরা দিলাম। তো সে বলল যে আর্ট ফটোগ্রাফিতে-তোমরা যে ছবিগুলো দেখ, এগুলোতো আগে অনেক ফটোগ্রাফার তুলেছে, আমেরিকাতে আরো আগে ৫০-৬০-১০০ বছর আগে এরকম ছবি হয়ে গেছে। এটাতো নতুন কিছু দেখতে পারছি না। তাহলে নতুন জিনিসটা যে দেখা অথবা একই জিনিসকে অন্যভাবে দেখানোর প্রচেষ্টা সেটা যে এক ধরনের শিল্প তা তো দেখতে পারছি না। যাই হোক, আমার যেটা চ্যালেঞ্জ ছিল, "ও, তুমি আর্ট ফটোগ্রাফির কথা বলছ তো, তোমাকে আমি আর্ট ফটোগ্রাফি করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আর্ট ফটোগ্রাফি কাকে বলে? তো চুপচাপ আমরা এটা নিয়ে ছবি তুলতে যেতাম, ছবি তুলতাম, এবং ছবি আনতাম, তো দেখা গেল যে আমার একটা রোল থেকে ১৬ টা করে ছবি সিলেক্ট হচ্ছে, ২০ টা করে ছবি সিলেক্ট করছে সে। সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে যে, আমি কি দেখছি এগুলো। পরে আমার এক বন্ধুকে সে চিঠিতে লিখেছিল যে, How is Chandan, the magician who can do anything. So, এটা আবার আমার জন্য উৎসাহদায়ক মেসেজ হল। ড. শহিদুল আলমের সহযোগিতায় '৮৯ সালে পিটার ফ্রেরার নামের আরেক জন ফটোগ্রাফার এসে আমাদেরকে ফটোগ্রাফির কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এর উপর একটা কর্মশালা করালো। তিনি আমাদের শেখালেন যে ফটোগ্রাফি শুধু খবরের কাগজ, পত্রিকায় ছাপানোর জন্য নয়। ফটোগ্রাফি করে একটা কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট করা যায়। সমাজ যে একটা বাজে অবস্থায় আছে কিংবা খুব ভাল অবস্থায় আছে সেখানের কিছু ছবি তোলা যায়, যে ছবি দিয়ে বিভিন্নভাবে তাদের মানোন্নয়ন করা ইত্যাদি, সরকারের চোখে কিংবা মানুষের চোখে তুলে ধরা যায়। তো সেই কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তিনজনে আমি, আবদুল মালেক বাবুল আর দেবু দা মানে দেবব্রত চৌধুরী, আমরা বিপিএস থেকে বের হয়ে চিন্তা করছি যে কোথায় যাব। তা দেবু দা বললেন, কই যাওয়া যায়? তো আমি বললাম যে, চলেন কমলাপুর রেলস্টেশনে যাই। তিনি বললেন, ওখানে কি কোনো ছবি আছে নাকি? আমি বললাম যে, ছবি তো সব জায়গায় আছে। চলেন না যাই, গিয়ে দেখি ওখানে কী আছে বা না আছে। তো আমরা গেলাম ওখানে, আমি ৫৬ টা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছবি তুলেছিলাম সেদিন কমলাপুর রেল স্টেশনে। এবং আমার বইয়ে ওখান থেকে তিনটা ছবি আছে। প্রথম দিনের তিনটা ছবি। তারপর না আমি একটু মজা পেয়ে গেলাম কমলাপুর রেলস্টেশন সম্পর্কে। প্রায়ই যাওয়া আসা শুরু করলাম ওখানে। কেউ জানতো না যে আমি সেখানে যাচ্ছি। তখনতো হালকা ছিল কমলাপুর রেলস্টেশন। ওরকমভাবে লোকজন ছিল না। অনেক নিরাপদ ছিল, ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে যাওয়া যেত ওখানে। সন্ধ্যার সময় গেছি, দুপুরে গিয়ে দুই ঘণ্টা থাকতাম। সকালবেলা ভোরে চলে যেতাম ওখানে। তো ওখান থেকে হঠাৎ মনে হল কি যে কমলাপুর রেলস্টেশনের ছবি তুলি, আর কোথাও ছবি তুলব না। তো In the mean time, আনোয়ার ভাই একদিন আমাকে ফোন করে ডেকে বলল যে, চন্দন একটা বই পেয়েছি এক ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফারের। বিখ্যাত একটা বই, সেটা হল রঘু রায়ের তাজমহল এর উপর করা একটা বই। এত বড় বই, বড় বড় ছবি। তো আমি আর শুভ্র গেলাম। যাওয়ার পর আনোয়ার ভাই বইটা বের করে একটা করে পাতা উল্টান আর আমরা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম ছবিগুলো দেখে। সেটা হলো গিয়ে তাজমহলের উপর রঘু রায় ১৯৭৫ থেকে ৮৫ পর্যন্ত দশ বছরের তোলা ছবির বই। এরপর আমি চিন্তা করলাম কমলাপুর রেলস্টেশন এর উপর আমি দশ বছর ছবি তুলব তারপর আমি একটি বই বের করবো। তখন আমি ছবি দেখাতে বন্ধ করে দিলাম। কমলাপুরে যা তুলতাম বন্ধুদের তা দেখাতাম। ওটা বন্ধ করে দিলাম। শুধু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় ছবি দিতাম।

ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় আবার অংশগ্রহণ করলাম এবং Nikon প্রতিযোগিতায় আমি থার্ড প্রাইজ পেলাম। এটা '৯১ সালে, তখন কিন্তু পুরস্কারের ব্যাপারটা মনে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেছে। পুরস্কার মানে গোল্ড মেডেল পেলাম, সিলভার পেলাম তাহলে কি হল? আর পুরস্কার পাওয়া মানেই ফটোগ্রাফি না। যাই হোক আমার পুরস্কারের ধাক্কা মানে এ ব্যাপার আমার মন থেকে চলে যাচ্ছে তখন। আমি ছবি তুলি যেটা ভালো লাগে সেটা। ওটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গেল।

স্তবিশীষ : ফটোগ্রাফিতে প্রাইজ পাওয়ার কথা বলছিলেন, প্রাইজ পাওয়াটাকে আপনি কি ভাবে দেখেন? মানে একজন ফটোগ্রাফার প্রাইজ পেলেই কি তাকে ভালো ফটোগ্রাফার হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি?

চন্দন: না prize পাওয়া is a different issue I am telling you. prize অন্য জিনিস। prize কিন্তু এটা না। অনেকেই আছেন যে কোন পুরস্কার পাননি কিন্তু তিনি অনেক ভাল ছবি তুলেন। কিংবা কোন প্রতিযোগিতায় কোনদিন অংশগ্রহণ করেননি তিনিও অনেক ভাল ফটোগ্রাফার হতে পারেন। পুরস্কার হল গিয়ে ফটোগ্রাফারের এক ধরনের সাময়িক স্বীকৃতি। কারণ দেখা গেছে অনেক পুরস্কার পাওয়া ছবি অন্য আরেকটা প্রদর্শনীতে গিয়ে প্রদর্শিত হয় না।

স্তবিশীষ : এজন্য কি আমাদের দেশে ফটোগ্রাফির একটা প্রতিষ্ঠান খুব বেশী জরুরি হতে পারে না?

চন্দন: তো আছে।

স্তবিশীষ : না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা একটু শক্ত ভাবে হওয়া দরকার।

চন্দন: হ্যাঁ। প্রতিষ্ঠান আছে, ছিল বেগ আর্ট ইনস্টিটিউট, পাঠশালা, প্রিজম আরো অনেক প্রতিষ্ঠান, ছোট ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান। আমরা একটা ইচ্ছা আছে যে, আমি একটা ছোট প্রতিষ্ঠান করব, specialized course করাবো। আগে দেখা গেছে চট্টগ্রাম আর্ট ইনস্টিটিউটে ফটোগ্রাফি শেখানোর ডিপার্টমেন্ট ছিল, সেটা দুইটা সেশন বের হওয়ার পরও বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এরও আগে ১৯৫৮ সালে জয়নুল আবেদিন সাহেবের ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট ছিল কিন্তু অজানা কারণে সেখানে ফটোগ্রাফির শিক্ষাটা চালু হয়নি।

স্তবিশীষ : আমি মৃণাল সাহেবের কথা আপনাকে বলেছিলাম।

চন্দন: হ্যাঁ। মৃণাল দা ছিল এখানে। আরেক মাথা, চিটাগাং এর মাথা মৃণাল দা।

স্তবিশীষ : আমানুল হক সাহেবের ফটোগ্রাফির কথা বলেছিলেন।

চন্দন: আমানুল হক সাহেব হলেন সত্যিই একজন আর্ট ফটোগ্রাফার। উনি নিজে চুপচাপ ফটোগ্রাফি করে যাচ্ছেন।

স্তবিশীষ : এখন আমরা যে জায়গাটা নিয়ে কথা বলছিলাম, ফটোগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিকতা নিয়ে কথা বলছিলাম -তো ভাইয়া প্রতিষ্ঠান এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যা বলছিলেন...

চন্দন: প্রয়োজনীয়তা বলতে ইনস্টিটিউট হবার মত ফটোগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফারদেরকে একটা লেভেলে যেতে হবে, তারপরে ইনস্টিটিউট হবে। এমনি এমনি বললেই হয়ে যাবে না। রান্নার কি ইনস্টিটিউট আছে?

স্তব্ধশীষ : রান্নাটা আসলে আমাদের জীবনের মৌলিক জিনিসগুলোর সাথে জড়িত। এ কারণে হয়ত প্রয়োজন পড়েনি।

চন্দন: না না, কি বল, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এর প্রথমেই কিন্তু অন্ন। যেটার কোন ইনস্টিটিউট নাই। বাসস্থান এর ইনস্টিটিউট আর্কিটেকচার আছে। শিক্ষা, বিভিন্ন রকমের শিক্ষার ইনস্টিটিউট আছে। চিকিৎসার ইনস্টিটিউট আছে। অন্নেরই নাই, তবে আমি সাম্প্রতিক স্তন্যদাম যে হোম ইকোনোমিকসে এ রান্না শিখানো হয়। মেয়েদের হোম ইকোনোমিকস কলেজ অনেক পুরনো। আর একটা হচ্ছে, ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে ছয় মাসের একটা কোর্স আছে, কেউ যদি চায় তা হলে ওখানে গিয়ে রান্না শিখতে পারে।

স্তব্ধশীষ : হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টেও তো রান্না শেখানো হয়।

চন্দন: হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটারিং এ আছে অবকাশ, ওখানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং এর অধীনে একটা ছোট জায়গা হচ্ছে রান্না। পুরোপুরি রান্না শিখাচ্ছে না। তো আমি জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে, ফটোগ্রাফির ইনস্টিটিউটের ব্যাপারটা অনেক আগেই ফিল করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের সময়ই ফিল করা হয়েছে, উপলব্ধিও হয়েছে। কিন্তু তারপরে আর এগোয়নি। আর ইনস্টিটিউট বলতে বেগ আর্ট ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটই প্রথম মানের যেখানে Really regular basis এ ফটোগ্রাফি শেখানো হতো। It's a private institute basically. মঞ্জুরুল আলম বেগ সাহেবের। কিন্তু উনি ওটা করার পর থেকে প্রতিদিন, মাসিকভাবে ছাত্র ভর্তি হয়েছে হাজার হাজার। আমিও সেখানকার ছাত্র ছিলাম। এটা ১৯৮২ সালের কথা। তাওতো উনি ছাত্র পেতেন না। বিভিন্ন রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ফটোগ্রাফাররা চাকরি পাবার আগে বেগ আর্ট ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট থেকে দুই তিন মাসের একটা বেসিক কোর্স করে আসতো একটা সার্টিফিকেটের জন্য। এটা বেশিদিন আগের কথা নয়। তাহলে সেটাকে সত্যিই একটা ইনস্টিটিউট এ নিয়ে যেতে গেলে এটা তো একটা বিরাট ব্যাপার। বললেই তো হবে না। এদিকে পাঠশালা যে পরিমাণ উন্নতি করেছে। শহিদুল আলম সাহেবের মত এরকম বড় প্রতিষ্ঠান আর তো কেউ করে নাই বা করে দেখাতে পারে নাই। এখনকার ইনস্টিটিউটগুলো হচ্ছে কর্মশিলা। মানে আমি শেখাবো, এর উপর আমি চলবো। আইডিয়াটা খারাপ না। সবই এ রকম। ইউনিভার্সিটিতে বেতন নিচ্ছেন শিক্ষকরা। সেটা দিয়ে তাদের পরিবার চালাচ্ছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যগুলো, তার একটা ফিনানশিয়াল অপারটি ইমোশনাল। তো যদি ফিনানশিয়াল উদ্দেশ্যটাও প্রবল হতো তাহলেও ইমোশনাল ডেভলপমেন্টটা হতো। শুধু ইমোশন দিয়ে তো পেট ভরে না। এখন যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে এগুলো মেইনলি ফিফটি ফিফটি। কিন্তু ফটোগ্রাফার তো বের হচ্ছে সেখান থেকে। প্রাইভেট ভার্সিটিতে এখন ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট আছে।

স্তব্ধশীষ : আপনি আশা করছেন, তবে আরো চেষ্টা করতে হবে..

চন্দন: দেখ, একটা জিনিস বলি। খুব সিম্পল। আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আগে শিবপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল বের হয়ে আসছে, তারা এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। দেশভাগের পর আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলো। পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হলো। পরে বুয়েট হলো। আহসানুল্লাহর ১ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন আমার আব্বা, ১৯৫১ সালে। ঠে বছরই কর্নফুলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপনার মাস্টারপ্লান নেয়া হয়েছিলো। আব্বা সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। ৫৮ তে তাকে ইউএসএ তে হাইয়ার স্টাডিজের জন্য পাঠানো হলো। তো বুঝতে পারছো? আমাদের তো ফটোগ্রাফিতেও সেরকম একটা ইউনিভার্সিটি লেভেলের টিচার তৈরি করতে হবে। অনার্স/ মাস্টার্স এর জন্য যথেষ্ট টিচার তৈরি করতে হবে। আমি বলবো বাংলাদেশে এখন ফটোগ্রাফির অনেক টিচার আছে। সেটা হলো কোথা থেকে, আমি বলব পাঠশালা থেকে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় হয়েছে। কেউ নিজে অনেক পড়াশোনা করেছে বা জানছে বা ছবি তুলছে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে নিজেকে। তোমাকে একটা জিনিস বলি। আমি কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ। আমাকে যখন বুয়েটের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট সিজনাল লেকচারার হিসেবে ডাকল, চৌদ্দ

দিনের একটা সেশন, সপ্তাহে একটা ক্লাস। ক্লাসের পরে বাইরে এসে আমাদের যে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে বললাম, এখানকার তো কিছু নিয়মকানুন আছে। টিচার হতে গ্রাজুয়েশন বা পলিটেকনিক পাশ হতে হয়। আমি ম্যাট্রিক পাশ। তাহলে বুয়েট কিভাবে আমাকে সিলেক্ট করল। সে বলল, “চন্দন ভাইয়া, রাখেন তো। মানে আপনি নিজে নিজে শিখছেন এটাই তো।” কিন্তু আমাদের দেশে এটা মানে না। বিদেশেও বড় বড় শিক্ষক আছেন যারা কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি। আমেরিকা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়া এবং বাসায় বাকি চার বছর প্র্যাকটিস করা এবং পড়া সমান। অর্থাৎ অনার্স এবং মাস্টার্স এর পাঁচ বছরের বদলে কেউ বিশ বছর যদি একটা কাজ করতে থাকে তবে সে সরকার এর কাছে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট চাইতে পারে। সরকার ওটা খোঁজ নিয়ে দেখে তাকে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট দিবে। সেই হিসেবে বলতে পার আমি তিরিশ বছর ধরে ফটোগ্রাফি করে আসছি। তাহলে আমার হয়ত গ্রাজুয়েশন আছে।

স্তব্ধাশীষ : হ্যাঁ, আমরা সে কথাই বলছি। যেমন-রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের তো তেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

চন্দন: তারা তো না পড়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হননি। উনারা যে পরিমান বাংলা শব্দ জানতেন তা অনার্সের চেয়েও বেশি। উনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি কিন্তু পড়াশোনা তো করেছেন। আমিও তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি তবে পড়াশোনা করেছি। তা না হলে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, আমেরিকান লাইব্রেরি, জেনারেল লাইব্রেরিতে কোন শেলফে ফটোগ্রাফির কোন বই আছে তা না দেখেই বলতে পারতাম না।

স্তব্ধাশীষ : না, একটা বিষয় যেটা আপনি বলেছিলেন আর কি। আমাদের ফটোগ্রাফি শেখার টিচার তৈরি করা বা সহযোগিতা তৈরী যে বিষয়টা সে জায়গাটায় এখন আমরা পিছিয়ে নেই তাহলেতো এখন...

চন্দন: না, অনেক এগিয়ে গিয়েছি আমরা।

স্তব্ধাশীষ : তাহলে বাধাটা কোথায় বলে মনে করেন?

চন্দন: প্রাতিষ্ঠানিক বাধা এটা। আমাদের অন্যান্য অনেক সমস্যা আছে। সমস্যাগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষক দরকার। কিন্তু Photography is not that necessary. আমি একটা উদাহরণ দেই যে, বেগ সাহেব এই কথাটা বলতেন অনেক সময়, আমাদের সাথে গল্প করতেন তো। এখানে বলতেন যে, একবার তাকে মসজিদের ছবি তোলার জন্য বিদেশ থেকে একটা পত্রিকা খবর পাঠালো। উনি বাংলাদেশের একজন নামকরা ফটোগ্রাফার। অনেক আগে, উনি তখন অনেক তরুণ, চাকরি করেন। তিনি মসজিদের ছবি তুলতে গিয়েছেন তখন মুসল্লিরা তাকে ছবি তুলতে বাধা দেয়। তারা তাকে বলেন, “যে আপনি ছবি তুলেন কিন্তু কোন মানুষের ছবি তুলতে পারবেন না”। তো বেগ সাহেব তো খুব বুদ্ধিমান লোক, মুসল্লীদের জবাবে উনি বলেছিলেন যে, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। ধরেন আমি মসজিদের ছবি তুলে বিদেশে পঠিয়ে দিলাম কিন্তু ওরা কি দেখবে জানেন? বাংলাদেশে অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ আছে কিন্তু কেউ নামাজ পড়ে না। তো তখন মুসল্লিদের মধ্যে একটা আলোচনা হলো তারপর তারা বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে আপনি তাহলে নামাজ পড়ার সময় ছবি তুলেন।

স্তব্ধাশীষ : আচ্ছা। আপনি কি বলেন আমরা এই টেকনিক্যাল জায়গায় পিছিয়ে আছি?

চন্দন: না না, টেকনিক্যাল না। এটা হলো গিয়ে মূল্যবোধ। ফটোগ্রাফির মূল্যবোধটা সবার কাছে কতটুকু লেভেলে গেছে এই। এখন এটা অনেক কষ্ট করে প্রমাণ করতে হয় আর্কিটেকচার অথবা ইন্টেরিয়র ফটোগ্রাফি আমি 20mm দিয়ে শুরু করছি দশ-এগারো বছর আগে। কিন্তু যারা বুঝত, ফটোগ্রাফি সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা আছে। আর্কিটেক্টে যারা আমাদের ফটোগ্রাফির জন্য

ডেকেছে তারা কিন্তু আমাকে হাই ফিস দিয়েছে। কারণ ওরা জানে যে, হ্যাঁ উনি জানেন এটা সম্পর্কে। তো আমি তোমাকে চিনি দেখে বেশি দাম দেব। আর ওকে আমি চিনি না দেখে কম দাম দেব। কারণ, ও হয়তো ঐ মানের পারবে না। সেটা ইনস্টিটিউট হলে থাকবে না। কিন্তু ঐ জায়গাটায় আমরা চলে আসছি। এখন আমার মনে হয় যে ডিপ্লোমা teacher আছে আমাদের এখানে, অনেক আছে।

শুভাশীষ : আমি ঐ কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এখন কি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফটোগ্রাফির যাত্রা শুরু করতে পারি? যদি বলা হয় আপনার জায়গা থেকে তাহলে আপনি কি মনে করেন, আপনি পারবেন শুরুটা করতে?

চন্দন: আমি পারব ওটা করতে। কিন্তু শুরু করার সময়টা আমরা পাচ্ছি না। এর জন্য একটা এডমিনিস্ট্রেশন লাগবে, একটা কারিকুলাম লাগবে।

শুভাশীষ : আমি এটাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা সিস্টেমটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারি..

চন্দন: এটা দুই ভাবেই হয়। মানে যারা ইয়াং ফটোগ্রাফার হতে চাচ্ছে, তাদের একটা এনথুজিয়াজম আছে, উৎসাহ আছে, তাই তারা একটা জায়গায় যেতে যাচ্ছে। আবার সরকারেরও দেখার ব্যাপার আছে। এখানে শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। এসবগুলো যখন saturated হবে তখন আন্দোলন লাগবে না। এমনি হয়ে যাবে।

শুভাশীষ : আমরা তো মনে করি এই মূল্যে যদি না হয় তাহলে সরকার এর জায়গাটা থেকে একটা lackings আছে।

চন্দন: না এটাও বলা মুশকিল, সরকারতো ইতোমধ্যে অনুমতি দিয়েই দিয়েছে। যে শিল্প চর্চার জন্য শিল্পকলা একাডেমী আছে, আপনারা চলে আসেন। তো আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে না। এখানে আমি মনে করি তাও ঐ জায়গায় যাইনি, saturation হয়নি। এটা Automatic হবে, এটা হবে। সবমিলিয়ে একটা জায়গায় গেলে না, হবে।

শুভাশীষ : শুরুটা করা দরকার। শুরু করার মত পর্যায়েটায় আমরা এসে গেছি। তাই না?

চন্দন: হ্যাঁ, এখানে বাধ্য হবে তখন করার জন্য, তাই না? আমরা যেমন পাড়ায় একটা গুপ্তগোল হলে পাড়ায় মিটমাট করে ফেলি। না হলে এলাকায় মিটমাট করার মতো লোক আছে তারপরও যখন ওটাও হয় না তখন ধানমন্ডি থানায় যায় ব্যাপারটা, ধানমন্ডি থানাতেও যখন হয়না তখন ঐটা কোর্টে যায়। তাই ব্যাপারটা ঐ লেভেলগুলোকে পার করতে হবে, বললেই হলো না।

শুভাশীষ : কেউ না কেউ তো একটা সময় এগিয়েছিলো, আমাদের একটা মডেল দরকার।

চন্দন: হ্যাঁ, বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Photo journalism department হয়েছিল এবং ওটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কাজী রওনক ভাইকে। এটা প্রথম University level-তে Photo journalism department. সংসদে পাশ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতেও ফটোগ্রাফি বিভাগ করা হয়েছিল কিন্তু কোন কারণে এটা চালু করা সম্ভব হয় নি।

শুভাশীষ : তাহলে তো শুরু হয়ে গেছে আর কি। আমাদের ঐ জিনিসগুলোকে আলাদাভাবে করা দরকার।

চন্দন: হ্যাঁ, এটা হবে একটা সময়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও থাকবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানও থাকবে। তো ঐ জায়গাটাতে ঐ প্রয়োজনীয়তাটা সরকারের কাছে ঐভাবে তুলে ধরতে হবে।

শুভাশীষ : তুলে ধরাটাই মনে হয় এখন দরকার। কারণ আপনি যে কথাগুলো বললেন তা থেকে বোঝা গেল সরকারের আসলে এই বিষয়ে মাথাব্যথাটা নেই। এখন দরকার তাকে আমাদের প্রয়োজনীয়তাটা বোঝানো।

চন্দন: ফটোগ্রাফির আন্দোলনের মধ্যে আমার মনে পড়ে ১৯৮৯/৯০ সালে আলোকচিত্রের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আবুল ফজল গণির আহ্বানে 'ফটোগ্রাফির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই' এরকম দাবিতে একটা মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছিলো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে আলোকচিত্রাচার্য মনজুর আলম বেগ সাহেব ছিলেন, আরো অনেকেও ছিল। আমরা আসলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিয়েই ফাইট করছি। সেখানে ফটোগ্রাফির মত একটা জিনিস শুরু করা অনেক কঠিন। একটা পয়েন্ট আছে, ঐ পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে হবে। তখন দেখবে আন্দোলন করার জন্য নেতাও হয়ে গেছে এবং তখন সবাই ওনার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে কিংবা সবাই মিলে দাঁড়াবে। তখন দেখবে এটা হয়ে যাবে। এতে কিন্তু আমি শুধু রাজনীতি টানব না, সব মিলিয়েই বলছি। রাজনীতি কিন্তু শুধু রাজনীতি না, রাজনীতি সব মিলিয়েই রাজনীতি। রাজনীতি মানে রাজার নীতি না নীতির রাজা। মনে কর আমি নিজে যদি এখন বলি আমি এ বাসার রাজা। এটা বললেই তো হবে না, সবার এটা মানতে হবে। কতো দিন আমি জোর খাটিয়ে রাখব। সবার মতামত মেনে নিলেই আমি হব রাজা।

শুভাশীষ : আমরা সেটাই বলছি। রাজনীতি যেই করুক না কেন, একটা জায়গায় গিয়ে সবাই এক হবে একদিন। ফটোগ্রাফির প্রয়োজনের বোধ এখন মনে হয় তৈরি হয়ে গেছে।

চন্দন: হ্যাঁ, হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফটোগ্রাফি ক্লাব হয়েছে। ফটোগ্রাফি ক্লাবগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী। নর্থসাউথ, ইস্টওয়েস্ট, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ব্রাক এবং অন্যান্য ক্লাবগুলো দুর্দান্ত ফটোগ্রাফি করে। আর আমরা কি করেছি? ওরা যেসব ছবি তুলে আনে, অনেক সময় আমাদের নিজেদের চেয়েও ভালো হয়। ওরা অনেক সুন্দর ছবি তুলছে। ফেসবুকে দেখিতো মাঝেমাঝে, ওরা অদ্ভুত ছবি তোলে। তারাও যে খুব পড়াশোনা করছে, তা না।

শুভাশীষ : আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যারা ফটোগ্রাফি করি, তারা মনে হয় একটু হলেও পড়াশোনা করেই করি।

চন্দন: পড়াশোনাতো করতেই হবে।

শুভাশীষ : নাহলে তো সম্ভব না কাজটা করা। আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। স্যালন ফটোগ্রাফি সম্পর্কে। স্যালন ফটোগ্রাফি নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বলবেন?

চন্দন: স্যালন ফটোগ্রাফি জিনিসটা কি তা আগে বুঝতে হবে। স্যালন শব্দটি আসছে ইউরোপ থেকে। আমি যতটুকু শুনেছি, আগেকার দিনে সন্ধ্যা বেলা সময় কাটানোর জন্য ধনী লোকেরা একটি জায়গায় গিয়ে বসত। সেখানে তারা বিয়ার টিয়ার খেত। সেই মোটা মোটা, সাদা চুল, চাপ দাড়ি, বেশ ধনীদের একটা ক্লাব। ঐটাকে তারা স্যালন বলতো। যেহেতু ধনীদের আড্ডা বসত ঐখানে, সেহেতু সেসময় পেইন্টাররা সেইখানে দেওয়ালের মধ্যে তাদের পেইন্টিংগুলো ঝুলিয়ে দিত। ধনীরা আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমাঝে ছবিগুলো দেখতো। তাদের ছবি পছন্দ হলে দু একটা ছবি কিনত। তো এভাবে ছবি বিক্রি করে ঐ আর্টিস্টরা বেঁচে থাকতো। এটা একটা কম্পিটিশনেরও ব্যাপার ছিল, কারণ যার ছবি বেশি ভাল হতো তার ছবি তত বেশি বিক্রি হতো। যখন কারো বেশকিছু ছবি বিক্রি হতো, তখন সমাজে তার একটা বড় অবস্থান তৈরি হত। সবাই বলাবলি করত, জানো অমুক পেইন্টারের অনেকগুলো পেইন্টিং বিক্রি হয়েছে। তখন সেখানে আস্তে আস্তে ফটোগ্রাফি বুলা শুরু করল। পরবর্তীতে বিক্রির জায়গাটা একটা কমপিটিশনে পরিণত হতে শুরু করল। তারা ভাবল যে, আমরা একটা কমপিটিশনের ব্যবস্থা করি। বছরে একটা কমপিটিশন হবে,

ফটোগ্রাফাররা এতে ছবি জমা দিবে। এবং তারা বিচারকের মাধ্যমে এটাকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অনারেবল মেনশন, গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ এগুলো নির্ধারণ করবে। এখান থেকেই স্যালন ফটোগ্রাফির শুরু, কিন্তু স্যালন ফটোগ্রাফি বলতে আসলে কিছু নাই। এটা একটা ভুল ধারণা। সেই স্যালনটাই এখন একটা কম্পিটিশন হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটিও স্যালন এর আয়োজন করতে পারে।

শুভাশীষ : আপনাদের সময়ে যে ধরনের ফটোগ্রাফি করতেন, ফটোগ্রাফি এর ধারা, পরিবেশ সবকিছু যেমন ছিল এখনকার ফটোগ্রাফি এর ধারার মধ্যে আসলে কতটুকু পার্থক্য দেখেন আর এখন যারা ফটোগ্রাফিতে আসছে তাদের মধ্যে কি ধরনের মিল অমিল লক্ষণীয়, মানে তুলনাটা করতে বলছি...

চন্দন: আসলে আমাদের সময় যে ধরনের ফটোগ্রাফি হত সেটার বেশিরভাগই ছিল ডকুমেন্টারি এবং জার্নালিজম। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারলাম ডকুমেন্টারি ও জার্নালিজমই ফটোগ্রাফির সবকিছু না। এটার আরো অনেক বিভাগ আছে। এবং সব বিভাগেই তার একটা নিজস্ব ধারা বা আর্ট আছে। এখন যারা ফটোগ্রাফি করছে তারা এই বিভাগগুলি সম্পর্কে সচেতন। এবং সেই আর্ট বা ধারার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিন্তু আমাদের সময় ডকুমেন্টারি এবং জার্নালিজম যেহেতু বেশি চর্চা হতো সেহেতু আমরা এ দুটোকেই আর্ট ফটোগ্রাফির চর্চা বলে ধরে নিতাম। আমি মনে করি যে ফটোগ্রাফি কিন্তু বেশি Matured artistic media না। আগে Visual mediaতে পেইন্টিং। পেইন্টিং অনেক matured. পেইন্টিং এবং ফটোগ্রাফি দুটোই ভিজুয়াল আর্ট মিডিয়া এবং পেইন্টিং অনেক বেশি পুরোনো তাই পেইন্টিং থেকে অনেকগুলো টার্ম ফটোগ্রাফিতে এসেছে। শুধু টার্ম না Photographic application গুলোরও অনেকটাই এসেছে পেইন্টিং থেকে। একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই ৯০ সালের রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় যে ছবিটি প্রথম হয়েছিল সেই ছবিটি নিয়ে প্রচণ্ড যুক্তি তর্ক হয় এই বিষয়টা নিয়ে যে, 'When Photograph is Art and When Art is Photograph'

শুভাশীষ : পেইন্টিংস এর সাথে আলোকচিত্রের অনেকখানি তফাৎ রয়েছে। পেইন্টিংস এর সাথে টেকনোলজি ছিল না, ফটোগ্রাফিতে টেকনোলজি আছে।

চন্দন: টেকনোলজি আছে এই পার্থক্য। কিন্তু ভিজুয়াল মিডিয়াতে দুটোই দেখা যায়। এমনও পেইন্টিং আছে যে, ডট বসায় বসায় একটি ছবি আঁকা হয়েছে, যেটা একটু দূরে থেকে মনে হয় ফটোগ্রাফি। ব্যাপারটা হচ্ছে ফটোগ্রাফিটা আসাতে যেটা হয়েছে, ডটটা বসানো লাগছে না। পিন্সে কিংবা সেলুলয়েডের সিলভার হ্যালাইড জায়গাটা দখল করেছে। কিন্তু এমন অনেক নামকরা পেইন্টিং আছে এবং পেইন্টার আছেন যারা এই পেইন্টিং ডট দিয়ে দিয়ে এমন ভাবে আঁকবে যে পাঁচ ফিট দূর থেকে দেখলে মনে হবে এটা একটা ফটোগ্রাফ।

শুভাশীষ : আপনি স্যালন ফটোগ্রাফি নিয়ে যে কথাটা বললেন, এখান থেকে আমরা একটি বিষয় কি ধরে নিতে পারি যে ফটোগ্রাফি আসার পর এটা পেইন্টিং এর শিল্পটাকে অনেকটা দমিয়ে দিয়ে এসেছে?

চন্দন: নো নো, দমায়ে টমায়ে নয়, নিজস্ব জিনিস নিয়ে এসেছে। শিল্প আর্ট এগুলো সব জিনিসের মধ্যেই আছে। মানুষের চলন-বলনের মধ্যে আছে। কথা বলার মধ্যেই আছে। সব কিছুর মধ্যেই আছে।

শুভাশীষ : স্যালন এ যেটা বললেন, পেইন্টিংস এর জায়গাটাই একসময় ফটোগ্রাফি দখল করে নেয়।

চন্দন: না না না, ফটোগ্রাফি যখন আবিষ্কার হল, ফটোগ্রাফের আগে যেটা হতো একজন পেইন্টার গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং করা হতো। পরে একজন ফটোগ্রাফার গিয়ে ল্যান্ডস্কেপটা তুলে এনে একটা অ্যানলার্জমেন্ট বুলিয়ে দিল এই পরিবর্তনটুকু হয়েছে। ঠিক জোর করে জায়গা দখল করার মতো নয়। এটা জোর করার ব্যাপার কিছু নয়। যেমন, পাবলো পিকাসো ফটোগ্রাফির উন্নতি দেখে একসময় রসময় ভঙ্গীতে বলেছিলেন 'Now Photography is there, My job is almost finished'

শুভাশীষ : বাইরের দেশে তো অনেক দেখেছেন, আমাদের ফটোগ্রাফিটা কোন পর্যায়ে আছে?

চন্দন: আমরা এখন যেখানে আছি সেখানেই আছি। ওইটাই ঠিক আমাদের জন্য। যখন হওয়ার তখন হয়ে যাবে। আমি বারবার ওইটাই বলছি কিন্তু তোমাদেরকে। যখন যেটা হওয়ার, সেটাকে তুমি থামাতে পারবে না।

শুভাশীষ : সময়ের নিজস্ব যে একটা দাবি আছে সেটা বলতে চাচ্ছেন?

চন্দন: হ্যাঁ। সেটা সময়ের সাথে হয়ে যাবে। কারণ মিছিল মিটিং আমরা করছি, গভর্নেন্ট এর কাছে, মিনিস্ট্রিতে চিঠিপত্র প্রচুর লেখা হয়েছে। বেগ সাহেব প্রচুর লিখেছেন, তা না হলে কেমন করে ডিপার্টমেন্ট হলো। হঠাৎ করে সংসদ বলে দিলে কি, ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট হবে নাকি? সংসদের কাছে কাজটা পৌছাতে, কতটা জায়গাতে নিয়ে যেতে হয়েছে। শুনো, এগুলো হবে না, মানে চুল টানলেই কি চুল লম্বা হয় নাকি? যে আমি টেনে টেনে চুল বড় করবো বা চুলে প্রত্যেকদিন পাথর বুলিয়ে রাখলাম, তাহলে কি তাড়াতাড়ি চুল বড় হয়ে যাবে? তার নিজের একটা ধারা আছে।

শুভাশীষ : তাহলে আমাদের কি নীতির অভাব?

চন্দন: অবশ্যই। অজ্ঞতা কখনও নীতি তৈরি করতে পারে না। আর এই নীতি তৈরি না হলে ফটোগ্রাফির উন্নতি চুল টানার মত করে বড় করা যাবে না। আমাদের সবাইকে একসাথে পড়াশুনা করে এবং চর্চা করে জ্ঞানের ঐ জায়গাটাতে পৌছাতে হবে যেখান থেকে নীতি তৈরি হবে।

শুভাশীষ : সে কারণেই আমাদের সেই জায়গাটি তৈরি হচ্ছে না।

চন্দন: হ্যাঁ। বাইরের যে কোন দেশে মালয়েশিয়া বা ইউরোপের যে কোন দেশে যদি যাও, গিয়ে কোন লোকের কাছে বলো আমার অবস্থা খারাপ, যদি বুঝাও, তাহলে সে সহযোগিতা করবে। ভিক্ষা দিবে না কিন্তু; তুমি যদি অভাবে যাও, সাহায্য করবে। তোমাকে আমেরিকার একটা ঘটনা বলি। আমেরিকাতে একদিন এক ছেলে বাসে উঠেছে। ও যেখানে যাবে সেখানকার ভাড়া পাঁচ ডলার। তো ওর ধারণা নাই যে কত টাকা ভাড়া। মানে কত ডলার ভাড়া ওর ধারণা নাই। ওর কাছে তিন ডলার আছে। ওর আরো দুই ডলার লাগবে, এখন! মানে আছে তিন ডলার আর লাগবে দুই ডলার। এখন বাস তো ওকে ফ্রি নিবে না। তাহলে কি ওকে তিন ডলারের জায়গায় নামিয়ে দিবে? তখন ও বোকার মত দাড়িয়ে আছে। ও চিন্তা করছে যে আমি কি করব আর একটা স্টপ থেকে আর একটা স্টপ এর দূরত্ব হল ১০ অথবা ১২/১৫ মাইল হবে সম্ভবত। তো ও কি হেটে যাবে?! অসম্ভব। আমেরিকায় মানে.....এটা বাংলাদেশেও তো সম্ভব না।

স্তব্ধশীষ : হ্যাঁ। বাংলাদেশেও তো সম্ভব না ১৫ মাইল হেটে যাওয়া।

চন্দন: তখন অটোমেটিক্যালি একজন বয়স্ক লোক মানিব্যাগ বের করে ওকে দুই ডলার দিয়ে দিলো। তুমি বুঝতে পারছো বিষয়টা! ঐ সততা, বিশ্বস্ততা তারা অর্জন করেছে। তারা মিথ্যা কথা বলে না। একটা মার্ডারারকে যদি কোন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করে, ‘Did you kill him?’ ও বলতেছে যে, “Yes, I killed him, but prove it”. মিথ্যা কথা বলছে না। বলে, হ্যাঁ, আমি মেরেছি, কিন্তু তুমি প্রমাণ কর যে, আমি মেরেছি। মানে বুঝতে পারছো....

স্তব্ধশীষ : আবার তাদের কাজের প্রতি কনফিডেন্স আছে, সব কিছুর একটা কম্বিনেশনও আছে।

চন্দন: হ্যাঁ, সব মিলিয়ে।

স্তব্ধশীষ : আমাদের মনে হয় এই জায়গাটাকেই বড় করা হচ্ছে না।

চন্দন: তো এটাই বলছি যে, রাজনীতি, Who is not doing রাজনীতি? সবাই রাজনীতি করছি আমরা। কিন্তু এটা কি নীতির রাজ্য করছি? না রাজ্যের নীতি করছি?

স্তব্ধশীষ : আমরা রাজনীতিই করছি না। খারাপ দিকটাই আমরা বেশি প্রোভাইড করছি।

চন্দন: খারাপ ভালো আমি বলবো না। খুবই ডেডিকেট এসব কথা বার্তা বলা, এরকম পাবলিকলি বলা। হ্যাঁ, কারণ আমার ব্যক্তিগত মতামত, যে কারণে ভোট আমি কাকে দিচ্ছি সেটা কাউকে বলতে পারব না কেন!? আইন কখনো খারাপ না। বাংলাদেশের সংবিধান কখনো খারাপ না। আইন খারাপ হলে তো এটা আইন হতো না।

স্তব্ধশীষ : Makin Photo Agency প্রতিষ্ঠা করলেন কিভাবে?

চন্দন: ১৯৮২ থেকে ’৮৯-৯০ পর্যন্ত প্রতিবারই বিপিএস মেম্বারদের মধ্যে থেকে যে কমপিটিশন হত, তখন আমি খেয়াল করতাম যে, কে ভালো ছবি তুলছে। যেকোন Field এই হোক না কেন Next কে ভাল কাজ করছে তা সবাই খেয়াল করে। কিন্তু আমি খেয়াল করলাম যে, শফিকুল আলম কিরণের কাজ বেশ ভালো। ও তখন Develop I print এর কাজ করত। জুনিয়র হওয়ার কারণে ও আমার সামনে তেমন একটা আসতো না। ১৯৯১ সালে স্টিভ কর্নেল নামে এক ভদ্রলোক বাংলাদেশে এসেছিলেন ওয়ার্কশপ করতে। সে সময় শফিকুল আলম কিরণ আমার সাথে ফটোগ্রাফি করতো। স্টিভ কর্নেলের এক ওয়ার্কশপে পুরো কন্ট্রাক্টটাই পেয়েছিলাম। প্রতিদিন পনেরোটি ফিল্মের ডেভেলপ এর কন্ট্রাক্ট ছিল। আমি কিরণকে বললাম যে, আমরা দুইজন মিলে এই কন্ট্রাক্টটা নিয়ে নেই, কারণ আমি একা এটা করতে পারবো না। আমি আর কিরণ সেই কন্ট্রাক্টের কাজ করেছিলাম। মূলত কিরণই সেই কন্ট্রাক্টের কাজটা এনেছিল। তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে Developing tank আনা হল। শহীদুল আলম সাহেব আট রোলার Developing tank দিয়ে দিল। আমার কাছে ছিল চার রোল। এইভাবে সবাই মিলে আমরা এই প্রজেক্টটা শেষ করলাম। ওটাতে বেশ কিছু টাকা পয়সাও আসল। তখন আমরা চিন্তা করলাম, এবার আমরা সার্ভিস দেওয়া শুরু করব। তো আমরা দুজনে মিলে সার্ভিস দেওয়া শুরু করলাম। এটাই ’৯৩ সালে এসে Map Photo Agency হলো। ১৯৯৩ সালে আমরা পুরান ঢাকার বাসা থেকে আসলাম ধানমন্ডিতে। এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফটোগ্রাফাররা এসে ওয়ার্কশপ করাত আর আমরা অংশগ্রহণ করতাম। ওখানে অনেক সময় দেখা যেত যে পনেরো জন মিলে একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একেকজন প্রতিদিন তিন রোল করে তিনদিন ছবি উঠাচ্ছে, তো পনেরো রোল ছবি ডেভেলপ করতে হবে, মানে প্রতিদিন পনেরো রোল করে হচ্ছে। তো এটা কারা করবে, ডেভেলপ খুব ভাল করতে হবে। ফিল্মগুলো দোকানে দিলে তো এরা যা ইচ্ছে তাই প্রসেসিং করে দিত, তাহলে তো

টেকনিক্যালি সূক্ষ্ম হবে না। আমি তখন টেকনিক্যালি পারফেক্ট ডেভেলপ করছি। আমি কিছুটা সার্ভিসও তখন দিই যেমন বন্ধুদের ছবি ডেভেলপ করে বিশ টাকা করে নিয়ে নেই। ১০ ইঞ্চি-১২ ইঞ্চি একটা প্রিন্ট পঞ্চাশ টাকা করে নিয়ে নেই। ফটোগ্রাফি করার পাশাপাশি বলা যায় এক রকম বাসা থেকেই ব্যবসা শুরু করলাম ওটা নিয়ে।

শ্রীশীষ : Map নামটা কি জন্য এল?

চন্দন: এ নামটা এসেছে আরেকটা জায়গা থেকে, সেটা হলো, আমি আর কিরণ যখন শুরু করলাম, তখন কিরণের সাথে আমার একটা কন্ট্রাস্ট হলো যে, আমার একটা ভালো Black and White ল্যাব করার ইচ্ছা আছে, যেখান থেকে ভালো একটা সার্ভিস দেবো আমরা। আমি কিরণকে বললাম, তোমাকে যখন আমি ডেকে আনলাম, তখন তুমি আমার পার্টনার এবং আমরা Partnership শুরু করলাম। এবং এই ল্যাব এর নাম হবে Makin Agency of Photography. Makin মানে হচ্ছে মর্যাদাসম্পন্ন।

শ্রীশীষ : Makin টা কোন দেশীয় শব্দ?

চন্দন: এটার একটা Arabic meaning আছে এবং একটা ফারসি Meaning আছে। এটার ফারসি Meaning Probably মর্যাদাসম্পন্ন। আমার বড় ছেলের নাম ও কিন্তু মাকিন।

শ্রীশীষ : এইটা একটা কথা শুনি, যে জন্য আমি আপনাকে প্রশ্নটি করেছিলাম।

চন্দন: হ্যাঁ, আমি ওটা আজ কিয়ারলি বলছি, ওটা আমি ওয়াসেফকেও অনেক কিয়ারলি বলেছি। Actually, Makin Agency of Photography নামটা মর্যাদাসম্পন্ন ফটোগ্রাফিক এজেন্সি। এটাতে কিন্তু আমার ছেলের কোন সম্পৃক্ততা নেই। ভুল বুঝে বাইরে অনেকেই মনে করে যে, এটা চন্দন ভাইয়ের ছেলের নামে করা। আমি বলব যে না আমার ছেলের নাম হতে পারে এটা। কিন্তু তা না, ব্যাপারটা হল গিয়ে এটা হচ্ছে একটা মর্যাদাসম্পন্ন ফটোগ্রাফিক এজেন্সি।

শ্রীশীষ : আমরা আসলে এটা ভুল ভাবছি না। কারণ বিষয়টা পরিষ্কার হলো। বিষয়টা আসলে পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

চন্দন: মাকিন এজেন্সি অব ফটোগ্রাফির কথাটা কোন জায়গায় লেখা থাকত না। আমরা বলতাম Map, কোথায় ডেভেলপ করান? Map এ করাই, কোথায় প্রিন্ট করান? Map এ করাই। Map এ কে আছে? চন্দন ও কিরণ আছে। কিন্তু মাকিন এজেন্সি অব ফটোগ্রাফি এটা আমরা বলতাম না। আমার যেটা প্ল্যান ছিলো, আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন করব, ট্রেড লাইসেন্স করব, তো তখন এর নাম Makin Agency of Photography হিসেবে পরিচিতি পাবে। ওইখানে ফটোগ্রাফার মাহমুদ (মোহাম্মদুর রহমান মাহমুদ) এখন তিনি Map এর মেম্বর এ আছেন। তার সাথে আমার '৮৭ সাল থেকে পরিচয়। ও আমার কাছ থেকেই Film develop করাত, ওর সমস্ত Black and White print আমি Processing করাতাম। But, Makin Agency of Photography কিন্তু আমি আর কিরণ শুরু করেছি। তারপর বিভিন্ন Annual Competition, বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক National Competition. Maximum, Black and White print আমাদের কাছ থেকে করা। এবং আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো বাংলাদেশে যা আছে সেটার মধ্যেই Best possible printing করা আমাদের। এবং আমরা International competition এর প্রাইজ পাওয়া অনেক ছবির প্রিন্ট করেছি, Maximum ছবির প্রিন্ট কিন্তু Era পেপারে করতাম। তখন Ilford paper বাজারে আসে নাই, এগুলো দুই একটা পেতাম আমরা। কিন্তু তখন, আমার কাছে যা আছে তাই দিয়েই আমি Best possible

সাক্ষাৎকার

কাজ করব, Best print করব এটা ভাবতাম। এভাবে Map এর নামে ভিজিটিং কার্ড বানালাম আমরা। ওখানেও কিন্তু Map, আমার নাম, ঠিকানা লেখা। কিন্তু তখনও আমরা Makin Agency of Photography বলি নাই। '৯৩ সালে যখন আমরা ধানমন্ডির বাসায় আসলাম, তখন রোড নং ৩-এ একটা রুম পেলাম। আর গ্যারেজের নিচটা ছিলো বেশ লম্বা। সেখানেই গ্যারেজের উপরে আমরা একটা রুম পেলাম এবং গ্যারেজের কিছু অংশ কেটে একটা Lab বানালাম। পরে Black and White Photographic Lab টাইলস দিয়ে সুন্দর করে করলাম।

স্তব্ধশীষ : কত সালের দিকে?

চন্দন: '৯৩ সালের, ১৮ জুলাই। তখন এটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। একদিন মাহমুদ এসে আমাদের বলল যে, চল একটা ফটো এজেন্সি খুলি আমরা কয়েকজন মিলে। আমি বললাম, ওকে। করি, কোনো আপত্তি নাই। তখন তানভীর জয়েন করলো আমাদের সাথে। তো আমরা চারজন মিলে ম্যাপ ফটো এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করলাম। একদিন মাহমুদ বললো, মোটামোটি ২-১ জন জানে যে, Makin Agency of Photography এটা তোমার প্রতিষ্ঠান, এই নামটা যদি আমরা সবাইকে দেখাই, সবাই মনে করবে এটা তোমার কোম্পানি, কারণ তোমার ছেলের নামের সাথে মিল ছিল এটা। আমি বললাম, দেখ মাহমুদ, এটা আসলে কিন্তু অনেকে জানে না, আমরা এটা বলি নাই, কারণ আমি রেজিস্ট্রেশন না করা পর্যন্ত কাউকে বলব না বা বলি নাই। সবাই জানে Map। তো এই নামটাকে আমি পরিবর্তন করতে চাচ্ছি না। Map শব্দটা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ৪-৫ জন কাজ করেছে, এটা পরিচিত। সবাই যেহেতু এটা চিনে ফেলেছে, চলো মাকিন এজেন্সি অব ফটোগ্রাফি কথাটাকে আমরা কমপ্লিটলি চেপে যাই এবং Map Photo Agency নামে আমরা রেজিস্ট্রেশন করি। তখন Map Photo Agency নামে রেজিস্ট্রেশন করা হলো। তারপর আমরা অনেক জয়েন্ট অনুষ্ঠানসহ অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম।

স্তব্ধশীষ : আপনারা তখন কোনো এক্সিবিশনের আয়োজন করেছিলেন?

চন্দন: Map Photo Agency থেকে এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি মাহমুদের প্রচেষ্টায়। ও আর্থিকভাবে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় ছিলো এবং ও অনেককে চিনত। মাহমুদ বাইরের এনজিও এবং ব্র্যাক, আড়ং ওদেরকে চিনতো, ওখানে প্রোপোজাল দিয়ে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট করে মাহমুদ ওর ছবি নিয়ে একটা এক্সিবিশন করলো। বাংলাদেশের নারীদের ছবি নিয়ে 'Our World' শিরোনামে একটা এক্সিবিশন এবং সেটা ৩৬ টা জেলায় হয়েছিলো। ওইটা Map Photo Agency আয়োজনেই হয়েছিল। সে সময় আমাদের Lab Service টা আরো ভালো হয়ে গেলো, অনেক বেড়ে গেলো, Professional একদম। তারপর আমরা বিভিন্ন রকমের Assignment করা শুরু করলাম। এগুলো কিন্তু আমরা আগেও করতাম। আমি করতাম, তানভীর করতো, কিংবা কিরণ করতো। তা না হলে আমরা চলতাম কীভাবে? আমি ৮-৭ সাল থেকেই মোটামুটি বাইরের কাজ করতাম, Advertising Agency এর কাজ করতাম। মাঝখানে ৯০এর দিকে Dialouge Publication এর Photographer ছিলাম। Dialouge নামে একটা ট্যাবলয়েড সাইজের পত্রিকা বের করা হয়েছিলো। যেটা এখন Daily Star অফিস, সেটা আগে ছিলো Dialouge Publication Limited এর অফিস। ৯-১০ মাস পরেই Dialouge বন্ধ হয়ে গেলো। ১৯৯৫ সালে হঠাৎ করে FIAP থেকে একটা চিঠি আসল তাতে লেখা Author Exhibition এ অংশ নেয়ার বিষয়ে। ১০টি দেশের প্রতি দেশের একজন করে ১০ জন Photographer এর একেকজনের ১০ টা করে ছবি নিয়ে ১০০ টি ছবির একটি প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী। ওই অফারটা আসলে তখন ওইখানে আমি কমলাপুর রেলস্টেশনের দশটা ছবি পাঠালাম। এবং এটা International Federation of Art Photography এর অত্যন্ত সম্মানজনক একটা ব্যাপার ছিল।

শুভাশীষ : FIAP?

চন্দন: FIAP এর তখন ৯০ কি ১০০ জন Member ১০০ জন ১০০ দেশের। সেখানে ১০ টা দেশের, একেক দেশের একেক জনের মধ্যে আমি বাংলাদেশ থেকে সিলেট হয়েছি।

শুভাশীষ : বাংলাদেশ থেকে প্রথম একজন কি আপনি? নাকি আগেও কেউ হয়েছিল বলে আপনার জানা আছে?

চন্দন: আমার মনে হয় না। Author Exhibition এ আনোয়ার ভাই এর হয়তো হতে পারে। এটা আমি জানি না। কিংবা আর কারো হয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না।

শুভাশীষ : Exhibition টা কোথায় আয়োজন করা হয়?

চন্দন: এটা প্যারিসে। পাবলো পিকাসো এবং ভিক্টর হুগো মিউজিয়ামে এক মাস করে, দুই মাস আমাদের ওই ১০ জনের ১০০ টা ছবি Exhibited হয়েছে। পাবলো পিকাসো ভিক্টর হুগো মিউজিয়ামে, মানে তো আমি অবাক। পাবলো পিকাসো এবং ভিক্টর হুগো মিউজিয়ামে Exhibition এ ছবি যাওয়া মানে একটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার। তার উপর আবার এক মাস এক মাস করে। ওইখানে আমি FIAP সিলভার মেডেল পেলাম। তো তাহলে আমার FIAP গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ হয়ে গেল। আমি আমার বন্ধুদের বললাম যে, “দেখ, FIAP গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ হয়ে গেছে। আমার আর Competition এ Participate করার ইচ্ছে নেই। ধুর, বাদ দাও Competition আমি আর করছি না, তোমরা করো। ওই তখন থেকে আমি International Competition এ অংশ নেয়া বন্ধ করে দিলাম। আর Participate করি না তারপর। ওরা করে ওরা মজা পায়, খুব মজা পায় ছবি পাঠায়। ওদের অনেক পুরস্কারও আছে এটা একটা অর্জনও বটে। ১৬০,২৬০ টা award আছে একেকজনের।

শুভাশীষ : আচ্ছা....আচ্ছা।

চন্দন: আনোয়ার ভাইয়ের About নব্বইটা Award আছে। So, Bangladesh and International Competition যদি বলা হয়, মানে Prize যদি বলা হয়, তাহলে Around ৫০০ তো এইখানেই হয়ে গেল। আমার, শুভ্র আর মাহফুজ রানা। আনোয়ার হোসেন, সিলেটের রিমন, চট্টগ্রামের অঞ্জন, শোয়েব ফারুকী আরো অনেকে। এখন নাম মনে করতে পারছি না। যাই হোক, এখানেই তো ৭০০-৮০০ হয়ে গেছে।

শুভাশীষ : তো এখানে একটা বিষয়, আপনি এখনো Photography practice করছেন?

চন্দন: সবাই করে।

শুভাশীষ : কিন্তু কোন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড মানে যে কথাটা একটু আগে বলেছিলেন, যে আপনার জায়গাটা আপনি পেয়ে গেছেন। তো তারপর কি আপনার ফটোগ্রাফি চর্চাটা কি একটু কমে গেছে? এটা কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে?

চন্দন: চর্চা কমে নাই, কিন্তু ফটোগ্রাফি করাটা কমে গেছে। কারণ '৯৩-৯৪ তখন কিন্তু আমার ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। আমি '৮৩ তে বিয়ে করেছি। '৮৪ তে আমার বড় ছেলে হয়েছে। '৯০ তে আমার ছোট ছেলে হয়েছে। তখন আরো প্রফেশনাল হয়েছি। তখন অর্থ উপার্জনের জন্যই ফটোগ্রাফি। কিন্তু এমনি আমি ছোট ছোট আউটিং করি। এইতো কয়েকদিন আগেও ধানমন্ডি লেকে গিয়েছি, বন্ধুদের সাথে এখানে ওখানে যাই, ছবি তুলছি। সেটা তুলছি কিন্তু আগে যে ব্যাপারটা ছিল অনুষ্ঠান করে যাওয়া, সেটা ওভাবে আর

সাক্ষাৎকার

হয়না। গাবতলীতে আমিনবাজার ব্রিজ যেটা, ওই ব্রিজের আমি ৮১ সাল থেকে ছবি তুলি। তো বন্ধুদের ক্যামেরা ধার করে নিয়ে গিয়ে ছবি তুলেছি। ৮১ সালের একটা ছবি আছে আমার কাছে।

স্তব্ধাশীষ : প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এরপর কি আপনি ফটোগ্রাফি শিখেছেন? মানে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক ফটোগ্রাফি শেখার বিষয়টা যদি একটু বলতেন।

চন্দন: সেটা হলো গিয়ে, এখনো যদি কোন ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ হয়, আর যদি ওইখানে একটা সিট খালি থাকে। যেমন, জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে দুই বছর আগে একটা ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ হয়েছে Cityscape নামে। আমি অংশ নেই তাতে।

স্তব্ধাশীষ : আচ্ছা।

চন্দন: শহরের ল্যান্ডস্কেপ। ওটাতে আমি পার্টিসিপেট করেছি। আমি ওয়ার্কশপ করাচ্ছিও। ওয়ার্কশপে পার্টিসিপেটও করছি। ওয়ার্কশপ জিনিসটা কি আসলে? ওয়ার্কশপ একটা মেরামতকারী জায়গা। মানে গাড়ির গ্যারেজ। ওখানে তো নতুন গাড়িও যায় অনেক সময়। যে আমার গাড়িটা একটু পলিশ করে দেন। অনেক গাড়ি এক বছর চলার পর, “আচ্ছা একটু দেখেন তো এখানে, গাড়ীর ভিতরের কোন কিছু ঠিকঠাক করতে হবে কিনা। অনেক ভাঙ্গা গাড়ি ও যায়। এমনও হয় পাঁচটা ভাঙা গাড়ি একটা গাড়ি হয়ে যায়। So, ওয়ার্কশপ করতে তো কোনো দোষের কিছু নেই। আমি এখনও ওয়ার্কশপ করি। ওদের সাথে গেলে কিছু ছবি তোলা হয়। So, আমার আবার একটুখানি চর্চাও হলো।

স্তব্ধাশীষ : কমলাপুরের স্টোরির ঘটনাটা একটু বলবেন?

চন্দন: দূকের আয়োজিত একটা প্রদর্শনী থেকে আমার একটা প্রিন্ট বিক্রি হয়েছিল একবার। তো প্রিন্ট বিক্রি হওয়ার পর দূক আমাকে যে টাকা দেয়ার সে টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করি নাই ওটা কে কিনল! কিনল! কেউ কিনছে, বিদেশি কেউ একজন কিনছে। এটা তো..কে ছবি কিনল এটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তো এক বিদেশি নাম কাউস ইউলার। ও মাঝে মাঝে বিপিএস এ মিটিং এ আসত; প্রদর্শনীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতো। তো কাউস ইউলার একদিন বিপিএসকে প্রস্তাব দিল যে, “আমিতো সুইজারল্যান্ড এ থাকি, তো আমাকে এই বিপিএস থেকে ১২ কি ১৫ জনের একেক জনের তিনটা করে ছবি দিলে আমি ছবিগুলো নিয়ে সুইজারল্যান্ড এ কোন জায়গায়.. একটা গ্যালারীতে ১টা প্রদর্শনী করার অনুরোধ করব; যদি করি তাহলে বিপিএস এর কিছু ফটোগ্রাফারের ছবি সুইজারল্যান্ড এ প্রদর্শনীতে যাবে।” তো এটার দায়িত্ব আবার আমাকে দেয়া হল। আমি সবার কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করলাম। সংগ্রহ করে নিয়ে ওর অফিসে গেলাম। অফিসে যাওয়ার পর দেখি যে আমার একটা প্রিন্ট ওর দেয়ালে। কমলাপুরের একটা ছবি। তা আমি বললাম, “তুমি এই ছবি কোথায় পেয়েছ? এই ছবি তো আমি বিক্রি করি না কিংবা দেখাইও না, তুমি এটা কবে পেয়েছো?” এটা ‘৯২ সালের কথা। তো সে বলে যে, “চন্দন, তুমি তো জান না আমি কিন্তু গত ৩ বছর ধরে সব প্রদর্শনীতে গিয়ে প্রথমে তোমার ছবি দেখি, তুমি কি করতেছো এটা দেখি এবং আমি জানি যে তোমার অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, সেহেতু আমি তখন ছবিটা কিনছিলাম, যাতে তুমি কিছুটা উপকৃত হও।”

স্তব্ধাশীষ : আচ্ছা।

চন্দন: তো..আমি.. বললাম ও..ও.. আচ্ছা। ওকে বললাম যে, এটা একটা পঁচা প্রিন্ট, এইটা হয় নাই। আমি আরেকটা ভাল প্রিন্ট করে দেই তোমাকে, তুমি এটা লাগিয়ে রাখো এটার মধ্যে। এমনই তোমাকে আমি প্রিন্ট করে দিব। তো ও হেসে দিচ্ছে। বলে যে,

সাক্ষাৎকার

না..না..না..এইটাই একটা প্রিন্ট, এইটা ঠিক আছে। এইটাই আমি কিনছি। মানে একটা আর্ট পিস যেমন, ‘ওটা আমারই’। তো আমাকে বললো, চন্দন তুমি কমলাপুরের উপর কাজ কর অনেকদিন ধরে, তাই না? আমি দুইটা ন্যাশনালে তোমার ৪টা, ৪টা, ৮টা, আর এই একটা ৯টা ছবি আমি দেখেছি। তুমি কমলাপুরে কতদিন ধরে কাজ করতেছো?” তা আমি বললাম, প্রায় ৩ বছর হয়ে গেছে। তো ওখানে কি আরও অনেক ছবি হবে, মানে ৫০/৬০ টা ছবি দিতে পারবা আমাকে? প্রদর্শনী করার জন্য? না এভাবে তো আমি কখনো দেখি নাই, কারণ আমার তো এটা ..আমি অনেকদিন ধরে করবো চিন্তা করতেছি। না তুমি ওখান থেকে কিছু প্রিন্ট আমাকে করায়ে দাও। তো তখন আমি বললাম যে তাহলে তো ভাল পেপার লাগবে। তখন সে এক সুইস মহিলাকে দিয়ে আমার আমাকে করায়ে দাও। তো তখন আমি বললাম যে তাহলে তো ভাল পেপার নিয়ে আসলো। আমি ওকে ৩৬ টা প্রিন্ট করে দিলাম। তো ও বিপিএস এর ৪৫ টা ছবি; জন্য কোডাক এর ১০০ শিট ভাল পেপার নিয়ে আসলো। আমি ওকে ৩৬ টা প্রিন্ট করে দিলাম। তো ও বিপিএস এর ৪৫ টা ছবি; আর আমার ৩৬ টা কমলাপুরের ছবি নিয়ে চলে গেছে। তারপরে আর কোন খবর নাই। নাই নাই নাই নাই। মাস তিন চারেক পরে হঠাৎ করে আমাকে আবার ডাকলো সে। ডেকে বললো যে, ইন্ডিভিজুয়াল ফটোগ্রাফার এর একেকজনের ৩টা ৪টা ছবি নিয়ে ওরা প্রদর্শনী করবে না। ওরা একজনের ফটোগ্রাফ নিয়েই প্রদর্শনী করবে। সে বললো তো তাহলে তুমি একটু কাজ করো, তুমি আমাকে ও.. এটা আসলে হলো গিয়ে ‘৯৩ এর শেষের দিকে। এক বছর পরে সে কনট্যাক্ট করল আমার সাথে।

স্তাশীষ : ছবি নিয়ে যাওয়ার পর...

চন্দন: '৯৩ সালে ও আমাকে বললো যে তুমি এটা করবা নাকি? '৯৩ এ কিন্তু আমার আরো ছবি তোলা হয়ে গেছে অনেক । '৯৩ এর অক্টোবর নভেম্বরের দিকে, তখন চার বছর হয়ে গেছে । আমার আরও ছবির কালেকশন হয়ে গেছে কমলাপুরের । তো তখন আমাকে বললো যে, "চন্দন এরকম ওরা তোমার ছবি নিয়ে প্রদর্শনী করতে চাইছে । তো তুমি এখন খুঁজে দেখো যে তুমি ৫০/৬০ টা ছবি দিতে পারবা কিনা এখানে?" তা আমি বললাম যে, আচ্ছা ঠিক আছে । তো সব কনটাক্ট প্রিন্ট করলাম ।

শুভাশীষ : আচ্ছা....

চন্দন: মানে ১৯০/১৯৫ রোল ফিল্ম, ১৯৫ টা কনট্যাক্ট প্রিন্ট করলাম। আমরা তো কনট্যাক্ট প্রিন্টও করতাম না। কারণ ১শীট পেপারের দাম ও আমলে তিরিশ টাকা। কনট্যাক্ট প্রিন্ট করলে সব ছবি দেখা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওটা তো আর কোন কাজে লাগতেছে না। তো এতই কম ছবি তুলতাম যে আমরা যে কোন একটা নেগেটিভ খুঁজে বের করতে হলে বেশি কষ্ট করতে হত না আমাদেরকে। ৫০ টা নেগেটিভ লাইট এর বিপরীতে এমনি ধরলেই বের হয়ে যেত ছবি। কিন্তু আমি কত হার্ডলি ৬/৭ হাজার রোল ছবি তুলছি এই জীবনেনা..আমি বলি আমি কত রোল ছবি তুলছি। হার্ডলি ৩০০০ রোল ছবি তুলছি আমি। ৩০০০ কি আমার তো মনে হয় তাও না। আরও কম হবে। ৩০০০ রোল অনেক মানে ১০০/২০০... হার্ডলি ২০০০ রোল ছবি তুলছি। ট্রান্সপারেন্সি, সাদা এবং কালো রং মিলায়ে তো ২০০০ থেকে ২৫০০ রোল ছবি তুলছি। আর....খারাপগুলো তো ফেলেই দিতাম।

তা যাই হোক ও বলার পর আমি কনট্যাক্ট প্রিন্ট করলাম। যে আচ্ছা ঠিক আছে... ইন্টারন্যাশনাল Solo প্রদর্শনী হবে আমার একটা। তো আমি কনট্যাক্ট প্রিন্ট করে ওখান থেকে বেছে ৬৩ টা প্রিন্ট রেডি করে দিলাম ওনাকে। ও আবার আমাকে পেপার আনিয়ে দিল। আবার ১০০ শীট পেপার আনিয়ে দিল এখান থেকে। না..না..না..আবার না..ও যে প্রথম ১০০ শিট দিয়েছিলো...ওখান থেকে আমি তো ৩৬ শিট প্রিন্ট প্রথমেই দিয়েছিলাম। বাকি যেই পেপারগুলো ছিলো সেইগুলি থেকে প্রিন্ট করে দিলাম। মানে ১০০ শিট থেকে ৬৩ প্রিন্ট করে দিলাম।

গুভাশীৰ : আচ্ছা...আচ্ছা...

চন্দন: মানে বিদেশে হয়তো ৩৬ শিট দিয়ে ফটোগ্রাফাররা ১টা ছবি প্রিন্ট করে ..আর আমি করেছিলাম ১০০ শিট দিয়ে ৬৩ টা প্রিন্ট ।

স্তব্ধশীষ : কনসেনট্রেশনটা খুব বেশী ছিলো....

চন্দন: কনসেনট্রেশন বেশী ছিল । তো ওকে ৬৩ টা ছবি দিলাম । দেয়ার পরে ও আরেকদিন হঠাৎ করে আফিসে ডাকলো আমাকে । বলল, “ওরা তো তোমাকে ৫০০ ক্যাটালগ বানানোর জন্য এক একটা ক্যাটালগে পনের ফ্রাংক করে দেবে । তাহলে সাড়ে সাত হাজার ফ্রাংক দিবে । তুমি যদি এখানে থেকে পাঁচ সাতটা ছবি দিয়ে লেখা দিয়ে একটা বুকলেট বানিয়ে দিতে পার, ক্রিশিয়ার বলে যেটাকে, সেই একটা ছোট ক্যাটালগ বানিয়ে দিতে পারো । তাহলে এটা আমি এইখানে নিয়ে ১৫ ফ্রাংক করে বিক্রি করতে পারব । ৫০০ টা বানিয়ে দাও আমাকে ।” তো আমি বললাম, “দেখ কাউস, আমি দুঃখিত । আমি তোমাকে এটা দিতে পারব না । কারণ আমি প্রদর্শনী করছি । আমি ৬৩ টি ছবি দিয়ে বই বানাব, এটাই আমার টার্গেট । তাই এরকম একটা ক্যাটালগ বানিয়ে পঁচাত্তরে চাচ্ছি না । So I can make a book out of it, then I will print. Otherwise no. একটা কাগজের মধ্যে একটা ছবি থাকবে । হাসান সাইফুদ্দীন চন্দন ও কিছু সিভি, বায়োগ্রাফি থাকবে আর কিছু অ্যাওয়ার্ড এগুলো এক শিটেই বানাবো । আমি তো এডোমেন্ট, না দিব না আমি এটা । আমার ছবি এভাবে দশ বারোটা ছাপাবো না । তখন ও বললো যে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু চেষ্টা করে দেখি । সব আমার অগোচরে কিন্তু করছে । তো বলে সে করল কি সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এর কাছ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা জোগাড় করল । আর বাংলাদেশের আরো কয়েকটা কোম্পানি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অন্যরা যারা সুইজারল্যান্ডে কাপড় পাঠায় ওদের থেকে আরো পঁচাত্তর হাজার টাকা জোগাড় করল । করে আমাকে বললো যে, এই নাও । তুমি বই বানাতে চেয়েছিলে না, বানাও তোমার বই । এরপর পাঁচ দিনের মধ্যে বইটা হয়ে গেছে । আমি এতো বিস্তারিত বললাম এজন্য যে, খুব সহজেই যে ব্যাপারটা করা যায় তা না । এখানে আমার ভাল ছবি ছিল, অন্যদেরও সহযোগিতা ছিল, সবমিলিয়েই কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে । এবং ভাল কাজ করলে যে সেটা কারো সুনজরে পড়ে এবং একটা সুন্দর সহযোগিতাও যে তার কাছে চলে আসে সেটা বলার জন্য । এরপর হঠাৎ একদিন কাউস আমাকে বলল, তুমি তোমার এক্সিভিশন ওপেন করবে । তো আমি বললাম যে, কেন নয়? তুমি যদি ম্যানেজ করতে পারো তবে দেখ । তখন সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন আমার পেনের টিকিট দিল । এবং আমাকে ১০০ ফ্রাঙ্ক/১০০ ইউএস ডলার করে আমার পকেট মানি দিল, যে আমি যতদিন থাকব প্রতিদিন ১০০ ইউএস ডলার করে পাব । ওটা আমার বিরাট একটা অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাদের মূল্যায়নে আমি কৃতজ্ঞ ।

স্তব্ধশীষ : ওখানে যে ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল সেখানে শুধু আপনার ছবিগুলোই কি প্রদর্শিত হয়েছিল?

চন্দন: কমলাপুর রেলস্টেশনের শুধু আমার তোলা ছবি ছিল । এ ঘটনাটা আমি বলছিলাম ১৯৯৬ সালের ।

স্তব্ধশীষ : এটা কি আপনার প্রথম বই ছিল? আপনি কতদিন কাজ করেছেন কমলাপুর রেলস্টেশনের উপর?

চন্দন: পাঁচ বছর । উন্ননবইয়ের নভেম্বর থেকে চুরানবইয়ের চার কি চৌদ্দ মার্চ পর্যন্ত কাজ করেছি ।

স্তব্ধশীষ : তারপর কি কাজটা বন্ধ করে দিয়েছেন?

চন্দন: না, আমি আর তারপর ওখানে কাজ করিনি । তারপর আর কাজ হয়নি । কারণ, তারপর আমরা ধানমন্ডিতে চলে আসলাম । ১৯৯৩ পর্যন্ত আমি ছিলাম পুরান ঢাকায় । ওখান থেকে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত যাওয়া আসা করার সুবিধা ছিল । আর তখন এত ট্রাফিক জ্যাম ছিল না । কিন্তু যখন ধানমন্ডিতে চলে আসলাম তখন কিন্তু স্লো হয়ে গেলো আমার যাওয়া । কারণ, ধানমন্ডি থেকে কমলাপুর রেলস্টেশন যাওয়া একটু দূর হয়ে গেল । তখন ল্যাব আর প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম । কিন্তু তারপরও যেতাম

মাঝেমাঝে এখনও যাই।

শুভাশীষ : ম্যাপ এজেন্সি থেকে আপনি কি এখন দূরে আছেন? নাকি এখনো ম্যাপ এজেন্সির সাথে আছেন?

চন্দন: অফকোর্স, আমি ম্যাপ এজেন্সিতে আছি। আচ্ছা, আমি কমলাপুরের ব্যাপারটায় আসছি। তো চারদিন বা পাঁচদিনের মধ্যে বই হয়ে গেল। লেখা নিয়ে আমার এক বন্ধু তারেক সুজাত আমাকে ছাপার কাজে সাহায্য করল। ও গ্রাফিকস্ ডিজাইনে ছিল এবং পাবলিকেশনের কাজ করত। ও পুরোটাই আমাকে সাহায্য করল। এবং আমার বইয়ের প্রচ্ছদের ডিজাইনটা পুরোটাই কিন্তু ওর করা। (তারপর বইটা হাতে নিয়ে) এই যে এই কভারটা ওর করা। প্রথম এডিশনের মাত্র তিন কপি আছে আমার কাছে।

শুভাশীষ : এটার কতটি এডিশন বেরিয়েছে?

চন্দন: এটা সেকেন্ড এডিশন। যাই হোক এই ছিল কমলাপুরের ঘটনা।

শুভাশীষ : একটা বিষয় দেখা যায় যে, আমাদের দেশে বাইরের যারা বিদেশি ফটোগ্রাফার আছেন, বড় ধরনের ওয়ার্কশপগুলো তারা পরিচালনা করেন। আমাদের দেশ থেকে কেউ কি বাইরে গিয়েছে, বা আপনারা কি কখনো গিয়েছেন, কোথাও ডাক পেয়েছেন বা গিয়ে প্র্যাকটিস করিয়েছেন?

চন্দন: না, আমরা ওইরকম ভাবে করিনি।

শুভাশীষ : তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে, ওই জায়গাটায় আমরা বাইরের দেশ থেকে পিছিয়ে আছি?

চন্দন: আসলে হয়েছে কি জিনিসটা, কিছুটা আমি বলব যে, আমাদের দেশের projection টা বাইরে। বাইরের দেশের ফটোগ্রাফাররা কিন্তু বলে যে, বাংলাদেশের মতো ভালো ফটোগ্রাফারের সংখ্যা তারা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখেননি। সেবাস্তিও সালগাদো কিংবা আব্বাস ম্যাগনামের মত ফটোগ্রাফার যারা, তারা বলেছেন যে ইন্ডিয়া অনেক বড় দেশ, অনেক মানুষ, অনেক ফটোগ্রাফার। বাংলাদেশ ছোট দেশ, কম মানুষ, কিন্তু অনেক ভালো ফটোগ্রাফার।

শুভাশীষ : তো এই দুর্বল ইকোনোমিক কন্ডিশনে ও এখানে.....

চন্দন: মানে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা কিন্তু আমি বলব যে আমি ঠিক জানি না, কোন কারণে অনেক ভালো ছবি তোলে। অনেক তাড়াতাড়ি বোঝে জিনিসটাকে। অনেক তাড়াতাড়ি ছবির বিষয়ের কাছে চলে যেতে পারে।

শুভাশীষ : কোন জায়গাটায় আমাদের অভাব?

চন্দন: অভাব হল যে, আমরা হলাম প্রচারবিমুখ। আমরা কনজারভেটিভ। ওই নিজেদের মধ্যেই আমরা আছি যে, আমি ঢাকা-চিটাগাং-খুলনা-রাজশাহী-ফরিদপুর-ময়মনসিংহ-বরিশাল এর মধ্যেই। কিন্তু এটাকে যে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা আমাদের ভাবনাতে নেই। হ্যাঁ, একটা জিনিস আমাদের এখানে ফটোগ্রাফার যে পড়াশুনাটা, এই গ্র্যাজুয়েটটা নাই। সেটা কিন্তু নির্ধারণ করে দেয় যে, আমি বাইরে একটা ওয়ার্কশপ করাতে যেতে পারবো কীনা, তাই না?

শুভাশীষ : এই আন্দোলনটা আপনারাই তৈরি করে দিয়েছেন। আপনাদের ঐ জায়গা থেকেই এসেছে, একদিনে আসেনি। একটা বিষয় আসলে আমি বুঝি না, কেন যে আপনারা প্রচার বিমুখ! আপনাদের প্রতি এটা আমাদের অভিমান। আমাদের দেশে একজন

মডেল খুঁজতে চাই, আদর্শের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে যে বিখ্যাত ফটোগ্রাফাররা ছিলেন, যেমন রশীদ তালুকদার এবং এখন যারা আছেন আনোয়ার হোসেন স্যার সহ অনেকে তাদের কাজ দেখতে চায় এদেশের মানুষ, আমাদের দেশে মিউজিয়াম আছে, চিত্রশালা আছে, কিন্তু ফটোগ্রাফির এই জায়গাটা তৈরি করা যায় কিনা?

চন্দন: ফটোগ্রাফির আকর্ষণটা আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে।

সভাপতি: এই নিয়ে কি কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে না? আপনারা তো দেশের প্রবীণ, আপনারা কি কোন উদ্যোগ নেবেন না?

চন্দন: এ নিয়ে উদ্যোগ অনেক বার নেওয়া হয়েছে; মিছিল মিটিং হয়েছে শহীদ মিনারে, ফটোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে। গভর্নমেন্ট এর কাছে চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছে। সংসদে উঠলো কথাটা তারপর সংসদ একটা আইন পাশ করে দিলো তার পরেই তো শিল্পকলা একাডেমীতে ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট খোলা হলো। তার পরেও পড়ে আছে ২০ বছর।

সভাপতি: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন আপনি, এগুলোতো একদিনে তৈরি হয়নি।

চন্দন: তাহলে অপেক্ষা কর পরিবর্তনের জন্য। তোমরা বল আমরা বলেছি, দেখ কিছু হয় কিনা। কারণ দেশে মিলে করি কাজের মত। দেখ কোন কিছু করা যায় কিনা। তারপরে তোমরা বুঝবে বাধা দেয় কারা। কিভাবে তাদের ঠেকানো যায়। আগামী ২০ বছরে ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট খুলবো বলে এমএ পাশ করে বগলের নিচে ফাইল নিয়ে মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ে ঘুরে দেখ।

সভাপতি: আমরা আশাবাদী, এটা একদিন হবেই। একটা সময় মানুষ ফটোগ্রাফিকে দেখত অন্যভাবে এখন এটা পরিবর্তন হচ্ছে।

চন্দন: ফটোগ্রাফিতে যে সায়েন্স আর্টসের ব্যাপারটা। ফটোগ্রাফিটা আসলে ৫০% সায়েন্স ৫০% আর্টস। টেকনোলজি বেইজড আর্ট। এটা বেশি পুরনো না, মাত্র ১৬৮ বছর, বা ঐ রকমই হবে। ১৯৬৬ যদি ১৫০ বছর হয়, এতে ১৪ বছর যোগ করে দেখ। অন্য শিল্পগুলোতে ১১৬৮ বছর পুরোনো তাই তাদের ডিপার্টমেন্ট আছে। ঠিক ততটা সময়ই ব্যয় করতে হবে একটা ইনস্টিটিউট করতে বা ফটোগ্রাফিকে একটা লেভেলে আনতে। একটা শিল্পতো একদিনে আসে না। সব আর্টই যেমন নাচ, গান, শিল্প এগুলো হাজার বছরের পুরোনো দেখেই এখানে এসেছে বা ম্যাচুরিটি এসেছে। ফটোগ্রাফি তো আসলে বেশি দিনের পুরোনো না। যদিও বাইরের দেশে ফটোগ্রাফিক সোসাইটি খোলা হয়েছে। তবে ফটোগ্রাফি আসতে বেশিদিন হয়তো লাগবে না কারণ, এখন কমিউনিকেশনের ডেভেলোপমেন্ট হয়েছে তাই পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আসতে বেশি অসুবিধা হবে না, বেশিদিন সময় লাগবে না মানুষের।

সভাপতি: আপনি তো অনেক ছবি তুলেছেন। কিন্তু ছবিগুলো কি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন?

চন্দন: সংরক্ষণ, হ্যাঁ এটা প্রথম দিকে খুব অসুবিধা হতো। পরের দিকে পলিথিন দিয়ে আমি চকবাজার থেকে নেগেটিভ এর এনভেলপ বানিয়ে নিয়ে আসতাম। আর Map এর আমরা তো ৫০ পাউন্ড একবারে বানিয়ে নিয়ে আসতাম। কারণ Map এর সার্ভিস যারা নিচ্ছে, তাদের তো আমার সার্ভিস দিতে হবে। তো, এ ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গা থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। Negative এর যত্ন কিভাবে নিতে হয় অনেকটা জেনেছি পড়াশুনা করে, বই পড়ে। বেগ সাহেব, তারপর শহীদুল আলম সাহেব আরো অনেকে সহযোগিতা করেছেন। শহীদ ভাই কিংবা আনোয়ার ভাই ওনাদের দেখেছি ওনাদের কাছে শিখেছি। শহীদ ভাই আমাদের Photography এর কপিরাইট নিয়ে সেমিনার করেছিলেন। মানে, ফটোগ্রাফ যার ইচ্ছা, ফটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস না করে অনেক ছাপিয়ে দিত আগে। তো এই নিয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল। United Nations Information Centre এ। কোন

ইয়ারে মনে নেই, শহীদুল আলম organize it.

স্ত্রীশীষ : আপনার নিজের একটি ফটোগ্রাফি শেখার প্রতিষ্ঠান শুরু করার ইচ্ছে আছে বলছিলেন...

চন্দন: করতে পারি, ব্যক্তিগত ভাবে করতে পারি। কিন্তু সেটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন করার জন্য যেই সহায়তা লাগবে, কিংবা এটা মানসম্পন্ন হলো কীনা একটা judgment লাগবে। আমি বেগ আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে বের হয়েছি। তারপরও তো ওয়ার্কশপগুলো করতাম। আমি এখন যথেষ্ট উচ্চ মানের কাজ করছি। সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে একদিন হয়তো করবো।

স্ত্রীশীষ : ফটোগ্রাফির ভবিষ্যত নিয়ে কি আপনার কোন চিন্তা ভাবনা আছে?

চন্দন: কি ধরনের ?

স্ত্রীশীষ : ফটোগ্রাফি নিয়ে যেমন আপনি একটা সময় “ম্যাপ” ফটো এজেন্সি শুরু করেছিলেন। এখন “ম্যাপ” এর সঙ্গে কাজ করছেন, এর বাইরে কি কোন কিছু করার ইচ্ছা আছে, কখনো স্বপ্ন দেখেন কীনা?

চন্দন: একদম সোজা কথায় বলি, আমি ছোট একটা স্কুল করতে চাচ্ছি সেটা “ম্যাপ”এরই একটা ব্রাঞ্চ হবে “ম্যাপ স্কুল অব ফটোগ্রাফি”।

স্ত্রীশীষ : আচ্ছা আচ্ছা..

চন্দন: সেটাকে আমরা যত সুন্দরভাবে ঘটাতে পারি। কোন একটা স্কুল কখন হয় এটা প্রফেশন থেকেই তো আসে। যদিও পাঠশালা নাম, কিন্তু আসলেই কি পাঠশালা এটা। পাঠশালায় আসলে কি হত? আগে কোনো একজন শিক্ষিত লোক তিনি মনে করলেন যে, উনি জ্ঞান দান করবেন তারপর তিনি একটা পাঠশালা খুলে বসতেন। এখানে প্রশ্ন আসে, কারা ফটোগ্রাফি শিখতে আসবে? তাদের মন জয় করা, তাদের আয়ের পথ বলে দেয়া সঠিকভাবে, যেন তারা ফটোগ্রাফি করে বাঁচতে পারে, সে রকম আগে একজন আমারও হওয়া লাগবে। আমি বারবার একটা জিনিস বলছি যে প্রথমে কিন্তু হলো গিয়ে বাঁচতে হবে। তারপরে না, তারা আমাকে চার আনা এক টাকা দিবে। কিংবা টিনের বাস্কে বার টাকা দিয়ে বলবে যে, “স্যার আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে তাহলে... আমরা যেমন খেয়ে পড়ে বাঁচি আরকি। আপনিও তেমন খেয়ে পড়ে বাঁচেন”।

প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমি দেখি, তবে আমার মত করে। অবশ্যই প্রতিষ্ঠান দরকার, আমাদের দেশের ফটোগ্রাফাররা আগেও ভাল ছবি তুলেছে এখনও ভাল ছবি তুলছেন তবে সেটাকে গোছানো দরকার, সেটাকে লালন করার জন্য, সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে। ভাল মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির জায়গাটা বা এই মাধ্যমটা আরো জোরদার হবে।

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন অ্যাণ্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত। এর পূর্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কমিউনিকেশন এবং পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে লেখা তার বেশ কয়েকটি নিবন্ধ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কর্মী আকরাম হোসেনের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফির যোগাযোগের প্রক্রিয়া নিয়ে তার এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ কামরুল হাসান।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: কমিউনিকেশন প্রসেসের ব্যাসিক কনসেপ্ট সম্পর্কে বলুন।

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: কমিউনিকেশন প্রসেসে একটা পক্ষ হচ্ছে প্রেরক, আরেকটা পক্ষ হচ্ছে প্রাপক। প্রেরক প্রাপকের সাথে যোগাযোগ করে। এর জন্য একটা মাধ্যমের দরকার হয়। যেমন, আমি একটি মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলছি আপনার সাথে। এটা একটা মাধ্যম। আর আমি যে কথাটা বলছি বা বক্তব্য দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বার্তা। আর এই বার্তাটি শুনে আপনি প্রাপক হিসেবে রিঅ্যাক্ট করেন। বার্তা প্রেরণ ও রিঅ্যাক্ট করার কাজটা নানা কারণে প্রভাবিত হয়। এই সবটা মিলিয়ে হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রসেস। কমিউনিকেশন প্রসেসের কমপোনেন্টগুলো হচ্ছে বার্তা প্রেরক, বার্তা প্রাপক, বার্তা, মাধ্যম, বিভিন্ন ধরনের প্রভাবক ও রিঅ্যাকশন বা ফিডব্যাক। আর এই কমিউনিকেশন প্রসেসটা যখন আমার ও আপনার মধ্যে হয় তখন সেটা হয়ে যায় ইন্টার পারসোনাল কমিউনিকেশন। যখন আমি একাধিক লোকের সাথে কথা বলি তখন সেটা হয়ে যায় গ্রুপ কমিউনিকেশন। তারচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের যখন কথা বলি মিডিয়াম বা চ্যানেল ব্যবহার করে, তখন সেটা হয়ে যায় ম্যাস কমিউনিকেশন। যেমন, আমি যখন টেলিভিশনে একটা বক্তব্য দেই বা রেডিওতে একটা বক্তব্য দেই বা নিউজপেপারে কিছু একটা লিখি, সেটা মাস কমিউনিকেশন। আমরা প্রতি মুহূর্তেই যোগাযোগ করছি। কখনো নিজের সাথে কখনো অন্যের সাথে। যেমন আপনি এসে আমার সাথে বসে থাকলেন, কোনো কথা বললেন না, এটা ও কিন্তু আমাকে মেসেজ দেয়। অন্যান্য দিনতো আপনি এসে আমার সাথে কথা বলেন, আজকে বলছেন না কেনো? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। আবার আপনি যে পোশাকটা পড়েছেন, সেটা দেখলে ও আমি একটা মেসেজ পাই, তাই না? মানুষ প্রতি মুহূর্তেই কমিউনিকেট করে। সচেতনভাবে হোক আর অসচেতনভাবেই হোক।

কামরুল হাসান: এক্ষেত্রে একজন ফটোগ্রাফারের ভূমিকা কতটুকু?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: ফটোগ্রাফার যে ছবি তোলে, তার নিশ্চয় কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে। যেমন অনেকে শখের বশে ছবি তোলেন। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যটা কী? সে একটা দৃশ্য দেখেছে এবং সেটা তাকে মুগ্ধ করেছে। সেই মুগ্ধতাটাকে সে রেকর্ড করে নিয়ে আসতে চায়। রেকর্ড করে এনে সে অন্যকে দেখাতে চায়।

কামরুল হাসান: অর্থাৎ তিনি তার মুগ্ধতাটাকে ছড়িয়ে দিতে চান?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: মুগ্ধতাটাকে ছড়িয়ে দেয়া এবং যে রিয়ালিটিকে সে দেখে এসেছে সেই রিয়ালিটিকে অন্যদের কাছে জানাতে চান। যেমন আমরা পিকনিকে গেলে ছবি তুলি। সব পিকনিকে সবাই যায় না। একটা পিকনিকে আমার অনেক বন্ধু যায় নি, আমার পরিবারের সদস্যরা যায় নি, কিন্তু আমি গিয়েছি। আমি গিয়ে ছবি তুলেছি। এই ইভেন্টে আমি ছিলাম, এই বিষয়টি রেকর্ড করে রাখলাম। সাথে ঐ জায়গার সৌন্দর্যটাকে ও রেকর্ড করে নিয়ে আসলাম সেখানে যারা যায়নি তাদের জন্য। এটা তো বললাম শখের ফটোগ্রাফারদের কথা। এখন প্রেসের জন্য যারা ছবি তোলেন তাদের কথায় আসি। যিনি প্রেস ফটোগ্রাফি করেন, তার উদ্দেশ্য

হচ্ছে খবর জানানো। আবার সব ছবি তিনি তোলেন না। নিউজ ভ্যালু যেটার আছে সেটা তিনি তোলেন। এখন নিউজ ভ্যালু আমরা কিভাবে ডিটারমিন করি? তিনি দেখেন বিষয়টির পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে কীনা, এটা কি পাবলিকের জন্য নতুন কিছু কীনা, এটা সমাজের একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করে কীনা, এটা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কীনা, এই জিনিসগুলো বিবেচনায় নিয়ে একজন ফটোগ্রাফার নিউজ ফটো তোলে। যেমন ধরুন, ক্যাম্পাসে মারামারি হয়েছে। এতে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ছবি, মারামারিতে একটা বা দুটো ছেলে আহত হয়েছে, এই ছবিগুলো একজন প্রেস ফটোগ্রাফার তুললেন। এই অ্যাকশন পিকচারগুলোর সাথে রিপোর্ট ছাপা হবে। রিপোর্ট বর্ণনায় লিখেছে আর ছবি ঘটনাটি দেখিয়ে দিচ্ছে। ছবিটিকে ঘটনার রিয়েল রিপ্রেজেন্টেশন বলা যায়। ছবির মাধ্যমে দেখা যায় অ্যাকশনটা কীভাবে হয়েছে, কারা কারা ইনভলভ ছিলো ছবি দেখে চিহ্নিত করা যায়। একটি ছবি বার্তাকে আরো জীবন্ত করে তোলে।

কামরুল হাসান: আপনি বলেছিলেন একটা ছবি হাজার শব্দের ভাবকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে। এ বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতেন—

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: একটা ছবি হাজার শব্দের ভাবকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে। এটা তো একটা পুরনো প্রবাদ। এক হাজার শব্দে তুমি যেটা বলতে পারো, ছোট একটা ছবি সেটা বলে দেয়। একটা ছোট ছবি কতটুকুই আর জায়গা নেয়? এক হাজার শব্দের একটা রিপোর্ট লিখতে গেলে তিন-চার পেইজের মতো চলে যায় আর দুই ইঞ্চি বাই তিন কলামের একটা ছবি অনেক তথ্য দেয়। ছবিতে কতগুলো ক্যারেকটার ফুটে ওঠে, অ্যাকশনটা দেখা যায়। একটা ছোট ছবি অনেক কম জায়গায় যা ফুটিয়ে তোলে, যেটা বর্ণনা করতে গেলে অনেক বড় জায়গার দরকার হয়।

কামরুল হাসান: রোলা বার্থের সেমিওটিক থিওরি অবলম্বন করে অনেক পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট তাত্ত্বিক নিউজ ফটোগ্রাফকে মেসেজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টা বিস্তারিত শুনতে চাই।

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: ধরা যাক, আপনি আমার অফিসে আমার একটি ছবি তুলছেন। ছবির ভিতরে তো সিগনিফাইয়ার আছে। সিগনিফাইয়ারগুলো হচ্ছে আমার টেবিলে একটা বই হাফ খোলা, আমি একটা কাগজ ধরে পড়ছি। তারপরে আমার পাশে একটা বুকশেলফ, বুকশেলফে কিছু বই আছে। বুকশেলফটা হাফ খালি, আমার টেবিলটা একটু অগোছালো, এখানে একটা ফুলদানি আছে, এই সমস্ত সিগনিফাইয়ারগুলো মিলে আপনাকে একটা মেসেজ দিচ্ছে এই ছবিটা। এটা বলছে, প্রফেসররা একটু অগোছালো হয়, তাদের বইগুলো গোছানো থাকে না। রুমটা মনে হয় নতুন। প্রফেসররা মনে হয় সবসময় পাঞ্জাবি পড়ে থাকেন যেহেতু আমি ছবিতে পাঞ্জাবি পড়ে আছি। বুকশেলফটা হাফ খালি। নতুন বই কিনতে হবে। এ রকম সবকিছু মিলিয়ে প্রফেসরের ইমেজ ফুটে উঠে, সেই ইমেজটা সিগনিফাইড। সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো সিগনিফাইয়ার হিসেবে কাজ করে। আবার সিগনিফাইয়ারগুলোর প্রত্যেকেটিরই ইন্ডিজিয়াল মিনিং আছে। আবার সবগুলো মিলে একটা মিনিং তৈরি করেছে। সেই মিনিংটা একটা প্রফেসরের ইমেজ। এই যে বুকশেলফ, টেবিল, এই যে বই, এই যে পেনহোল্ডার সবকিছু মিলে ইমেজটা তৈরি করেছে। আবার এই প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা আলাদা মিনিং আছে। আবার এগুলোকে যদি এই সেটিং থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তবে মিনিংও বদলে যাবে। রোলা বার্থ বলেন, সিগনিফাইয়ার ও সিগনিফাইড দুই ধরনের মিনিং দেয়। একটা হচ্ছে ডিনোটেশন মিনিং আরেকটা হচ্ছে কনোটেশন মিনিং। রোলা বার্থ ছবির অর্থ তৈরিতে ফটোগ্রাফারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। ফটোগ্রাফার তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ছবিটা তুলেছে, সে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চায়। এই ক্ষেত্রে সে তার ক্যামেরার এঙ্গেল ঠিক করেছে, ফোকাস ঠিক করেছে, ঠিক করেছে কোথায় ফোকাস করবে, কোন জিনিসটা হাইলাইট করবে কোনটাকে করবে না সেটি। সবকিছু মিলিয়ে ফটোগ্রাফারও আমার একটা ইমেজ

সাক্ষাৎকার

দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। একজন অডিয়েন্স যখন দেখেন, তিনি ফটোগ্রাফারের দৃষ্টি দিয়ে দেখেন না। তিনি তার মত করে দেখেন, ব্যাখ্যা করেন। ছবির ক্যাপশন, ছবির মধ্যে বার্তার সিগনিফায়ার, ফটোগ্রাফারের পজিশন, তার ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, মুভমেন্ট, ফোকাস, লাইট সবকিছু মিলিয়ে ফল হচ্ছে সিগনিফাইড ইমেজ। একটা ছবিকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কামরুল হাসান: ভিডিও, পেইন্টিং বা অন্যান্য ভিজুয়াল মিডিয়াগুলোর চেয়ে একটি ছবি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? মানে, একটা ছবি অন্যান্য মাধ্যমগুলোর থেকে কতটা কার্যকরভাবে দর্শকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: অন্য ভিজুয়াল মিডিয়া থেকে একটা ছবির গুরুত্ব কেমন সে প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায়, প্রত্যেকটা মিডিয়াই নিজের মত করে গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও হচ্ছে মুভিং পিকচার। এর মধ্যে থাকে অডিও এবং ভিডিও। অডিও এবং ভিডিও মিলিয়ে এটার আবেদন অন্যরকম। এটার ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশি। আবার পেইন্টিং অনেক বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট। একজন ব্যক্তি ছবি একে কিছু দেখাতে চান। ফটোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের চাইতে একটু উন্নত। কারণ এখানে মেকানিক্যাল ডিভাইসের ব্যবহারটা বেশি হয়। ছবিতে রিয়েলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে মেকানিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে। পেইন্টিং এর সাথে আর্টিস্টের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। পেইন্টিংয়ের তুলনায় ছবির সাথে ফটোগ্রাফারের সম্পর্ক একটু কম নিবিড়। সম্পর্কটা মেকানিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে। ভিডিও ক্যামেরা আরো উন্নততর মেকানিক্যাল ডিভাইস যেটা দিয়ে অডিও ভিডিও একসাথে দেখানো যায়। কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন দেখানো যায়। স্টিল ফটোগ্রাফিতে সেটা সম্ভব না। এতে একটি অ্যাকশনকে স্থিরচিত্র দিয়ে বুঝাতে হয়। পেইন্টিং, ফটোগ্রাফ ও ভিডিও প্রত্যেকটি মাধ্যমই নিজের মতো করে গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের কার্যকারিতার দিক থেকে ভিডিও হচ্ছে সবচেয়ে উপরে, পেইন্টিং সবচেয়ে নিচে আর ফটোগ্রাফি হচ্ছে মাঝামাঝি পর্যায়ে।

কামরুল হাসান: দর্শকদের সাথে কোনটা কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: দর্শকদের দিক থেকে দেখলে পেইন্টিং অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট। দর্শকদের বোঝার জন্য কঠিন। পেইন্টিংটা ইন্টেলেকচুয়াল দর্শকের জন্য। মানে যিনি ইন্টেলেকচুয়ালি অনেক বেশি অ্যাডভান্স, তার জন্য। দর্শকদের জন্য ফটোগ্রাফিটা বোঝা আরো একটু সহজ। ক্যাপশনের কারণে অনেকেই বুঝতে পারেন। তাছাড়া ছবি রিয়েলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে। তাই এটা বোঝাও সহজ। পেইন্টিংয়ে অনেক সময় মানুষের অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনা ফুটে উঠে, যেটা অজানা। কিন্তু ছবিতো তা নয়। ভিডিও বোঝা আরো সহজ। কারণ সেখানে সাউন্ড থাকে, ইমেজ থাকে। তিনটার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ছবির অবস্থান মাঝামাঝি।

কামরুল হাসান: একটি ছবি কি একজন আলোকচিত্রীর ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপারটির মধ্যে পড়ে কি? ২০০৭ সালে অক্টোবর ভ্যাঙ্কুভারে একটি সেমিনারে **Public good, Intellectual Property rights, the state** সম্পর্কে আপনি একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছিলেন। সেখানে আপনি কি বলেছিলেন?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: একটি ছবি একজন আলোকচিত্রীর ক্রিয়েটিভ আর্ট। ছবির জন্য সারা বিশ্বে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপারটি কেইম করে ফটোগ্রাফাররা। এখানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপারটি রাইটের ধারণাটা একটু বিতর্কিত হবে। যেমন কেউ কেউ বলছেন, আপনি যে নেচারের ছবি তুলছেন এইটা কি আপনার সৃষ্টি?

কামরুল হাসান: কিন্তু সেই ভিউটা তো আলোকচিত্রীর সৃষ্টি?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: প্রত্যেক আলোকচিত্রী তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছবি তোলেন। একটি ভিউ সৃষ্টি করেন। এই ভিউটার

জন্য তিনি অথরিয়াল রাইট কেইম করতে পারেন। তিনি অথর কারণ ভিউটা তারই সৃষ্টি। এই অথার হওয়ার কারণে তিনি কপিরাইট দাবি করতে পারেন। আমি ঐ কনফারেন্সে বলেছিলাম, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, বিশাল ব্যবসা। এখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো প্রোডাক্ট থেকে যত না আয় করে, তার চেয়ে বেশি রাইট থেকে আয় করে। কপিরাইট যদি জোরালোভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানা হয়, তবে জ্ঞানের প্রসার ব্যাহত হবে। তবে অথরিয়াল রাইট স্বীকার করা উচিত। বাংলাদেশে কপিরাইট আইন আছে। বাংলাদেশের কপিরাইট আইন ফটোগ্রাফিতে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট দেয়। আমাদের মধ্যে প্রবণতা আছে অন্যের ছবি চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া। এই চৌর্যবৃত্তি দূর করার জন্য ছবি তুলে ছবিটাকে নথিবদ্ধ করতে হবে। এটা সারা দুনিয়াতে ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টরা করে। নথিবদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় আছে। নথিবদ্ধ করতে হলে কপিরাইট অফিসে গিয়ে তা করতে পারে। আর ক্রিয়েটিভ আর্টের ক্ষেত্রে অফিসে যাওয়ারও দরকার হয় না, পাবলিকলি ডিসপ্লে করলেই নথিবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন নতুন কিছু যখন উদ্ভাবিত হয়, প্যাটেন্ট অফিসে গিয়ে প্যাটেন্ট করতে হয়। আর ক্রিয়েটিভ আর্টের ক্ষেত্রে পাবলিকলি কপিরাইট চিহ্নটি ডিসপ্লে করলেই হয়। প্রেজারিসম সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বাড়তে হবে। প্রেজারিজম ক্রিয়েটিভ আর্টের ক্ষেত্রে একটি বড় হুমকি। কারো মধ্যে চৌর্যবৃত্তি থাকলে তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি জাগবে না। ভালো ছবি তুলতে পারবে না, ভালো ফটোগ্রাফার হতে পারবে না। সে হবে চোর। এটার ব্যাপারে জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়তে হবে।

কামরুল হাসান: প্রেস ফটোগ্রাফিতে আমরা জানি, ক্যাপশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা ছবি, ছবির প্রেক্ষণবিন্দু কিংবা ছবির পেছনের রাজনীতিটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: যিনি ছবি তোলেন, তার তো একটা আইডিওলজিক্যাল ওরিয়েন্টেশন আছে। তিনি স্কুলে, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। নিউজ ফটোগ্রাফিতে কি হয়, যেটার নিউজ ভ্যালু থাকে, তা-ই তোলা হয়। ছবি সিলেকশনের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতি দুটোই কাজ করে। ফটোগ্রাফারের পার্সপেক্টিভটা গড়ে ওঠে তার শিক্ষা জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা এবং যেখানে তিনি কাজ করেন সেখানকার পলিসি এই দুটো মিলে। একজন ফটোগ্রাফারের তোলা সব ছবিতো ছাপা হয় না। সেখানেও সিলেকশনের ক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থনীতি থাকে। কোন ছবিটা ছাপালে ফল কি হবে সেটা বিবেচনায় থাকে।

কামরুল হাসান: ইন্টারনেটের কল্যাণে ব্লগ কিংবা ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক নবীন আলোকচিত্রী আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই বিষয়টি যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রের ব্যাপকতাকে বহুদূর বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া: ব্লগ কিংবা ফেসবুক আসার ফলে মানুষের এক্সপ্রেশনের জায়গাটা বেড়েছে। এর মাধ্যমে সব মানুষের এক্সপ্রেশনের জায়গাটা কি বেড়েছে? না, গুটিকয়েক লোকের যাদের ইন্টারনেট আছে এবং ছবি তুলে তাদের বেড়েছে। এখন ছবির রিপ্ৰোডাকশন কস্ট কমে গেছে। এখন প্রিন্ট করে মানুষকে দেখাতে হচ্ছে না, আপলোড করে দিলেই হয়। যারা নেটওয়ার্কে আছে তারা দেখতে পায়। আগের চেয়ে কম খরচে অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে। ছবি মানুষ আগেও তুলত, তখন প্রদর্শনের সুযোগটা কম ছিলো। এখন সুযোগ বেড়েছে। মানুষের মাঝে ছবি তোলার প্রবণতাও বেড়েছে। এখন ছবির প্রদর্শনীটা গুরুত্বপূর্ণ। ফেসবুকের মাধ্যমে একে অন্যের সম্পর্কে অনেক বেশি জানছে। আমার অনেক ব্যক্তিগত বিষয় মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছি। আগে জানাতাম লিমিটেড স্কেলে, এখন একটু বড় স্কেলে জানাচ্ছি। কেউ এটা সচেতনভাবেও করতে পারে আবার কেউ অসচেতনভাবেও করতে পারে। কিন্তু এর নানা নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন, ফেসবুক থেকে তো ছবি চুরি হয়ে যেতে পারে। ছবি দিয়ে অনেক আপত্তিকর জিনিস করা হয়। এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য সবার মধ্যে সচেতনতাটা অনেক জরুরি।

সাইফুল হক অমি

সাইফুল হক অমি বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফি স্কুল পাঠশালার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। পলিটিক্যাল ভায়োলেঞ্চ এবং শিপব্রেকিং ইয়ার্ডের ওপর করা তার ডকুমেন্টারি স্টোরিগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে পত্রিকা এবং জার্নালগুলোতে তার ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির নানান দিক নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কর্মী মোহাম্মদ কামরুল হাসান বাবু এবং মহসীন কবীর।

মহসীন কবীর: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বলতে কি বুঝায়?

সাইফুল হক অমি: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির মূল বিষয়টি হচ্ছে ডকুমেন্টিং দ্য লাইফ। ফটোজার্নালিজমও এক ধরনের ডকুমেন্টারি। ফটোগ্রাফির নানা রকম পার্থক্য আছে। আসলে জিনিস দুইটা একটাই, ছবি তোলা। ডকুমেন্টারি করতে সময় লাগে। আমরা সাদা চোখে যা দেখি, তার চেয়ে ভিতরে যে জিনিসটা আছে সেটাকে উপস্থাপন করাই ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের কাজ। একজন ফটোজার্নালিস্ট মূলত যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে নিউজ অরিয়েন্টেডেড কাজ করে। কিন্তু একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে নিউজ না, সাধারণ জীবন-যাপন, সাধারণ বিষয় বা ডেইলি লাইফ নিয়ে কাজ করে। একজন ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফারের জন্য প্রকৃতি, তার সৌন্দর্য খুব বড় জিনিস। আবার যারা ফ্যাশন ফটোগ্রাফি করে, তারা মডেলের শারীরিক সৌন্দর্য, প্রোডাক্টের শারীরিক সৌন্দর্য এসব নিয়ে তাড়িত থাকে। একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যা আপাত অর্থে সাধারণ, যা সাদা চোখে দেখা যায় না, যা সাধারণ ভাবে বিষয় হয়ে উঠে না, যা চোখ থেকে আড়ালে পড়ে যায়, সাধারণভাবে ফটোগ্রাফির যেসব নর্ম, বিউটিফিকেশন, টাইমিং এই সবকিছুর চেয়ে অনেক গভীরে যায় যে ছবি, একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার মূলত সেইসব বিষয় নিয়ে কাজ করেন।

মহসীন কবীর: একটি স্টোরিতে কতগুলো ছবি এন্ট্রি করা যেতে পারে?

সাইফুল হক অমি: সেটার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই। কতগুলো ছবি হলে ডকুমেন্টারি হবে এটার কোন হুকবাধা নিয়ম নাই। এটা একটা স্টাইলের ব্যাপার। এটা একটা কাজের ধরনের ব্যাপার। একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার তার নিজের মতো করে ছবির সংখ্যা নিরূপণ করবেন।

মহসীন কবীর: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির কি কোনো ক্লাসিফিকেশন আছে?

সাইফুল হক অমি: এক নম্বর হচ্ছে, আমি ফটোগ্রাফির কোনো ক্লাসিফিকেশনে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে মোটেও মনে হয় না য, স্যালুন ফটোগ্রাফি, ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি, ফটোজার্নালিজম এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে। কিন্তু বিষয় হিসেবে প্রত্যেকটি আলাদা। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির ক্লাসিফিকেশন আমি খুব একটা ভালো জানি না। আমার কাছে ছবি মানেই ছবির সৌন্দর্য না। আবার যা সুন্দর না সেটা যে ছবি হয়ে উঠতে পারে এ নিয়েও আমার কাছে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সেটা অনেক কমপ্লিকেটেড। সো, আমি আলাদা করে এইটা ডকুমেন্টারি এইটা ডকুমেন্টারি না এভাবে বলতে পারবো না। সাধারণ ভাবে বলতে পারি, ফ্যাশন ফটোগ্রাফি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজের কাজ। তার প্রোডাকশন প্রসেস ভিন্ন, ক্রায়েন্ট ভিন্ন, অডিয়েন্স ভিন্ন। তার ছবি তোলার কারণটাও ভিন্ন। একজন ফটোজার্নালিস্ট আসলে যে কারণে ছবি তোলে, তার কারণ হচ্ছে একটা। ধর, স্যালুন ফটোগ্রাফাররা একটা ছবির

মাধ্যমে গল্পটা বলার চেষ্টা করে। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার গল্পটা বলার চেষ্টা করে; কথার কথা ২৫টা ছবি দিয়ে, পার্থক্য এতটুকুই। আমার কাছে এর বাইরে কোন পার্থক্য নেই। কমার্শিয়াল ওয়ার্ক ছাড়া প্রত্যেকটা ধরনের কাজ হচ্ছে গল্প বলা।

মহসীন কবীর: কমার্শিয়াল ওয়ার্ক আর ডকুমেন্টারির মধ্যে পার্থক্য কি?

সাইফুল হক অমি: কমার্শিয়াল বলতে আমি মিন করছি ফ্যাশন, প্রোডাক্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফিরও কি কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে?

সাইফুল হক অমি: ভীষণ ভাবে আছে। কমার্শিয়াল ভ্যালু তো কবিতারও আছে। কবিতাও তো বিক্রি হয়। তা বলে তো গুটী কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট হয় না। কমার্শিয়াল প্রোডাক্টের মানেটা হচ্ছে, প্রোডাকশন প্রসেসটা তৈরি হচ্ছে কমার্সকে মাথায় রেখে। আমি এই জিনিসটা বিক্রি করব, এই উদ্দেশ্যটা মাথায় রেখে যখন কোন কিছু তৈরি হয়, তখন সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট। তার মানেটা হচ্ছে, একটা জিনিস কমার্শিয়াল হয় তখনই, যখন এটার এসথেটিকস নিয়ন্ত্রিত হয় বাজারের দ্বারা। বাজার যেটাকে ভালো ছবি বলছে, সেরকম ছবি তোলা। আমাদের এখানে যে ট্র্যাডিশনটা আছে সেটা আমার কাছে খুব দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়। কারণ আমাদের স্যালুন ফটোগ্রাফাররা দুইশ বছর আগে যে ছবি তোলা হত, এখনও সেই ছবি তোলে। এটা তাদের কাছে একটা কমফোর্ট জোন বলে মনে হয়। কারণ এইটার মধ্যে তারা পুরস্কার পায়। এইরকম ছবি তুললে আমি ও পুরস্কার পাব, এমন ধারণা সবার। কারণ এর মধ্যেও প্রথাকে মেনে নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। এইটাই হলো ক্রাইসিসের প্রধান দিক। যেটা খুব আনফরচুনেট। এই কারণে এটাও এক ধরনের কমার্শিয়ালাইজেশন।

মহসীন কবীর: তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, নন্দনতত্ত্বের ভালো একটা প্রভাব কাজ করছে এখানে।

সাইফুল হক অমি: নিশ্চয়ই। তাতো বটেই।

মহসীন কবীর: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারদের কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখতে হবে?

সাইফুল হক অমি: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রধান যে ব্যাপার আমি প্রথমেই বলেছি, জীবনটাকে বুঝতে হবে। যে লোকটা জীবন বোঝে না, সে লোকটা ভালো ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার হয় না। আবার জীবন মানে শুধু রাজনীতি বোঝা না। জীবন মানে সমাজ বোঝা, ধর্ম বোঝা, সম্পর্ক বোঝা, মানুষ বোঝা। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যার উইক সে ভালো ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার হতে পারে না।

মহসীন কবীর: ছবিতে তথ্য দেয়া বা নেয়ার বিষয়টা কতটুকু প্রাধান্য পায়?

সাইফুল হক অমি: একটা তথ্য তো থাকবেই। আমি এখন যে কথা বলছি তার মধ্যেও মেসেজ আছে। কিন্তু তথ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে যদি কোনো কিছু তৈরি হয় সেটা এক ধরনের প্রোপাগান্ডায় পরিণত হয়। আমার মনে হয় না সেইটা খুব একটা ভালো দিক। কেউ যদি মনে করে আমাকে এই এই ইনফরমেশন দিতে হবে, তাহলে দেখা যায়, সেটা এক ধরনের ডকুমেন্টেশন করছে। যে ডকুমেন্টেশনটা আসলে অ্যামেচার এবং অনেক বেশি ইনফরমেশন নির্ভর, এসথেটিকস নির্ভর না। তাতে যেটা হয়, ছবিগুলো আর দাঁড়ায় না। ছবিগুলো শিল্প হয়ে উঠে না, মানে কালোত্তীর্ণ হয় না। সে অর্থে দেখা যায় যে, ছবিগুলো মানুষের মধ্যে নাড়া দেয় না। যেমন আদিবাসীদের ছবি তোলার জন্য কিছু লোক যায়। আদিবাসীরা কি খায় তার একটা ছবি তোলে, আদিবাসীরা কি রকম

পোশাক পরে তার একটা ছবি তোলে, আদিবাসীরা কিভাবে ঘুমায় তার একটা ছবি তোলে। তার মানে হচ্ছে, তার মাথায় ইনফরমেশন আছে, সৌন্দর্য নাই, এসথেটিকস্ নাই। তখন যেটা হয় ছবিগুলো এনজিওদেরও কাজে লাগেনা, আর্ট এর কাজে লাগা তো দূরের কথা।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: বাংলাদেশের ডকুমেন্টারির যে ধারাটা দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নেগেটিভ ডকুমেন্টেশন অনেক বেশি হয়।

সাইফুল হক অমি: দুটোই ঠিক, আসলে নেগেটিভ ডকুমেন্টেশনটা বেশি হয়, কারণ নেগেটিভ ডকুমেন্টেশনটা বিক্রি হয় বেশি। বাজারের বিক্রির দামের একটা ব্যাপার আছে। তবে, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের একটা জায়গা আছে, মানুষকে যিনি মানুষ মনে করেন। যেমন একজনের নাম বলি, কিরণ ভাই। কিরণ ভাইকে আমি ভীষণভাবে সম্মান করি। কিরণ ভাই অপার মমতা নিয়ে এসিড সারভাইভারদের ছবি তুলেছেন। মানুষ হিসেবে তাকে চিনি বলেই দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলেছি, উনি সত্যি উনার কাজটাকে মিন করেন। এখন তুমি কিভাবে দেখবা? তুমি দেখবা কিভাবে উনি একটা নেগেটিভ স্টোরি বললো? নাকি তুমি বলবা যে, এই ঘটনা তো বাস্তব, এটা তো ঘটছে। এটা প্রতিরোধ করার জন্য ছবি তুলবো। তুমি উটপাখির মতো ঘাড় গুঁজে থাকতে পারো, তাতে ঝড় বন্ধ হবে না। এসিড যে মারা হয়, এটা সত্য। এটা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যে গরীব এটা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু, কারো না কারো মনে হয় নিশ্চয়ই যে, এটা অন্যায় এবং এই অন্যায়ের ব্যাপারে কিছু বলা উচিত। সেই কথাটা যখন পলিটিশিয়ানরা বলে, আমরা তখন কিন্তু আমরা বলিনা যে, লোকগুলো নেগেটিভ কথা বলছে। ফটোগ্রাফাররা বললেই বুঝি এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে? আমি দুয়েক জন মানুষকে চিনি, ফটোগ্রাফার হিসেবে যারা পরিচিত। যারা বিশেষ ধরনের ছবি ছাড়া তুলেন না। কারণ ওটা বিক্রি হয় বেশি।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: মানে ও গুলোও ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি হিসেবে বিক্রি হয়?

সাইফুল হক অমি: নিশ্চয়ই। বাজারে সবার ছবি কমবেশি বিক্রি হয়। যেটা বেশি প্রাপ্তি, সেটা হচ্ছে ছবির পুরস্কার প্রাপ্তিটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বাংলাদেশের এক বিশেষ ধরনের স্টিরিওটিপিক্যাল ইমেজ তো পশ্চিমের মাথায় আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঐ স্টিরিওটিপিক্যাল ইমেজটাকে ওদের মধ্যে ফিট করতে পারবা, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে একসেপ্ট করবে ওরা। যখন দেখবে নতুন কিছু আসতেছে, তখন আর ভালো লাগবে না ওদের। কারণ তারা বাংলাদেশকে একভাবে দেখে অভ্যস্ত, এর বাইরে গিয়ে তারা দেখতে চায় না।

মহসীন কবীর: পশ্চিমা বিশ্বের এজেন্সিগুলো বাংলাদেশের কোন ধরনের ডকুমেন্টারি প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে?

সাইফুল হক অমি: সেটা আমি আলাদা করে কিছু বলতে পারবো না। পশ্চিমা বিশ্বের এজেন্সি তো আমার না। তারা কিভাবে জাজ করে কি করে জানি না। কিছুটা নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু ওদের জাজিং প্রসেস ওদের কাছে থাকা উচিত। আমি ভালো বলতে পারবো না। কারণ, এটা অন্যায় হবে। পশ্চিমা বিশ্ব তো অনেক বড়। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক মহান শিল্পী আছেন, অনেক মানবিক আলোকচিত্রী আছেন, পলিটিক্যালি অনেক অসাধারণ কাজ আছে। সো, ধারাটা আমার কাছে অত সরল না। তবে সাধারণভাবে দেখি যে, বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ ছবি অ্যাওয়ার্ডেড হয়। বিশেষ বিশেষ ছবি কখনোই অ্যাওয়ার্ডেড হয় না। বিশেষ বিশেষ ছবি সবসময়ই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়। বিশেষ বিশেষ স্টোরি কখনোই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় না। সেই আলোচনাটা অনেক বড়। মানে বিষয়টা এরকম না যে, তুমি যদি কালকে একটা ছবি তোলা, ডাস্টবিনে একটা বাচ্চা ছেলে খাবার তুলে খাচ্ছে, তুমি পুরস্কার পেয়ে

যাবা। সেটা বিশেষ কাউকে তুলতে হবে। কারণ ছবি তোলাটা শিখতে হয়।

মহসীন কবীর: রোহিঙ্গাদের ওপরে যে ডকুমেন্টারি করেছেন তার গল্প কিছুটা শুনেছি। অভিজ্ঞতাগুলো ভাবিয়ে তোলে। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করতে গেলে কোন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়?

সাইফুল হক অমি: প্রথম কথা হচ্ছে কি, যেকোন পেশারই প্রফেশনাল হাজার্ড থাকে। ধর যে লোকটা আর্কিটেক্ট, তাকে রাত জেগে কাজ করতে হয়। যে লোকটা ডাক্তার, তাকে পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে গিয়ে ডাক্তারি করতে হয়। যে লোকটা শিক্ষক, তাকে দিনে ছয় ঘণ্টা বলতে হয়। ফটোগ্রাফি একটা প্রফেশন, এর তো কিছু প্রফেশনাল হাজার্ড থাকবেই। সেইটাকে খুব বড় কিছু বলে আমার মনে হয় না। এটাকে বিরাট করে দেখানো আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়। এই যে দেখো তোমার পিছনে একটা ছবি আছে শিপব্রেকিংয়ের। এই লোকগুলো প্রতিদিন যে পরিমাণ রিস্ক নেয়, তার এক হাজার ভাগের এক ভাগও একটা ফটোগ্রাফার নেয় না। আসলে আমরা এমন কিছু রিস্ক নেই না, যেটা আর দশজন নেয় না। যে লোকটা গতকাল আফগানিস্তানে মারা গেছে, সে লোকটা আমার চেয়ে বেশি রিস্ক নিয়েছে। যে লোকটা আফগানিস্তানে মারা যাওয়া মানুষটার ছবি তুলেছে, সেও আমার চেয়ে অনেক বেশি রিস্ক নিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে, ফটোগ্রাফারদের এক ধরনের জাত্যাভিমান রয়েছে। তারা ভাবতে চায় যে, আমরা অনেক দেশোদ্ধার করেছি, অনেক বড় বড় কাজ করেছি। এই কথাটা ঠিক না। অনেক পেশার অসংখ্য মানুষ আছেন জগতে, যারা রিস্ক নিয়ে কাজ করেন। হিরোশিমা বা জাপানে সুনামির সময় যে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টটা নষ্ট হয়ে গেলো, সেখানকার মানুষ কিন্তু ভয়ানক রিস্ক নিয়ে কাজ করেছে। রিস্কটাকে বড় করে দেখা আমার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ, এর মধ্যে একটা আত্মশ্রদ্ধার ব্যাপার আছে। দুই নাম্বার হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারদের হাজার্ডগুলোও জীবনের আর দশটা সিরিয়াস কাজের মতই। জীবনে ভালো করে পড়াশুনা করতে গেলে যেমন অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করা লাগে। ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া যায় না। বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া যায় না। প্রেম করা যায় না। তেমনি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি করতে গেলেও অনেকগুলি জিনিস করতে হয়। প্রথমে যেটা করতে হয়, মানুষের সাথে মিশতে হয়। মানুষের সাথে সম্মানের সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, যাদের ছবি তুলবো তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। যাদের ছবি তুলতে যাব, তাদের বিশ্বাস অর্জনের কাজটা সবসময়ই কঠিন। কারণ, সেই মানুষগুলো কেন তোমাকে ছবি তুলতে দিবে? সবার আগে তাদের কাছে প্রসঙ্গটা পরিষ্কার করতে হবে। একটা মানুষের সাথে ডায়ালগে যেতে হবে। সেইটাও এক ধরনের স্কিল যেটা ডেভেলপ করতে হয়। আমি যে মানুষটার সাথে কথা বলবো, সে মানুষটার সাথে আমি কতটা সৎভাবে কথা বলবো, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হয়। বিশ্বের বহু জায়গায় বহু পজিটিভ স্টোরি হয়। হ্যাপিনেসের ফটোগ্রাফি হয়, ডেইলি লাইফের অসম্ভব সুন্দর সুন্দর ছবি হয়। সেখানে তথাকথিত সামাজিক সমস্যার ছবিও কম হয়। কারণ এটা খুব বাস্তব, আমাদের এখানে সামাজিক সমস্যা বেশি। সো, আমাদের ডকুমেন্টারির বিষয় যে সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক। যে মানুষগুলো ক্যামেরার ওইপাশে থাকে, তাদের সিচুয়েশনটা অনেক ডেসপারেট থাকে। সেই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে আমরা অনেক সময় মিথ্যা কথা বলি, বেশি আশা দেখাই। তো এই সততার প্রশ্নটা অনেক বড়। আমি মানুষগুলোর সাথে কী করে ছবি তুলতেছি, কেন ছবি তুলবো এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হয় যে 'ধৈর্য'। ভীষণভাবে ধৈর্যশীল হতে হবে। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করে দেখ, যারা খুব ভালো ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার, তারা কি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস একটা সুন্দর আলোর জন্য অপেক্ষা করে। একটা পারফেক্ট মোমেন্টের জন্য অপেক্ষা করে। তাকে যেমন ধৈর্যশীল হতে হয়, একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারকেও তেমনি একটা মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই মুহূর্তটার জন্য যে ধৈর্য রাখা দরকার, সেটা আসলে এক ধরনের সাধনা। এই সাধনাটা তাকে

করতে হয়। এটা এক ধরনের মেডিটেশন বলে আমার কাছে মনে হয়। পৃথিবীর সব বড় বড় ফটোগ্রাফারদের জন্য কথাটা সত্য। মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে ক্যারিটি থাকতে হবে। যেমন, আমি তোমার সাথে কথা বলছি, এখন যদি এক মানুষ হই, ঘরের দেয়ালের ওই পাশে গিয়ে আরেক মানুষ হই, তারপরের দেয়ালের ওপারে গিয়ে আরেক মানুষ হই, তাহলে আমি কে? আমার বর্তমান ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে আমি বলব যে রোহিঙ্গাদের কাজটা করতে আমার চার বছর লেগেছে। আরো এক বছর লাগবে। পাঁচ বছর ধরে একটা গ্রুপ অব পিপলের সাথে যখন মিশবা, তখন নিজেকে কিন্তু লুকাতে পারবা না। ভেতরে যদি মানবিকতা না থাকে, তোমার ভেতর যদি ধাক্কা থাকে, নষ্টামি থাকে, তাহলে কি হবে? তুমি ১৫-২০ দিনের বেশি সেখানে থাকতে পারবে না। মানুষের সাথে পাঁচ বছর তো আর অভিনয় করে থাকা যায় না। তুমি উইথড্র হয়ে যাবে। এবং এ কারণেই কিছু ফটোগ্রাফার কখনোই ফটোজার্নালিজমের বাইরে গিয়ে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার হতে পারে না। কারণ, ওদের মধ্যে যে মানুষটা আছে সেই মানুষটা প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়। তখন আর মানুষ নিজেদের জগতে তাদেরকে ঢুকতে দেয় না। সে হয়তো একমাস কোথাও থাকে, তারপর আর থাকতে পারে না। আমার শিক্ষক শহিদুল আলমের একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে। উনি সবসময় বলেন যে, “ভালো ফটোগ্রাফার হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হওয়াটা খুব জরুরি।” আমি জগৎ সংসারের অনেক ফটোগ্রাফারের সাথে কাজ করি। আমার কোন সময় এই রকম কোনো ফটোগ্রাফারের সাথে দেখা হয়নি, মানুষ হিসেবে যে খুব খারাপ, ফটোগ্রাফার হিসেবে যে খুব ভালো। যদি হ্যাজার্ডের কথা বলি তাহলে একটা পুলিশ যে পরিমাণ ঝুঁকি নেয়, একটা ফটোগ্রাফারও সেই পরিমাণই নেয়। হয়তো তারচেয়ে একটু বেশিই নেয়। আমাদের আর্মি যে পরিমাণ ঝুঁকি নেয়, একজন ফটোগ্রাফার তার চেয়ে ১০০ ভাগের এক ভাগের কম নেয়। তাই, আমি এই অংশ নিয়ে কখনোই কথা বলতে তেমন আগ্রহী নই। কারণ, আমি আমার নিজের জীবনে বহুবার ফটোগ্রাফির জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। একটু আগেও গল্প করছিলাম, আমার প্রথম প্রজেক্টের জন্য আমাকে বহুবার বোমা মারার চেষ্টা হয়েছে। বাংলা ভাইয়ের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমাকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, আমাকে আর্মি তুলে নিয়ে গেছে। এর কোনটাই আমার কাছে খুব বড় গল্প মনে হয় না। যেই শ্রমিকটা গতকাল মারা গেছে শিপব্রেকিংয়ে, সে আমার চেয়ে অনেক বেশি রিস্ক নিয়েছিল। আমি আর কী রিস্ক নিয়েছি?

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: বাংলাদেশে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির শুরুর দিকের ইতিহাসটা একটু বলেন।

সাইফুল হক অমি: ইতিহাসের অর্থে আমি খুব ভালো বলতে পারবো না। তবে ত্রিটিক্যালি দেখলে আমার মতে বাংলাদেশের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, চন্দন ভাইয়ের কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনকে নিয়ে করা কাজটা। এইটাকে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট বলে মনে হয়। কারণ উনি যখন এই কাজটা করছেন বাংলাদেশের অন্যান্য ফটোগ্রাফাররা যাদের মধ্যে অনেক বড় বড় ফটোগ্রাফারও ছিলেন তখনো চিন্তা করছেন গুড লুকিং ফটোগ্রাফিস্, বিউটিফুল ফটোগ্রাফিস্। আর চন্দন ভাই সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের সাধারণ মানুষের ছবি তোলার চেষ্টা করছেন। তো সেইটাই আমার কাছে মনে হয় প্রথম শুরু। আমার মনে হয় চন্দন ভাইয়ের আগেও অনেক বড় ফটোগ্রাফার ছিলেন। যেমন বেগ স্যার, বিজনদারা ছিলেন অনেক বড় মানুষ, অনেক বড় ফটোগ্রাফার। কিন্তু বেগ স্যারদের কাজটাকে ঠিক ডকুমেন্টারি বলা যাবে না। উনারা ব্যাসিক্যালি সিঙ্গেল ইমেজের ফটোগ্রাফার। লং টার্ম প্রজেক্টের ডকুমেন্টারি চন্দন ভাইয়ের হাত ধরেই আসলে বাংলাদেশে শুরু। বিজন সরকার যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করতেন, তাকে পৃথিবীর সবাই চিনতো। আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য যে বিজন সরকারের মতো ফটোগ্রাফারকে আমরা সম্মান জানাতে পারি নি। মনজুর আলম বেগের মত শিক্ষক যদি বাংলাদেশে না জন্মগ্রহণ করে আমেরিকায় জন্মাতেন তাহলে হাওয়ার্ড জিনের পর্যায়ে তাকে সম্মান জানানো হতো। কিন্তু এ দেশে এটা হয় নাই। ভাগ্য ভালো যে, শহীদুল

সাক্ষাৎকার

আলম সাহেব দেশের বাইরে কাজ-টাজ করেন, সেজন্য বিদেশের লোকেরা তাকে অ্যাড্রেস করতে পারে। আমরা জাতিগতভাবে তাকে একটা বড় পুরস্কার ও দিতে পারি নাই, সম্মানতো দূরের কথা।

মহসীন কবীর: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফাররা সাধারণ ফটোগ্রাফারদের মতোই মনে হয় তেমন একটা সম্মান পায়নি।

সাইফুল হক অমি: সেটা শুধু সাধারণ ফটোগ্রাফার কিংবা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার কেন, কেউই পায়নি। ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি পায় নাই।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি শেখার মতো জায়গা আছে বাংলাদেশে?

সাইফুল হক অমি: পাঠশালা।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: বাংলাদেশে এর বাইরে আর কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি?

সাইফুল হক অমি: আমার জানা মতে আর নাই। সিরিয়াস কাজ শেখার জায়গা এখনো পর্যন্ত পাঠশালাই।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: আপনার মনে হয় না যে সংখ্যাটা কম?

সাইফুল হক অমি: আমার তা মনে হয় না। কারণ, পাঠশালায় এখনো যে পরিমাণ ছাত্র আমরা চাইলেই পড়াতে পারি, সেই পরিমাণ ছাত্র তো পাই না। পাঠশালাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র ভর্তি হয় ঠিকই। পাঠশালায় ফার্স্ট ইয়ারে যে পরিমাণ ছাত্র থাকে, থার্ড ইয়ারে সেই পরিমাণ ছাত্র তো থাকে না। এটা আমি পাঠশালায় পড়াই সেই অর্থে জানি আর কি। আমি থার্ড ইয়ারে পড়াই। আমি দেখি থার্ড ইয়ারে ১০-১৫ জন ছাত্র থাকে। আমরা তো চাইলে ৩০-৪০ জন পড়াতে পারি। হয়তো দুটো শিফটে পড়াতে পারতাম। কিন্তু সেটা তো আর পারছি না।

মহসীন কবীর: ফটোগ্রাফির অন্যান্য শাখাগুলো যেমন ফ্যাশন, ওয়েডিংয়ে নবীনরা যেভাবে ঝুঁকছেন, ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির দিকে ঝোঁকটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম মনে হয়।

সাইফুল হক অমি: এটা ঠিক তা বোধ হয় না। এক নম্বর হচ্ছে যে, কিছু সামাজিক বাস্তবতা তো থাকে। এই অন্য ফটোগ্রাফির যে শাখাগুলোর কথা বললা, এগুলোর তো কিছু আয়-ব্যয়ের হিসাব আছে। কারণ, একজন আলোকচিত্রীকে তো বাঁচতে হবে। তাকে বাসা ভাড়া দিতে হয়, তাকে বাজার করতে হয়, তাকে খেতে হয়, তাকে সন্তান লালনপালন করতে হয়। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে সংকট সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির মার্কেটটা কমপারেটিভলি ছোট। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির সমস্যাটা হলো, কেউ তোমাকে ডেকে নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট দিবে না। কিন্তু একটা পাঁচ দিনের ফটোজার্নালিজমের অ্যাসাইনমেন্ট অথবা কমার্শিয়াল প্রজেক্টের অ্যাসাইনমেন্ট তুমি পাবা। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কাজটা তোমার নিজেরই তৈরি করতে হয়। তারপর এটার ফান্ডিং জোগাড় করতে হয়, তারপর কাজটা দাঁড় করাতে হয়। তারপর কাজটা করতে হয়। এ ধরনের কাজ করতে গেলে শুধু ভালো ছবি তোলায় স্কিলই যথেষ্ট নয়, আরো দশটা কাজ সম্পর্কে দক্ষতা লাগে। লিখতে জানতে হয়, বুঝতে জানতে হয়, কথা বলতে জানতে হয়, যোগাযোগ থাকতে হয়। আলোকচিত্রী হিসেবে অনেক ভালো হতে হয় যাতে করে বিশ্বের সব জায়গা থেকে তোমার জন্য ফান্ডিং আসে। সেই মানে উঠাটা কঠিন। অন্য কাজগুলো হয়তো কমপারেটিভলি একটু সোজা। এজন্য সবাই এখানে যায়।

ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির এগজিস্টিং কোনো মার্কেট নাই। যেমন, আমাদের দেশের যারা ফটোজার্নালিস্ট উনারা পত্রিকায় চাকরি করেন। তাদের সুবিধাটা হচ্ছে যে চাকরিটা এগজিস্ট করে। কিন্তু, ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম নয়। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে মার্কেটে টাকাটা কোথাও না কোথাও আছে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে টাকাটা নিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে মাস শেষে একটা বেতন পাওয়া যায়। কিন্তু, একজন ফটোগ্রাফার কিংবা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার যদি দুবছরও বসে থাকে, কেউ তাকে কোন কাজ দিবে না। তাকে তার কাজটা জোগাড় করে নিতে হবে।

মহসীন কবীর: বাংলাদেশে ডকুমেন্টারি স্টোরি করার জন্য বিষয় কেমন আছে?

সাইকুল হক অমি: অনেক বিষয় আছে। এটা নির্ভর করে কীভাবে বিষয়টাকে দেখি তার উপর। একটা কথা হচ্ছে ফটোগ্রাফার কীসের ছবি তুলবে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কেন ছবি তুলবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি কীসের ছবি তুলব এটা জানি, কিন্তু কেন ছবি তুলব এটা না জানি, তাহলে বিষয় আসলে বেশি থাকে না। আমার তো একটা কারণ লাগবে। আমি একটা জিনিসের পেছনে চার বছরের বেশি সময় ধরে লেগে থাকবো কেন? আমার লাভটা কী? একটা হতে পারে আমার ফিন্যান্সিয়াল প্রফিট আছে। এটা আমার পেশা, মাস শেষে বেতন পাই এটা একটা দিক। আর আমার যদি এর চেয়ে বিগার কোনো মোটিভিটেশন না থাকে, তাহলে খুব একটা বিষয় আসলে নাই। আবার অনেক বিষয় হয়তো আছে। এটা নির্ভর করে কে কীভাবে ছবি তোলে, কেন ছবি তোলে এর ওপর।

মহসীন কবীর: আপনার ডকুমেন্টারি স্টোরিগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

সাইকুল হক অমি: আমি প্রফেশনালি শুরু করি ২০০৬ সালে। আমি বেশিদিন ধরে ছবি তুলিনি। প্রথম দুই বছর একটা পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স নিয়ে একটা কাজ করে একটা বই বের করেছি। তারপর পানি নিয়ে কিছুদিন কাজ করেছি। অর্থাৎ উপকূলবাসী মানুষের জীবন নিয়ে আমার কাজ আছে। শিপ ব্রেকিং নিয়ে দুই বছরের একটু বেশি কাজ করেছি। আর রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমার চার বছরের একটা কাজ আছে।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: আপনার ডকুমেন্টারি প্রজেক্টগুলোতে আপনি সমস্যা সমাধানে কতটুকু গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আপনার কাছে মনে হয়?

সাইকুল হক অমি: খুব ভালো প্রশ্ন। আসলে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ফটোগ্রাফারের না। সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব সমাজের। এটা ফটোগ্রাফারদের ঘাড়ে চাপিয়ে কোন লাভ নেই। তারা সমস্যার ছবি তোলে, তাই তারা ডাক্তারের কাজ ঔষধ দেওয়া আর রোগীর কাজ ঔষধ খেয়ে সুস্থ হওয়া। ডাক্তার কিন্তু রোগীকে সুস্থ করতে পারে না। ডাক্তার রোগীকে বলতে পারে, এটা করলে রোগটা সেরে যাবে অথবা এটা করলে আপনার রোগটা হবে না। আমাদের কাজ সমাজের ডাক্তারের মত। আমরা বড়জোড় বলতে পারি, এটা একটা সমস্যা এবং এটা করা উচিত। সমাজ এবং সমাজের মানুষ ঠিক করবে তারা এটা চায় কীনা।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: সমাজের একটা বড় সংখ্যক মানুষ কি আপনার কাজগুলো দেখতে পেরেছে?

সাইকুল হক অমি: সমাজের বড় অংশ বলতে আমি কি বুঝি, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জীবনানন্দ দাশের কবিতা কতজন পড়েছে? রবীন্দ্রনাথের নাম আমিও জানি আর আমাকে একটু আগে রিক্সায় করে যে লোকটা বাসায় দিয়ে গেছে সেও জানে। আমরা পড়েছি কয়জন? তার মানে সমাজের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারটি একটি রিলেটিভ টার্ম। এটা এক ধরনের ভগ ধারণা। সমাজের

কাছে কেবলমাত্র একটি লোকই পৌছাতে পারে, সেটা হচ্ছে রাজনীতিবিদ। সমাজ পরিবর্তন, সমাজকে সামনে নেওয়া, সমাজকে পাল্টে দেওয়া, সমাজকে ঠিক করার দায়িত্বটা আর্টিস্টের না। আর্টিস্ট যেটা করতে পারে, সমস্যাটা আইডেন্টাইফিকেশন করতে পারে। বলতে পারে, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। শিপ ব্রেকিংয়ের উপর আমার স্টোরিটার আগে তুমি কি জানত না শিপ ব্রেকিংয়ের সমস্যার কথা? তুমি জানত। কিন্তু আর্টিস্টের কাজটা কী? আর্টিস্টের কাজটা হলো, সমস্যাটাকে সমাধান করতে হবে এই বিষয়টা সমাজে এসে বলা। সমস্যাটা সমাধান করতেই হবে। সমাজকে বাধ্য করতে হবে। আমার ক্ষেত্রে আমি যতটা সময় নিজেকে ফটোগ্রাফার ভাবি, তার চেয়ে বেশি অ্যাক্টিভিস্ট ভাবি। আমি কেন নিজেকে অ্যাক্টিভিস্ট ভাবতে ভালোবাসি? নিশ্চয়ই আমি ফটোগ্রাফার, কিন্তু আমি অ্যাক্টিভিস্ট ভাবতে পছন্দ করি। এই কারণে যে, ফটোগ্রাফিটা যদি চারকোণা ফ্রেমে আটকায়ে যায়, যদি ভালো ছবি তোলাই শেষ কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এটার কোনো মানে নাই। সমাজের অনেক মানুষ শাস্ত্রীয় সংগীত শুনবে বা রবীন্দ্র সংগীত শুনবে বা কবিতা পড়বে এটা আমি প্রত্যাশা করি না। এটা প্রত্যাশা করা মানে বোকার স্বর্গে বসবাস করা। আমাকে বা রবীন্দ্র সংগীত শুনবে বা কবিতা পড়বে এটা আমি প্রত্যাশা করি না। এটা প্রত্যাশা করা মানে বোকার স্বর্গে বসবাস করা। আমাকে আসলে শিল্পী হিসেবে আফসোস করাটা ত্যাগ করতে হবে। নিজের থেকে মানুষের কাছে যেতে হবে। মানুষ আমার কাছে আসবে, এই প্রত্যাশা করা ঠিক না। তার মানে হচ্ছে, মানুষটাকেই আমি বুঝতে পারিনি। সমাজের মানুষের এই সময়টা নাই। বাংলাদেশের এই প্রত্যাশা করা ঠিক না। তার মানে হচ্ছে, মানুষটাকেই আমি বুঝতে পারিনি। সমাজের মানুষের এই সময়টা নাই। বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। এদেশের মানুষ প্রতি দশ বছর পর পর ঝড়ে পাঁচ লাখ করে মরে যায়। দেশের পাঁচ কোটি মানুষ প্রতি বছর মঙ্গায় আক্রান্ত হয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ কাইমেট চেঞ্জের ভিকটিম। তার কী ঠ্যাকা পড়েছে তোমার ছবি দেখার? এখন দায়িত্ব বল, জীবনবোধ বল আর আচরণ বল এটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। ছবিটাকে তুলে গ্যালারিতে ঝুলায়ে রাখবা, না ছবির ব্যবহারটাকে এনসিউর করবা, নাকি ছবির বিষয় নিয়ে মাঠে আসবা। নাকি ছবির বিষয় নিয়ে আরো এনগেজড হবা, নাকি ছবির বিষয়টাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবা যাতে করে মানুষ তোমার কথা শুনতে বাধ্য হয়। যাদের ছবি তুলছো তারা এসে তো সবাইকে গল্পটা বলে যেতে পারবে না। ফটোগ্রাফারের দায়িত্ব হচ্ছে সেই গল্পটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ফটোগ্রাফির একটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফি সবার জন্য না। শিল্পের কোনো মাধ্যমই সবার জন্য না। কিন্তু অধিকতর মানুষের কাছে পৌছানোর রাস্তা খুঁজে বের করা আর্টিস্টের খুবই দরকার। সেই কারণেই একজন আর্টিস্ট একটা লেভেলের পর অ্যাক্টিভিস্ট হয়। তাকে অবশ্যই কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। কীভাবে পৌঁছে দিবে সেটা তার বিবেচনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শহিদুল আলমের ১৯৯১ সালের ফটোগ্রাফি এন্টিবিশন চার লক্ষ লোক দেখেছিল। কিন্তু চার লক্ষ লোক জীবনানন্দের কবিতা পড়েনি। তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: তারপর এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কি যে একজন ফটোগ্রাফারের ছবি এত লোক দেখেছে?

সাইফুল হক অমি: না, সেই দায়িত্ব তো ফটোগ্রাফারের। এক; ফটোগ্রাফার যদি মনে করে, তার ছবি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাহলে সেটার মাধ্যম সে নিজে বের করে নিবে। দুই; ছবিই কেন সবসময় পৌঁছে দিতে হবে? নিজের মধ্যে এত আত্মগরিমা কেন থাকবে? কি ঠ্যাঁকা পড়েছে আমার ছবি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? আমি তো বিরাট শিল্পী। কেউ যদি সেটা ভাবে সেটা ফটোগ্রাফারের নিজের ক্রাইসিস, এটা তার ইগোর ক্রাইসিস। আর ছবিই কেন দেখতে হবে? ছবি তোলাটা কী এমন কোনো পবিত্র কাজ? ছবি তোলা কী এমন কোনো বড় কাজ? তার মানে আমি ছবি তোলাটাকে পবিত্র কাজ বলে মনে করি। আমি মনে করি, পৃথিবীর সব লোকের ঠ্যাঁকা পড়েছে আমার কাছে এসে আমার তোলা ছবি দেখে যাবে। জীবনানন্দের কথা ভাবলে, তাঁর উচিত হয়নি এতগুলো কবিতা পাবলিশ করা। কারণ, তাঁর ভাবার কথা ছিলো, লোকে বাড়ি এসে লাইন ধরে তার কবিতা পড়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শেলী বা শেকসপীয়রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের বই পাবলিশ করে বাজার পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে মানুষ যাতে

সেটা কিনতে পারে। এভাবে মানুষের সাথে শিল্পীর যোগাযোগ নির্মাণ হয়। এখন কতটুকু পর্যন্ত আমি খুশি থাকবো, আমার ছবি কতজন দেখলে আমি মনে করবো আমার কাজটা হয়েছে, এটা তো ব্যক্তি নির্ভর।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: কিন্তু অধিকতর সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোটা কি গুরুত্বপূর্ণ নয়?

সাইফুল হক অমি: অবশ্যই। সেই কথাটাই তো বলছি। তুমি অধিকতর দর্শকের কাছে কিভাবে পৌঁছাবে সেই উপায়টা তোমাকে শিখতে হবে। একটা অপশন হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছবি দেখানো। কিন্তু আমার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে যে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমার শিপ ব্রেকিংয়ের ছবি কেন দেখাতে হবে? ছবিটাই কেন দেখাতে হবে? আমি গিয়ে কথা বলতে পারি না? আমি একটা লেখা লিখতে পারি না? আমি মানুষকে পারসোনাল লেভেলে গিয়ে বোঝাতে পারি না? আমি মানুষের সাথে কথা বলতে পারি না? আমি শ্রমিকদের সাথে আন্দোলনে যুক্ত হতে পারি না? আমার ছবিটা নিয়েই বসে থাকতে হবে কেন? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটাই, ছবিটাই মানুষকে দেখতে হবে, না দেখলে আমি নাই এটা কেমন কথা?

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: আমি এইটা বলি নাই যে, শুধু ছবিটাই দেখতে হবে। আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে অধিক সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছানো ছাড়াও ফটোগ্রাফারের সামাজিক দায়বোধ থাকাটাও জরুরি।

সাইফুল হক অমি: তুমি যা বলছো আমিও তাই বলছি। আমি শুধু এড করেছি তুমি যদি সমাজব্যবস্থা বুঝে থাকো তাহলে ধরতে পারবে যে এই সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আমরা প্যারিসে বসবাস করি না। আমাদের ঐ সুযোগ সময় আর অর্থনৈতিক সামর্থ্য হয়নি। আমরা শিল্পের রস আনন্দন করতে গিয়ে পাঁচ হাজার লোক গ্যালারিতে বসে থাকবো, এটা ঘটবে না। আপাত অর্থে ঘটলে খুব খুশি হবো আমি। প্যারিসের লোকজন, ইউরোপ আমেরিকার লোকজন তাদের জীবনের বড় একটা অংশ আর্ট এর পেছনে দিতে পারে। পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে একটা পেইন্টিং, দুই হাজার ডলার দিয়ে একটা ফটোগ্রাফির কাজ কিনতে পারে। আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ সেই অবস্থানে যায়নি। এখনো সমাজের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ জানে না কালকে কি থাকে। সেই সমাজে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে তোমার ছবিই যথেষ্ট না। আমার কথা কি পরিষ্কার বুঝতে পারছো? নিশ্চয় ছবি মানুষকে দেখানো উচিত। যতো বেশি সম্ভব এক্সিবিশন করা উচিত, যতো বেশি সম্ভব পাবলিকেশন থাকা উচিত। কিন্তু এটা করলেই কাজটা শেষ, এটা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় এর চেয়েও অনেক বড় কাজ আছে। শহীদুল আলম সাহেবকে দেখেছি, চার লক্ষ লোক তাঁর ছবি দেখেছে। আবার এটাও তো ঠিক, গত বিশ বছরে চার হাজার লোকও তাঁর ছবি দেখেনি। তার মানে, এটা ভাবতে হবে। সেইখান থেকে এখন শহীদুলের এক্সিবিশন দেখার জন্য দুইশ লোক থাকে না। এটা ভাবতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গভগোল হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে শহীদুল এতো বড় মাপের শিল্পী যে মানুষ এখন তাঁর ছবি বুঝেই না। এইটা শহীদুল আলমের বিষয়। আমি জাস্ট এই অর্থে কথাটার উদাহরণ দিলাম যে, এই আলোচনাটার মধ্যে ঢুকতে হবে। বাংলাদেশের বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের সকল লড়াই সংগ্রামে সকল মাধ্যমের মানুষকে পাওয়া গিয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে নাটকের লোক লড়াইয়ে এসেছে, গানের লোক এসেছে, সিনেমার লোক এসেছে, কবিরা তো এসেছেই, ফিল্মমেকাররাও এসেছে। একটা মাধ্যমের লোককে শুধু গণঅভ্যুত্থানে পাওয়া যায়নি। শত শত মানুষ মরলে ছবি তুলতে গেছে। কিন্তু, কোনদিন মিছিলে ঢুকে নাই। সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফাররা। জনমানুষ থেকে আমাদের ফটোগ্রাফাররা বিচ্ছিন্ন। তারা জনগণের ক্রাইসিসের ছবি তুলতে রাজি আছে, কিন্তু জনগণের ক্রাইসিসটার পাশে দাঁড়াতে রাজি না। দু-একজন ব্যতিক্রম আছে। লার্জলি, আমরা হচ্ছি জনগণের ক্রাইসিসের ভিওয়ার মাত্র। আমরা দেখতে পছন্দ করি। কিছুদিন আগে তারেক মাসুদ মারা গেছেন। তারেক মাসুদ অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন না। তাকে নিয়ে অনেক দ্বিমত করা যায়।

তারেক মাসুদ নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে ছিলেন, তাই না? যেমন রশিদ তালুকদার মারা গেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ব্যাপারে কষ্ট পেয়েছে। কারণ, রশিদ তালুকদার বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ। তাকে ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যাবে না। একান্তরের যুদ্ধ নিয়ে কথা বললে রশিদ তালুকদারকে নিয়ে কথা বলতে হবে। ইউস অ্যা রিমার্কবল অ্যাচিভম্যান্ট। রশিদ তালুকদারকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা পাইছি। আমরা ১৯৯০ এর সময় পাইছি। মানুষ তাকে দেখছে কিভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকটা কাজ করেছে। মরে যেতে পারতো জানার পরও ছবি তুলতে গেছে। তো এরকম মানুষকে মানুষ শ্রদ্ধা করতেছে না? আবার অন্য মানুষকে কেন পোছেই না? কারণ তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাকে দেখা যাচ্ছে বিলাস-ব্যসনে, গুলশানে-বারিধারায়, কাবে। তো ফটোগ্রাফি পৃথিবীটা পাল্টে দিবে, ফটোগ্রাফারের কাজ পৃথিবীর সবাই দেখবে এটা আমার সব সময় মনে হয় না। আমার মনে হয়, এটা তার চেয়েও অনেক বড় কাজ। কিন্তু ফটোগ্রাফি করাটা কোনো কাজ না। এভাবে আমি দেখি আর কী।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান: দায়িত্ববোধ থাকতে হবে এবং সমাজের সঙ্গে ফটোগ্রাফারদের মিশতে হবে। তাইতো?

সাইফুল হক অমি: অবশ্যই সমাজের সঙ্গে মিশতে হবে। রশিদ তালুকদার পারছিলেন বলেই রশিদ তালুকদারের মৃত্যু আমার বাবাকেও কাঁদিয়েছিল। কারণ, আমার বাবা যখন মিছিল করেছিলেন, আমার বাবা দেখেছিলেন যে কী করে রশিদ তালুকদারও মিছিলের সাথে মিশে গেছে। একটি ভালো ছবি তোলার জন্য তিনি যে কী পরিমাণ ব্যস্ত ছিলেন। ঐ বাচ্চা ছেলেটার ছবি তুলে কি করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হয়েছেন। মানুষ তাকেই মনে রাখে যাকে সেই মানুষ তার সংগ্রামের সময় পায়। যাকে দেখতে পায় না তাকে মনে রাখে না।

মহসীন কবীর: ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফাররা আসলে সমাজের কোন শ্রেণীর দর্শকের কাছে তাদের কাজকে পৌঁছে দিতে চান?

সাইফুল হক অমি: কোনো না কোনো ভাবেই পলিসি মেকারদের কাছে।

মহসীন কবীর: কিন্তু কাজ পৌঁছানোর সময় কোনো বাধার মুখোমুখি হন কি?

সাইফুল হক অমি: হ্যাঁ এটা ঘটে। যে কোন ভালো কাজের ক্ষেত্রে এটা সত্য। ভালো কবির ক্ষেত্রে এটা হয়, ভালো ফিল্মমেকারের ক্ষেত্রে এটা হয়। নিশ্চয়ই কোন ভালো ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কমিটমেন্ট যার আছে, তার কাজ তো নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে বিরক্ত করবে। কাউকে না কাউকে বিপদে ফেলবে। অস্বস্তির কারণ হবে। এই কারণেই ফটোগ্রাফারের কাজ তাদের পছন্দ হবে না। এক্ষেত্রে বাধা দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

ডেভিড বারিকদার

ফ্যাশন ফটোগ্রাফি বা কমাশিয়াল ফটোগ্রাফি জগতে খুব পরিচিত নাম 'ডেভিড বারিকদার'। ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করা এ আলোকচিত্রী প্রথমে শখের বশে শুরু করলেও পরে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ডকুমেন্টারি ও ফটোজার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করেন। পড়াশুনা করতে গিয়ে ইউরোপের পথে ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করেন কমাশিয়াল ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা। পরে দেশে এসে তারই বাস্তব রূপ দেন। গড়ে তোলেন 'পল ইমেজেস', আলোকচিত্রী হিসেবে সেখানেই কাজ করছেন এখন। কমাশিয়াল ফটোগ্রাফির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন শুভাশীষ রঞ্জন সরকার।

শুভাশীষ: আপনি ফটোগ্রাফি শুরু করেছেন কোন সময় থেকে? আপনি এখন কর্পোরেট ফটোগ্রাফি করছেন। আপনার শুরুটা কি কর্পোরেট ফটোগ্রাফি না কি সাধারণ থেকে পরে কর্পোরেটে চলে এসেছেন?

ডেভিড বারিকদার: ঠিক কখন থেকে ফটোগ্রাফি শুরু করি, তা আমার মনে নাই। আমি যখন রঙিন ছবি তুলি তখন প্রিন্ট করার মত জায়গা বাংলাদেশে ছিল না। ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়াকালে আমার বাবা-মা বিদেশে থাকতেন। তারা ফিল্ম নিয়ে আসতেন, তখন ছবি তুলতাম। পরে আবার বিদেশ থেকে প্রিন্ট দিয়ে আনতাম। আসলে ফটোগ্রাফি আমার ভালো লাগে, তাই করি। এটা কোনো পরিকল্পনা করে যে করা তা নয়। ফটোগ্রাফার হবো বলে আমি ফটোগ্রাফি শিখি নাই। এটা আমার শখ ছিল। পরে এক সময় দেখলাম এটা থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করা যায় এবং সেটা আমার ভালোও লাগে। যেমন, কোন বন্ধু ছবি তুলতে বলল তখন আমি তার ছবি তুলতাম এবং সেই ছবি প্রিন্ট করে দিলে সে আমাকে কিছু টাকা দিত। এটা ফিল্ম আমলের কথা ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে। তখন ছবি প্রিন্ট করতে ৪-৫ টাকা লাগত। প্রতি ছবিতে এক টাকা করে এক ফাইলে ৩০-৩৫ টাকা থাকত সেসময় এটা অনেক টাকা। এতে আমার পকেট মানি হয়ে যেত।

কর্পোরেট ফটোগ্রাফির শুরুটা মূলত ১৯৯০ সালে। আরশাদ রন, সোহেল রানা রিপন ও আমি, আমরা তিন বন্ধু মিলে "আলোক" নামে একটা ফটোগ্রাফিক ফার্ম করি। ১৯৯৪-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমরা সাথে ছিলাম। পরে ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্পন্সর নিয়ে ফটোগ্রাফির একটা কোর্স করতে ইংল্যান্ড চলে যাই। সাবজেক্ট ছিল ফটোজার্নালিজম। তখন ইউরোপে ঘোরার সময় কর্পোরেট ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জানতে পারি। ফটোজার্নালিজম না করেও এর আর কি কি পথ খোলা আছে তা নিয়ে কোর্স শেষে এক সপ্তাহের একটা ওয়ার্কশপ ছিল যেটাতে আমি অংশ নেই। ১৯৯৮ সালে দেশে ফিরে আসি।

শুভাশীষ : আপনি কি ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন ঐ সময় ?

ডেভিড বারিকদার: না। ওটা কোর্সের পার্ট ছিল। কোর্সের অংশ হিসেবে ওটা করতে হয়েছিল। অনেক বিখ্যাত ফটোগ্রাফাররা ওয়ার্কশপটি করায়। সাত দিনের ঐ ওয়ার্কশপটি ছিল ফটোজার্নালিজমের পাশাপাশি কিভাবে এ সেক্টরে স্বচ্ছলতা আনা যায় সে বিষয়ে। ঐ সাত দিনের শিক্ষাই মূলত ছিল আমার এখনকার জীবনের শিক্ষা। এটা কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭-১৯৯৮ সেশনের কথা। আমিও ভাবলাম ফটোজার্নালিস্টের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা যাতে ভালোমত কেনা যায় এজন্য একটু বাড়তি উপার্জন হলে অসুবিধা কি? ইংল্যান্ড যাবার আগেও আমি দেশে কর্পোরেট ফটোগ্রাফি করেছি "বিচিত্রা"-তে। এরপর 'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে যায়। 'বিচিত্রা' বন্ধ হওয়ায় সেখানকার ফটোগ্রাফাররা অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে যায়। 'বিচিত্রা'র সম্পাদক পরে আর একটা পত্রিকা বের করেন যার নাম সাপ্তাহিক ২০০০ বা আনন্দধারা। সেই সম্পাদক তার নতুন পত্রিকায় আমাকে ফটোগ্রাফার হিসেবে জয়েন

করতে বলেন। আমি সেখানে কাজ শুরু করি। তখন ফটোগ্রাফি করেই আমার চলার খরচ আমি অর্জন করি। সেসময় সব ধরনের ছবিই তুলতাম। যেটা আমার জন্য খুবই পজিটিভ ছিল। এখনও সবধরনের ছবি তুলি। এরপর 'সাপ্তাহিক আকর্ষণ' নামে একটি পত্রিকা থেকে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হল। রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ বা বের হওয়ার যে বিড়ম্বনা তার ছবি তুলতে হবে। সেদিন আমি আমি সদরঘাট, মহাখালী, যাত্রাবাড়ী, গাবতলীর ছবি তুলি। বিকেলের মধ্যে এ কাজ শেষ করে, রাতে একটি বিয়েতে দশটা ছবি তুলি। ঐ ফিল্মেই আবার মেরিল শ্যাম্পু'র বিজ্ঞাপনী ছবি তুলি। অর্থাৎ এ থেকে আমি বলব সব ধরনেরই ছবি তুলতে হবে, যেটা আমাকে করতে হয়েছে। এক ধরনের ফটোগ্রাফির সাথে অন্যটি জড়িত। একটির নলেজ অন্যটিতে অ্যাপ্লাই করলে ভাল ছবি পাওয়া যায়।

'আনন্দধারায়' ছবি তোলা ও সম্পাদকের গুণমুগ্ধ হওয়ায় আমার প্রচারটা পেয়ে যায়। আমার আজকের অবস্থানের জন্য 'আনন্দধারা'র সম্পাদকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

শুভাশীষ : ঐ সময় কি বাংলাদেশে কর্পোরেট ফটোগ্রাফির খুব অভাব ছিল?

ডেভিড বারিকদার : না। ঠিক অভাব ছিল না। কর্পোরেটই বা কয়টা ছিল? সেই অর্থে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে কর্পোরেট ফটোগ্রাফির শুরু। তিনি প্রাইভেটাইজেশন করেন। ফলে কর্পোরেট এর উৎপত্তি। গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপন এর দরকার ছিল না। প্রাইভেটাইজেশন এর ফলে প্রাইভেট সেক্টরে বিজনেস শুরু হল এবং কর্পোরেট ফটোগ্রাফির শুরু হল। বাণিজ্য বাড়ার সাথে সাথে কর্পোরেট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রও বাড়ল। গার্মেন্টস শিল্প এলো। এর বিজ্ঞাপনের জন্য ফটোগ্রাফি প্রয়োজন হল। পণ্যের প্রচারের জন্য ফ্যাশন ফটোগ্রাফি এলো। সিরামিক শিল্পের জন্য স্পেশাল ফটোগ্রাফির প্রয়োজন দেখা দিল। কক্সবাজারে তখন দুই-তিনটি হোটেল ছিল। তাদের প্রচার ওয়েবসাইট প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের জন্য ভাল মানের ছবির প্রয়োজন হল। আবাসন শিল্পের জন্য আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। এরপর টেলিকম শিল্প এলো। তারা বিভিন্ন কনসেপ্টের বিজ্ঞাপন দেয় যেটার visualization করার জন্য advertising টা আর একটু বেশি দরকার পরে। এতে তারা প্রচুর আয়ও করে। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক সেক্টর। এখানে শুধু লেখার চাইতে একটি ছবি অনেক বেশি কার্যকর। মানুষ অনুভব করল তাদের কনসেপ্টটা ডেভেলপ করা দরকার, conceptual advertising শুরু হল ২০০৩-২০০৪ সাল থেকে। অফিস বাড়ার সাথে সাথে বিজ্ঞাপনী সংস্থাও বাড়তে থাকে।

শুভাশীষ : তাহলে প্রাইভেটাইজেশনের ফলেই শিল্পের ধারণা পরিবর্তন হয় এবং কর্পোরেট ফটোগ্রাফির শুরু হয়? স্যাটেলাইট বা গ্লোবলাইজেশন ও কি এর কারণ?

ডেভিড বারিকদার : স্যাটেলাইট বা গ্লোবলাইজেশন এর কারণে বিদেশি ম্যাগাজিন থেকে ভাল ছবি দেখা যায়। ভাল ছবি বলতে যাতে এনার্জি আছে। আলো আঁধারের খেলা আছে, composition, light, color, moment আছে। সেজন্য একটি ভাল ছবি দরকার। আমি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বিদেশি ম্যাগাজিনের বই কিনতাম। এমনকি কোন বাড়িতে গেলে ক্যালেন্ডার উলটিয়ে দেখতাম। এখন দেশেও ভাল ক্যালেন্ডার পাওয়া যায়।

শুভাশীষ : বহির্বিশ্বের সাথে কর্পোরেট ফটোগ্রাফি কি অবস্থায় আছে?

ডেভিড বারিকদার : অর্থনীতিতে যতখানি পার্থক্য। এই ব্যবসাতেও ততোটা পার্থক্য থাকবে। অর্থনীতি যতটা বাড়বে, কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রিও তত বাড়বে।

শ্রুতাশীষ : কমাশিয়াল ফটোগ্রাফি শেখার জন্য আমাদের দেশে কেন ইনস্টিটিউট হয়নি? Basic ও Documentary photography শেখার ইনস্টিটিউট আছে। Commercial photography শেখার ইনস্টিটিউট নাই। আপনারা যারা Corporate Photography করছেন, দেশের প্রয়োজনে এই শিল্প গড়ে তোলার জন্য Corporate Photography শেখার প্রতিষ্ঠান কতটা প্রয়োজন বলে মনে করেন ?

ডেভিড বারিকদার : অবশ্যই প্রয়োজন। এখনও আমি ফুলটাইম Photography নিয়ে আছি। তাই গুটা করা হয়ে উঠছে না। বেসিক ইনস্টিটিউট করা সম্ভব। আমার আগ্রহ Corporate Photography তে। শিল্পকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না, যেমন, গার্মেন্টস। এর মালিকরা বিলাসবহুল জীবন ধারণ করে কিন্তু শ্রমিকেরা ঠিকমতো বেতন পায় না। তাই এ ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কোন ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্ড তৈরী করতে পারেনি। কিন্তু বিদেশি ব্রান্ড বাংলাদেশ থেকে কাপড় বানিয়ে নেয়। গার্মেন্টস মালিকরা শুধু নিজের মুনাফা দেখছে। তাদের কোন শিল্পবোধ নেই।

শ্রুতাশীষ : ফ্যাশন ফটোগ্রাফির যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তার প্রতি সবার দৃষ্টিভঙ্গি কি একই রকম ?

ডেভিড বারিকদার : না। একই রকম না। তারা এখন সবাই ফটোগ্রাফিকে মূল্য দিতে শিখেছে। একটা ঘটনা বলি, এক সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির জিএম (বাংলাদেশের প্রথম সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতেন) তার পন্যের Brochure বানিয়ে বিদেশে client এর কাছে দিলে বিদেশিরা তা তার মুখের উপর ছুড়ে মারে। পরে সেই জিএম দেশে এসে ভালো ফটোগ্রাফার খোঁজ করেন। না পেয়ে ভারত থেকে কাজ করান। এখন তিনি আমার সাথে কাজ করছে। অর্থাৎ আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজ করছি। আমাদের তৈরী Brochure সিরামিক শিল্পের মার্কেটিং এর কাজে বেশ ভাল ভূমিকা পালন করছে।

শ্রুতাশীষ : আমার ধারণা হাতেগোনা গুটিকয়েক জন এই ফটোগ্রাফির মূল্য দিতে জানে..

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ। ব্রান্ডিং এর জন্য শিল্পী হতে হবে। অনেক বড় বিজ্ঞাপন নির্মাতা বলেন। আমি যখন বিজ্ঞাপন করি তখন শিল্প খুঁজি না।

শ্রুতাশীষ : অর্থাৎ আপনি বলছেন এখনও তারা প্রচারণাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি ?

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ। সবাই মূলত শিল্পী। যার আবেগ আছে সেই শিল্পী। হয়ত প্রকাশ ঘটছে না। সবকিছুতে সাধ্যের মধ্যে পছন্দের ব্যাপার থাকে। এটিও শিল্পমানের পরিচয়।

শ্রুতাশীষ : আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে শিল্পের/ফ্যাশন ডিজাইনের যে ধরণটা সেটা ওভাবে ডেভলপ করেনি...

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ। শিল্পবোধের পরিচয় বা বিকাশ ঘটবে সেই সমাজেই, যে সমাজের মানুষকে শিশুকালে যে কোন শিল্পকর্ম শেখানো হবে। আকাশ সংস্কৃতির কারণে শিল্পচর্চার জায়গা অনেক কমে গেছে।

শ্রুতাশীষ : এতে তো আমাদের সুবিধাও হয়েছে। তখন একটা হারমনিয়াম, গীটার এমনকি ক্যামেরা পাওয়া যে কষ্টকর ছিল। এখন তো অনেক সহজ।

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ, অনেক সহজ। এখন কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে সবই করা যায়।

শুভাশীষ : সাধারণ মানুষের কাছে ফ্যাশন ফটোগ্রাফির ধারণা কি?

ডেভিড বারিকদার : বুটিকই আমার জানামতে একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি যা দেশীয় কাচামাল, দেশীয় কারিগরি নির্ভর শিল্প। এরকম অনেক ফ্যাশন হাউজ আছে, তারা দেশীয় জিনিস দিয়ে পণ্য তৈরি করে। আমদানিতো করেই না বরং রপ্তানি করে। কিন্তু তাদের ফ্যাশানের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। একই ধরনের কাপড় ব্যবহার করে, হয়তো ডিজাইন একটু ভিন্ন। ফ্যাশন বলতে আমি বুঝি, আমার মনের সাথে আমার প্রয়োজনের মিল ঘটিয়ে আমি যেটা প্রকাশ করি সেটাই আমার ফ্যাশন। দেশের ফ্যাশন হাউজগুলো দুই ঈদকে সামনে রেখে কাপড় বানায়। ঈদে অবিক্রিত পণ্য সারা বছর বিক্রি করে। কিন্তু পশ্চিমে এর চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য আমি বলি আমাদের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এখনও ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠেনি। বেশ কয়েকজন ভাল ফ্যাশন ডিজাইনার আছে দেশে। অনেকের ফ্যাশন হাউজ করার যোগ্যতাও আছে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না। সময়ের সাথে সাথে হয়তো হবে।

শুভাশীষ : আপনার এই হতাশার জায়গা থেকে কি কিছুটা আলো দেখছেন?

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ। অনেক ব্রান্ডই নিজস্ব কনসেপ্ট এগুচ্ছে। অনেকেই হয়তো ভাল প্রোডাক্ট তৈরি করছে। পত্রিকা, বিলবোর্ড এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কিন্তু অনেকেই সাধারণ মানের ফটোগ্রাফারের ছবির কারণে ঠিকমতো প্রচারণা করতে পারছে না। দশটা পরীক্ষার একটাতে ফেল মানে তো ফেল।

শুভাশীষ : আপনিতো অনেকদিন ধরেই কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি করছেন। এগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী হতে পারে? যারা এ কাজ করতে চায় তাদের কি কি বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত?

ডেভিড বারিকদার : কেউ যদি প্রফেশনালি ফটোগ্রাফি করতে চায় তাহলে তার ফটোগ্রাফি জানা দরকার অর্ধেকের কম, ৩০% বাকি ৭০% হচ্ছে সে যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে সেটা সম্পর্কে জানা। যেমন, একজন ফ্যাশন ফটোগ্রাফারের আগে ফ্যাশন সম্পর্কে জানতে হবে।

শুভাশীষ : কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে পোস্ট প্রসেসিং বলতে আমরা কি বুঝি?

ডেভিড বারিকদার : এটা শুধু কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি না, এটা সবক্ষেত্রেই। ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে ৫০% ক্যামেরায় আর ৫০% পোস্ট প্রোডাকশন।

শুভাশীষ : তাহলে ফ্যাশনটাই কি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির মূল বৈশিষ্ট্য?

ডেভিড বারিকদার : না তো। প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি, এডভারটাইজিং প্রভৃতি সবই অর্থাৎ কমার্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সব ফটোগ্রাফিই কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি। তবে এ ক্ষেত্রে ফ্যাশন ফটোগ্রাফির ফোকাসটা অনেক বেশি। ফ্যাশন ফটোগ্রাফি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির একটি অংশ। ইউরোপে ফটোগ্রাফারদের কাজের স্পেশলাইজেশন আছে। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে থাকে। এদিক দিয়ে আমাদের দেশে তো একজনকে অনেক কিছুই করতে হয়। তবে আমি এমন অনেককে চিনি যারা শুধু ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করে। অন্য কিছু করতে বললে নিজে না করে অন্যকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমি মনে করি, ফটোগ্রাফাররা যেভাবে এগুচ্ছে, আমাদের বাজারটা সেভাবে এগুচ্ছে না।

শুভাশীষ : এর কারণগুলো কি কি?

ডেভিড বারিকদার : আমার ক্ষেত্রে বলব, এখন পর্যন্ত আমি নিজেকে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার বলে দাবি করি না। ছবি তুলতে ভাল লাগে তাই তুলি। কোন দায়বদ্ধতা থেকে তুলছি না। যতদিন ভাল লাগবে করব। এক্ষেত্রে আমার ভাল লাগটাই জরুরি।

শুভাশীষ : অর্থাৎ আমরা প্রফেশনাল জায়গায় আসতে পারিনি।

ডেভিড বারিকদার : আমার ক্ষেত্রে আমি পারি নি। তবে অনেকেই ক্যামেরাই কেনে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি করবে বলে।

শুভাশীষ : তাহলে কি ফটোগ্রাফিতে শিল্পচর্চার পরিবর্তে শুধু মুনাফা করাই উদ্দেশ্য হয়ে উঠছে?

ডেভিড বারিকদার : ভাল লাগা ছাড়া শুধু অর্থ উপার্জনই ফটোগ্রাফিতে আসার কারণ হতে পারে না। তবে যদি কেউ আসে তারা শিল্পী হবে না, টেকনিশিয়ান হবে।

শুভাশীষ : এখন নতুন করে যে সব ফটোগ্রাফার এক্ষেত্রে আসবে তারা হয়তো এই ভুলটা ঠিকমত বুঝবে না। কিন্তু আপনি বুঝেছেন। আপনি অনেকদিন ধরে এ সেক্টরে আছেন। এটা কি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ?

ডেভিড বারিকদার : না। সেটা কখনই হতে পারে না। ফটোগ্রাফি, পেইন্টিং, মিউজিক এগুলো ট্যালেন্টের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা ও ইমোশনের দরকার। এজন্য আমি মনে করি না, একজন নতুন ফটোগ্রাফার এসে বাজার থেকে পুরোনোদের বের করে দেবে।

শুভাশীষ : এক্ষেত্রে আপনার দুএকটা মজার ঘটনা বলবেন কি?

ডেভিড বারিকদার : হ্যাঁ। কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির পুরো ব্যাপারটাই মজার। ফ্যাশন ফটোগ্রাফির কথাই বলি, আমার বান্ধবীর দুলাভাইয়ের হ্যান্ডিক্রাফটের দোকান ছিল। ৯০-৯১ সালের কথা বলছি। তিনি আমার বাসায় ফোন করলেন। বললেন, 'আপনি কোথায় থাকেন? কতদিন ধরে আপনাকে ক্যামেরা ও পাঁচ রোল ফিল্ম নিয়ে কবে গেলাম ছবি তুলতে। উনি আমাকে দেখে হয়তো আমি তেমন ছিলাম না। ফোনে আমাকে ভালই আতিথেয়তা করলেন। ভাল ছিল। ভাবলাম হয়তো ফুলের ছবি মধ্যে উনি ডাকলেন। একটি সুন্দরী মেয়ে শাড়ি পড়ে এলো। আমি ভাবলাম হয়তো বিয়ের ছবি। কিন্তু মনে প্রশ্ন এল, পাঁচ রোল ফিল্ম কেন আনতে বললেন? জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, শাড়ির ছবি তুলতে হবে। ফ্যাশন ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তখন আমার তেমন ধারণা নেই। শুধু ফোকাস, অ্যাপারচার ঠিক করে তিন-চারটি ছবি তুললাম। এরপর আরেকটি মেয়ে আসল। এভাবে চার-পাঁচটি সুন্দরী মেয়ের ছবি তুললাম। এরপর ডাইনিং টেবিলে ভর্তি খাবার। আমি খেয়ে দেয়ে চলে আসছিলাম। উনি সিঁড়ি দিয়ে আমার সাথে এলেন। উনি ফিল্মগুলো চাইলেন। আমি প্রিন্ট করে দিতে চাইলাম। উনি হয়তো ভাবলেন চারটি সুন্দরী মেয়ের ছবি নিয়ে আমি (একটি ইয়ং ছেলে) কি যেন করে ফেলবো। উনি আমার পথ আগলে ভদ্রভাবেই ফিল্মগুলো চাইলেন। চারটি ফিল্ম শেষ। একটি রোলের চার-পাঁচটি বাকি ছিল। ঐ অবস্থায় খারাপ লাগলেও ফিল্মগুলো খুলে দিতে বাধ্য হলাম। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যান্ডশেক করার মতো ৫০০ টাকা হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। এটা ১৯৮৬/১৯৮৭ সালের কথা। এটাই ছিল আমার ফ্যাশন

ফটোগ্রাফির প্রথম অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এখন এটা করতে অনেকগুলো ধাপ পার করতে হয়।

সুভাশীষ : এ পেশায় কি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন?

ডেভিড বারিকদার : অন্য পেশার সাথে তো তুলনা করতে পারবো না। অন্য পেশা সম্পর্কে ধারণা নেই।

সুভাশীষ : আপনার জায়গায় আপনি কেমন আছেন?

ডেভিড বারিকদার : আমি ভাল আছি। ভাল না থাকলেতো আপনার সাথে কথা বলতাম না। পছন্দের জায়গায় আছি বলেই আপনাকে সাথে কথা বলছি।

সুভাশীষ : আপনার অর্জন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন--

ডেভিড বারিকদার : ভুল করে কিছু পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার ফটোগ্রাফারদের জন্য ক্ষতির কারণ। এগুলো আমায় ফটোগ্রাফারদের কাজ। এমন অনেক ফটোগ্রাফার আছেন যারা একদিনে একটি গোল্ড মেডেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রতিযোগিতায় ছবি দেয়ার সময় তাদের নেই। আমার অনেক বড় বড় পুরস্কার আছে কিন্তু সেগুলোকে আমি ক্যারিয়ারের ক্ষতিকর বলে মনে করি। অনেকেই ঠিকমত ছবি তুলতে না জানলেও পুরস্কার পেয়ে নিজেকে কি না কি মনে করে।

সুভাশীষ : এ বিষয়টাকে ক্যারিয়ারের বাইরে কি ফটোগ্রাফি শিল্পের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন?

ডেভিড বারিকদার : সেক্টর বা শিল্পের জন্য না, এটা ব্যক্তি বিশেষের জন্য ক্ষতিকর।

সুভাশীষ : এ মুহূর্তে শুধু কমাশিয়াল ফটোগ্রাফি না, পুরো ফটোগ্রাফি সেক্টরের জন্য কোন বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

ডেভিড বারিকদার : ফটোগ্রাফির জন্য একটি ভাল ইনস্টিটিউট দরকার। যেটা ফটোগ্রাফির সকল বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা প্রদান করবে। অনেকেই স্পেশলাইজড একটা বিষয় নিয়ে শেখাচ্ছে। আমি চাই ফটোগ্রাফির জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হোক।

এস এম গোর্কি

এস এম গোর্কি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ফটোজার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে। বর্তমানে তিনি 'দৈনিক যুগান্তর' এর চিফ ফটোজার্নালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও সাংবাদিক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। বিতর্কের কিছু বিষয় এড়িয়ে তার এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফটো-সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ রাসেল।

মোহাম্মদ রাসেল : ফটোসাংবাদিকতা পেশা হিসেবে কেমন?

এস এম গোর্কি : ফটোসাংবাদিকতা পেশা তো খুবই ভালো একটি পেশা এবং এতে যেমন risk আছে তেমন feel আছে। ফটোসাংবাদিকতা করতে গেলে মূলত যেটার প্রয়োজন হয় সেটা হল সাহসিকতা আর ধৈর্য। মাথা ঠান্ডা করে কাজ করতে হবে, মাথা গরম করে ফটোসাংবাদিকতার কাজ করা যাবে না। তুমি মাথা গরম করলে তো হেরে গেলে। তারপর ফটোজার্নালিজমের জড়ালে অনেক ঘোরা যায়, জানা যায়, শোনা যায়, দেখা যায়, শেখা যায়, মানুষের সাথে মেশা যায়। রুট লেভেল থেকে শুরু করে Up to প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তুমি অনায়াসে তাদের রিচ করতে পারছ, যোগাযোগের মাধ্যমটা তুমি স্থাপন করতে পারছ, যেটা অন্য কোন প্রফেশনে নেই। এছাড়া যে জিনিসটা হলো মানুষের পাশে দাঁড়ানো, একজন মানুষ একটা দেশ, জাতি বা একটি সংগঠনের পাশে তুমি অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে। কারো একটি ছবি তুলে একটা নিউজ করলে সে উপকৃত হবে, দেশ এবং জাতি উপকৃত হবে। অনেকভাবে তুমি সমাজের উপকার করতে পারবে এ পেশার মাধ্যমে।

মোহাম্মদ রাসেল : সংবাদপত্রের একটা সেক্টর হিসেবে ফটোজার্নালিজম কি ধরনের ভূমিকা পালন করে?

এস এম গোর্কি : সংবাদপত্রে যে জিনিসটা আগের থেকে অনেক বেশি উন্নতি করেছে সেটা ফটোজার্নালিজম। আগের সংবাদপত্রে যে জিনিসটা ছিল মানে আমরা যখন ফটোগ্রাফি শুরু করলাম, তখন black and white এর যুগ ছিল, ফিল্মের যুগ ছিল। তখন সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় কাজ করে আবার অফিসে গিয়ে সেই ছবি ডেভলপ করা, print করা আরো অনেক বিষয় ছিল। অনেক সময় দেখা যেত যে chemical নাই। তখন আবার chemical বানাও temperature maintain কর। তারপর আসলো colour এর যুগ। এতে ঝামেলা কিছুটা কমে গেল colour lab এ গিয়ে ছবি print করলেই হয়ে যেত। এখন তো ডিজিটাল ফটোগ্রাফি, ঐ তুলনায় এটা আরো সহজ। এখন শুধু একটা ক্যামেরা হলেই যথেষ্ট, অন্য কিছু লাগে বলে আমার মনে হয় না। যারা প্রফেশনাল হতে চাচ্ছে বা প্রফেশনালিজমে আসতে চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলব তাদের কিছু শিখে আশা উচিত। আমার একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আছে যাতে টিপ দিলাম আর ফটোগ্রাফার হয়ে গেলাম এটা ভাবা ঠিক না। এই জিনিসটা করলে ফটোগ্রাফির মান নষ্ট হয়, ফটোগ্রাফারদেরও বদনাম হয়। প্রফেশনাল আর নন-প্রফেশনালের পার্থক্য বোঝা যায় না। একজনের পয়সা আছে সে একটা d2s বা d3s কিনে নিল বা mark2 অথবা mark3 কিনে নিল; তারপর সে ফটোগ্রাফী শুরু করল। তার ভাব সাব দেখে মনে হবে সে প্রফেশনাল, কিন্তু সে কিছুই না, তার পয়সা আছে সে ক্যামেরা কিনে নিয়েছে। সে ফটোগ্রাফীর কিছুই করতে পারলো না। কিন্তু যে লোকটার কাজ উনি করলেন সে লোকটা বললো ফটোগ্রাফার কোন কাজ করতে পারে না। আমার যা মনে হয় basic জিনিসটা জেনে অন্তত ফটোগ্রাফি করা উচিত।

মোহাম্মদ রাসেল : এনালগ এবং ডিজিটাল দুটোতেই ফটোগ্রাফি করেছেন। একটা ট্রানজিকশন পিরিয়ড বলা চলে। এখনকার থ্রুজনের কেউ যখন ফটোগ্রাফিতে তারা কিন্তু এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। এ বিষয়টাকে কীভাবে দেখেন?

সাক্ষাৎকার

এস এম গোর্কি: আজকে প্রায় ২০-২২ বছর হয়ে গেছে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফীতে। আমরা একসময় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফী করতাম। সেই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট থেকে শুরু করে ডিজিটাল কম্পিউটারের যুগে চলে আসছি আমরা। এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফী হচ্ছে best photography। যদি এখন কেউ আমাকে বলে ডিজিটাল বাদ দিয়ে দিলাম তোমরা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এ চলে আসো। আমি তো এক পায়ে খাড়া। সাদা কালোর যুগে সারাদিন কাজ করার পর varieties formula তে chemical বানিয়ে experiment করা এটা খুব enjoy করতাম। সেই ছোটবেলা থেকেই ক্যামেরা হাতে পেলেই একটু টিপ দিয়ে দেখতাম ছবি উঠে কি উঠে না। তখন তো ফিল্ম ছিল, একটা ফিল্ম ৩৬ টা স্ল্যাপ। ছাত্র জীবনে ফিল্ম কেনার অত পরিসর ছিল না। তখন নিউমার্কেটে মোল্লার দোকানে যেতাম সেখানে ১৫ বা ২০ টাকা করে রাশিয়ান ফিল্ম পাওয়া যেতো। আবার পল্টন মোড়ে একটা দোকান ছিলো alight photography। alight photography তে disk থেকে খুলে তারপর ফিল্ম এর ক্যাসেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বিক্রি করতো। সে ফিল্মগুলো আমরা নিতাম। ১০ টাকা ১২ টাকা করে দাম পরত। কোন কোন রোলে ২০-২৫ টা হত, কোনটাতে ৪০ টা। আবার কোনটা দেখা গেছে পুরাটাই খুলে চলে গেছে। মানে, ফিল্ম ক্যাসেটের ভেতর স্ক্রটেপ দিয়ে লাগানো থাকতো দেখা যেত ছবি তুলতে তুলতে পুরা ফিল্মই দৌড়ে চলে গেছে। তারপর dark room এ গিয়া কাজ করার পরে সেই ছবিটাকে লালন পালন করে আবার হাজির করা। ছবিটা বের করে নিয়ে আসা। ওটার মজাই আলাদা। dark room এর কাজ করার মজাটাই আলাদা। কম্পিউটারে বসে কাজ করা আর dark room এ বসে কাজ করার আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি এখনো পছন্দ করি dark room।

এখন অনেক সফটওয়্যার পাওয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার তৈরী করে দিচ্ছে আমি তার সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করছি। অফিসে এসে ফটোশপ খুললাম বা আরও যেসব সফটওয়্যার আছে। বাটন টিপলাম, আমার ছবি পুরো প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে চলে আসল। কত সহজ হয়েছে বিষয়টা। এখন একজন not professional এর হাতে যদি একটা ডিজিটাল ক্যামেরা থাকে আর ফটোগ্রাফীর যেসব সফটওয়্যার আছে তাতে সে এসে একটা বাটন ক্লিক করলো, তার ছবি ঝকঝকা তকতকা হয়ে গেলো। কমপোজিশন হোক বা না হোক তার client ছবিটা দেখে বলবে, না জানি কি একটা ছবি হয়েছে। আমি সেটিকে ছোট করে দেখছি না, আমি দেখছি এবং যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, অন্তত কিছু হলেও জানা উচিত, কারণ ফটোগ্রাফি এখন একটা ফ্যাশন। এটাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে আমার মনে হয় নেশা হিসেবে নেওয়াটাই better। নেশাটা হলে পেশাটা আপনাআপনি চলে আসবে। ফটোগ্রাফি একটা addiction এর মতো। আমার ছিলো জানিনা অন্য কারো আছে কি না?

মোহাম্মদ রাসেল : ফটোগ্রাফির তো অনেকগুলো সেগমেন্ট রয়েছে যেমন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফী, আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফী, স্পোর্টস ফটোগ্রাফী। ফটোগ্রাফির আর একটা সেগমেন্ট ফটোজার্নালিজম। ফটোগ্রাফির দুটি মূল ধারা আমরা দেখতে পাই আর্ট ফটোগ্রাফি আরেকটা ফটো জার্নালিজম। আপনারা যারা ফটো জার্নালিজমের কাজ করেছেন তারা নিউজটাকে বেশি মূল্যায়নের চিন্তা করে ছবি তোলেন। যারা আর্ট ফটোগ্রাফার তাদের ছবির হয়তো নিউজ ভ্যালু নেই। আপনি এই দুইটার পৃথকীকরণটা কীভাবে দেখেন?

এস এম গোর্কি: আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি যে কথাগুলো বলছি সবগুলোই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এতে কারো রাগ হবার কিছু নেই, খুশি হবারও কিছু নেই। বাংলাদেশ যখন সিডর আক্রান্ত হলো। costal area তে আমি প্রায় ১২ দিনের মত ছিলাম। কাজ করছিলাম সেখানে। ওখানে খাবার পানির অনেক সংকট ছিল কাজ শেষে আমাকে চলে আসতে হত বরিশাল শহরে। বরিশাল এবং টোটাল ঐ বেল্টে আমি কাজ করতাম। কুয়াকাটা, বরগুনা, পিরোজপুর, ঐ বেল্টের টোটালটাই

আমি কাভার করেছিলাম। আমি প্রতিদিন রুমে ফিরতাম রাত্র ১২ টা ১২.৩০-এর দিকে। প্রতিদিনই আমি আমার নিজের জন্য কিছু আর্ট ফটোগ্রাফী করার চিন্তা করতাম। আমার জন্য, শুধু আমার জন্য কিছু কাজ করব, এক্সিবিশনের জন্য কিছু ছবি তুলতাম। প্রতিদিন সকাল বেলা যখন বের হতাম তখন অটোমেটিকেলি আমার ভেতরে একটা চিন্তা ভর করত যে এই ছবিটা আমি যে তুলব এর মধ্যে নিউজতো নাই। ছবিটার মধ্যে আমার নিউজ রাখতে হবে। এভাবে নিউজের কথা চিন্তা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে আমার আর আর্ট ফটোগ্রাফী করা হয়নি।

মোহাম্মদ রাসেল : এটা রক্তে মিশে যাবার মত।

এস এম গোর্কি: আর্ট ফটোগ্রাফির জন্য খুব কম নিউজপেপারই আছে আমাদের দেশে। সেগুলোর মধ্যেও খুব কম সময়ই দেখা যায় যে আর্ট ফটোগ্রাফি ছাপে। ছাপে না যে একেবারে তা না, বছরে একটা, দুইটা, তিনটা বা চারটা। মাসে একটা পড়ে বলে আমার মনে হয় না। আর নিউজ ফটোগ্রাফীতে যেমন 5WH এর যে ধারাটা সেটা তো থাকতেই হয়। একটা ছবি দেখলে মানুষ যেন অন্তত ক্যাপশন ছাড়া বুঝে আসলে ছবিটা কি।

মোহাম্মদ রাসেল : ধারা যেটার কথা বললেন 5WH

এস এম গোর্কি: 5WH দিয়ে Why, when, where, how এই যে কেন কোথায় কবে ধারাটা। এই জিনিসটা ছবিটার মধ্যে থাকলে তাহলে সহজে একটা নিউজপেপার খুলে বুঝতে পারে, ও আচ্ছা একটা মারপিট হইছে, অমুক জায়গায় তমুকটা হইছে। এরপর ছবির ক্যাপশনটা পড়লে আর ভেতরের খবরটা পড়তে হয় না। ধর তুমি যদি ছবিটা ছাপ, ক্যাপশন না দিলেও ঐ জায়গার আশেপাশে যারা থাকে তারা কিন্তু আশেপাশের পরিচিত জিনিসগুলো দেখে বুঝতে পারে কোন জায়গায় কি ঘটেছে।

মোহাম্মদ রাসেল : হ্যাঁ। সকল ভাষাভাষীর মানুষই এটা বুঝতে পারে...

এস এম গোর্কি: right! মানে তার জন্য extra কোন কিছুর দরকার হয় না। ছবির সাথে একটা লাইন এ caption ক্যাপশন দিয়ে দিলে details প্রয়োজন হয় না অতটা। news ফটোগ্রাফী করতে গেলে ক্যাপশন news যেটাকে আমরা বলি, সে ক্যাপশন news টা তোমাকে করে দিতে হবে। কিন্তু পত্রিকাগুলোর অত জায়গা নাই। আমি নব্বইয়ের দশকের কথা বলি। সে সময় নিউজ পেপারের পাতা হত সর্বোচ্চ আট, এর পরে হল বারো পাতা। সপ্তাহে দুই তিন দিন বারো পাতা বের হতো। সেই সময় প্রচুর জায়গা ছিল। ফলে ছবি ছাপার জায়গা হত। এখন বাইশ পাতা, চব্বিশ পাতা, ছাব্বিশ পাতা, ত্রিশ পাতা হয়ে গেছে নিউজপেপার। coloum ছবির size এখন অনেক কমিয়ে ছাপা হচ্ছে। single কলাম double কলাম এর ওপরে সাধারণত কোন ছবি যায় না।

মোহাম্মদ রাসেল : এই পরিবর্তনের কারণটা কি ?

এস এম গোর্কি: কারণটা হচ্ছে pressure বেড়ে গেছে। সংগঠন অনেক হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কয়টা সংগঠন ছিল? আমি যদি রাজনৈতিক সংগঠনও ধরি। ছাত্র ইউনিয়ন, আওয়ামীলীগ, জাসদ এরকম কয়েকটা ছিল। এখন সংগঠনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। পঁচাত্তরের পর বি.এন.পি, জামাত, জাতীয়পার্টি তারপর ডেমোক্রেটিক লীগ, ডেমোক্রেটিক পার্টি, বিকল্প ধারা। অমুক তমুক এই যে চৌদ্দ দল, চার দল এভাবে রাজনৈতিক সংগঠনই অনেকগুলো হয়েছে। শুধু তাই না জনসংখ্যা বাড়ছে, news এর সেক্টরও বাড়ছে যার ফলে news করতে করতে ছবি ছাপানোর জায়গা কমে গেছে।

সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ রাসেল : একটা ছবির মাধ্যমে একটা নিউজ দেয়া, একটা বিষয় তুলে ধরা। এটাতো গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বড় একটা ইফেক্টিভ ব্যাপার। কিন্তু তবুও কেন এমন হচ্ছে?

এস এম গোর্কি: না না ইফেক্টিভ জিনিস হলো যে, আমাদের দেশের মানুষ news পড়তে যতটা ভালোবাসে ছবি দেখতে তারা ততটা ভালো বাসে বলে আমার মনে হয় না। নাহলে আমরা যারা অন্তত পত্রিকায় কাজ করি। তারা বেশি ছবি ছাপতাম।

মোহাম্মদ রাসেল : vital কিছু না হলে পত্রিকায় ছবি দেখার গুরুত্বটা তৈরি হয়নি..

এস এম গোর্কি: vital না হলে দেয় না, right? পাহাড় ধসে মারা গেছে পঞ্চাশ জন এই জাতীয় বা costal area, সিডর হয়েছে, হারিকেন হয়েছে সেখানে হয়তো massive একটা disaster হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে চার থেকে পাঁচ কলাম ছবি ছাপা হচ্ছে। এছাড়া as usual ডাবল কলামের ছবি খুব কম ছাপা হয়। দুই একটা news paper এর বাইরে। মানে news paper যে একবারেই ছাপেনা তা কিন্তু না। অবশ্যই তারা ছাপে এবং তখন এগুলো দেখতেও ভালো লাগে। পুরো পত্রিকার যে মানটা সেটাকেই তুলে দেয় ঐ ছবিটা। তখন দেখা যায় একটা ছবির কারণে পত্রিকার get up এবং make up টাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পত্রিকা হাতে নিলে মনে হবে একটা কিছু হাতে নিয়েছি। প্রতিদিন মানুষ যে ধরণের ছবি দেখে এর বাইরে একটা different type ছবি একটা different news করা ছবি, সেটি যদি একটু বড় করে ছাপা হয় মানুষের চোখেরও একটু relax হয়। আমরা ছোট ছোট লেখা দেখে অভ্যস্ত, একটা বড় ছবি ছাপলে চোখেরও একটু শান্তি আসে।

মোহাম্মদ রাসেল : অনেক মতে ফটোসাংবাদিকতা ঝুঁকির পেশা। অনেক সময় সংঘর্ষের মধ্যে কাজ করতে হয়। আপনার মতে কতটা ঝুঁকি আছে এই পেশায়?

এস এম গোর্কি: সব জায়গায় ঝুঁকি আছে। ঘর থেকে বের হওয়াটাই তো ঝুঁকি। আল্লাহ মাফ করুক আমরা যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পড়তে পারি। ফটোজার্নালিজম হচ্ছে একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। ধরো একটা জায়গায় গোলাগুলি হচ্ছে, টিয়ারশেল নিক্ষেপ হচ্ছে তখন তুমি একটি জিনিস দেখবে মানুষ দৌড়ে পালায়। ফটোসাংবাদিকরা ঠিক বিপরীত। মানুষ ঐ জায়গাটা থেকে বাঁচার জন্য যত স্পিডে বের হচ্ছে ফটোসাংবাদিকরা কিন্তু তার দ্বিগুন স্পিডে ভিতরে ঢুকছে। তারা নিজের জীবন তখন আর দেখে না, দেখে একটা ভালো ছবি আর একটা ভালো নিউজ। সবাই চিন্তা করে আমি কত ভালো একটা ছবি তুলতে পারব এবং কত ভালো একটা ছবি তুলে আমার পত্রিকাকে highlights করতে পারব। তখন অটোমেটিক নিজের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জিং ভাব চলে আসে। এটা স্বাভাবিক, ক্যামেরাটা হাতে নিলে তুমি বুঝবে। মনে কর এক জায়গায় সংঘর্ষ হচ্ছে, ধর, সেখানে গ্রেনেড হামলা হচ্ছে, গোলাগুলি হচ্ছে, টিয়ারশেল নিক্ষেপ হচ্ছে। সেখানে ঐ এলাকায় যে লোকগুলো থাকে তারা কি করছে? একটা বিল্ডিং-এ আগুন লাগছে, সে বিল্ডিং থেকে সবাই কিন্তু বের হয়ে যাবে। আশে পাশের লোকজন কিন্তু বের হয়ে চলে আসবে। আর ফটোজার্নালিস্টরা দ্বিগুন গতিতে ভিতরে ঢুকে যায় ছবি তোলায় জন্য। ঝুঁকি থাকবেই, ঝুঁকি নিতে না জানলে এই প্রফেশনে না আসাই ভালো। কেউ যদি মনে করে “ভাই আমি ঝুঁকি নেব না” তাহলে তাকে বলব এ প্রফেশনে না আসাই ভালো। আর কেউ যদি মনে করে এটাই তো আমার জীবন তাহলে এ পেশায় স্বাগতম।

মোহাম্মদ রাসেল : ফটোজার্নালিজমে আসলে তাহলে চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে..

এস এম গোর্কি: চ্যালেঞ্জটা তো আমার জন্য, তাহলে আমি কেন নেবোনা। আমি তাদের বলব most welcome। যাদের সাহস

আছে, যাদের এগিয়ে যাবার শক্তি আছে, যাদের কিছু করার সাহসী মনোভাব আছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত শক্তি আছে আমার মনে হয় তারা এই পেশায় আসুক। আর যদি লোককে দেখানোর জন্য যে আমি একজন ফটোসাংবাদিক কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরি তাহলে আমি সাংবাদিকতায় আসার দরকার নাই। সে আর্ট ফটোগ্রাফী করুক বা অন্য কোনো ফটোগ্রাফী করুক।

মোহাম্মদ রাসেল : ফটোজার্নালিজমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনো সংকট কি আপনার চোখে পড়ে?

এস এম গোর্কি : সংকট আমরা এখন অনেকটা উৎরে গেছি। সংকটের যে জায়গাটা ছিল তা এখন আর নেই আর নেই। নাই বলতে তার পরও তো কম বেশী থাকবে। ফটোসাংবাদিকতার সংকট থাকবেই। এগুলো নিয়েই আমাদের দিবা-রাত্রি। তারপরও এর মধ্যে থেকে আমাদের কাজ বের করতে হবে। দুর্বীর গতিতে আমাদের ছুটে চলতে হবে। আমি এভাবেই দেখি। সংকট কিছু থাকবেই।
হেমেন : আমি যে পরিমাণ ঝুঁকি নেই সেই পরিমাণ আমার অফিস সাপোর্ট দেয় কিনা। অন্য কোন অফিস সাপোর্ট দেয় কিনা। আমার পত্রিকা অফিস অবশ্যই সাপোর্ট দেয় কিন্তু সব পত্রিকা অফিস সাপোর্ট দেয় বলে আমার মনে হয় না। আমি মনে করি এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে অফিস থেকে একজন ফটোসাংবাদিককে একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট দেয়া দরকার। অন্তত ভালো হেলমেট দেয়া দরকার। একটা ভালো leg guard দেয়া উচিত। যেন সে অনায়াসে গভগোলের ভিতরে ঢুকতে পারে। আমরা আমাদের বলি শরীর আর ক্যামেরাটা নিয়ে দৌড়াচ্ছি। এদিক দিয়ে ইট আমার মাথায় আর পুলিশের লাঠি আমার পিঠে। অফিসের ক্যামেরাটা আর বাবা মা'র দেয়া নিজের জানটা নিয়ে আমরা দৌড়াই। আমার কাছে মনে হয় অফিসের এই সাপোর্টগুলো যদি দেয়া যেতে পারে তাহলে ফটোসাংবাদিকদের কাজের উৎসাহ আরো বাড়বে। আরো তারা এগিয়ে যাবে। তখন তার নিরাপত্তা নিয়ে অবকাশটা আরো কমে যাবে। একজন ফটোজার্নালিস্ট একটি বাড়ি খাবার পড়ে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। যখন তার কাছে এতো কিছু থাকবে। একটা, দুটা, পাঁচটা বাড়ি পিঠে পড়লেও তার এটা কিছু মনে হবে না। বরং সে আরো ভেতরে গিয়ে আরো ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে। এটা আমার বিশ্বাস।

মোহাম্মদ রাসেল : তাহলে আপনি বলছেন আমাদের এই সাপোর্টটা ঠিকমত নেই?

এস এম গোর্কি : অনেক পত্রিকাতেই নেই।

মোহাম্মদ রাসেল : তাহলে বলা যায় অধিকাংশ মিডিয়াতেই প্রয়োজনীয় সাপোর্ট নেই?

এস এম গোর্কি : যুগান্তর, প্রথম আলো, the Dailt star, The new age ইত্যাদিতে আছে। বড় বড় যে নিউজ পেপার গুলো এগুলোতে সাপোর্ট আছে। কিন্তু অন্যান্য news paper -এ একটু কম। অনেক পত্রিকায় সুযোগ নাই বললেই চলে।

মোহাম্মদ রাসেল : আপনি আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু বলবেন?

এস এম গোর্কি : আমি সর্বপ্রথম কাজ করি ঘরোমি নামে একটা পাক্ষিক পত্রিকায়।

মোহাম্মদ রাসেল : কত সালের দিকে?

এস এম গোর্কি : সেটা ৮৮-৮৯ সময়কার। তার পর আমি দৈনিক পত্রিকায় কাজ শুরু করি। নব্বইয়ের শেষ বা একনব্বইয়ের শুরুতে এম মূসা সাহেবের একটা দৈনিক পত্রিকা ছিল। the news day। ইংরেজী দৈনিক। তারপর the news day বন্ধ হয়ে যাবার পর আমি চলে আসি ভোরের কাগজে। ভোরের কাগজে কাজ করি কিছু দিন। ভোরের কাগজে কাজ করার পর সেখান থেকে আবার চলে আসি আল-আমিনে। সেখান থেকে ৯৭-এ আমি চলে আসি মুক্তকণ্ঠে। মুক্তকণ্ঠ থেকে ১৯৯৯-এর অক্টোবরে আমি

সাক্ষাৎকার

যুগান্তরে যোগ দেই। এখন যুগান্তরের চিফ ফটোগ্রাফার হিসেবে আছি।

মোহাম্মদ রাসেল : অনেক তো অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষ করে স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনের সময়কার। দুই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

এস এম গোর্কি : অভিজ্ঞতার তো শেষ নাই। গ্রেনেড হামলার কথা বলি। সে সময় ট্রাকের উপর আমি সহ অনেক ফটো সাংবাদিক ছিল। অনেক ফটোসাংবাদিক কিন্তু সে সময় আহত হয়েছিল।

মোহাম্মদ রাসেল : সে সময় আপনি নিজেও তো আহত হয়েছিলেন?

এস এম গোর্কি : হ্যাঁ আমিও আহত হয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার কি আর কোনো শেষ আছে। আর আফসোসের কি শেষ আছে। অনেক ভালো ছবি চোখের সামনে দিয়ে গেছে ভুলতে পারিনি। সিডরের সময় একটা ঘটনা বলি। সিডরের সময় আমি পটুয়াখালির কলাপাড়ায় দেখি একটা ব্রিজে প্রচুর লোক ত্রাণ নেবার জন্য জমা হয়েছে। যে ট্রাকটা থেকে ত্রাণ দেয়া হবে আমি সে ট্রাকটাতে উঠে লম্বা ভিড়ের একটা ছবি তুললাম। ছবি তুলে চিন্তা করলাম একটু নিচ থেকে নেই। ব্রিজটা এতো চমৎকার লাগছিল মনে হচ্ছিল একটা rainbow curve করা ছিল। এবং দূর থেকে লোকজনের জামা কাপড় দেখে মনে হচ্ছিল এটা একটা রংধনু। ঐরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে নিচে যাচ্ছিলাম ছবিটা তুলতে। ট্রাক থেকে নামার সময় যখন একটা পা ডালাতে এবং একটা পা মাটিতে তখন দেখি বুম করে একটি আওয়াজ। কি ব্যাপার কি হল? পেছনে তাকিয়ে দেখি যে ব্রিজের ছবি আমি একটু আগে তুলেছি সে ব্রিজটাও নাই লোকগুলোও নাই। ব্রিজটা ভেঙে নিচে পড়ে গেছে। কি মিস্টা হলো! আমার ওই মিস্টা আমি জীবনও ভুলবো না।

মোহাম্মদ রাসেল : ঐ দুর্ঘটনায় সবাই কি মারা গিয়েছিল?

এস এম গোর্কি : দুই জন বা তিন জন মারা গেছে। স্ল্যাপটা যার উপর পড়ছিল সে মারা গেছে। ঐসব এলাকার সবাই সাঁতার জানে। সবাই সাঁতরে উঠেছে। কিন্তু আমরা যারা ঢাকা শহরে থাকি আমরা গেলে হয়তো আর একটু চিন্তা ভাবনার ব্যাপার ছিল। আমরা শহরের মানুষ। তো ধর আমি যদি সেসময় নিচে যেতে পারতাম। নিচে গেলে কি ছবি হত, উপরের ট্রাক থেকে যদি আমি না নামতাম তাহলে কি ছবি হত? একবার ভাব। তো এই মিস্টা আমার সারা জীবনই ভোগাবে। যতদিন আমি বেচে থাকব সারাক্ষণ এটা আমাকে উইপোকাকার মত কামড়াতে থাকবে।

মোহাম্মদ রাসেল : আপনি যেটা বললেন। গ্রেনেড হামলার ব্যাপারটা...

এস এম গোর্কি : গ্রেনেড হামলার সময় অনেক ফটোসাংবাদিক ওখানে ছিলাম। সবাই কিন্তু যার যার মত নিরাপদ দিকে চলে গিয়েছিলাম। রক্তাক্ত মানুষ যে এখানে পড়ে ছিল সেখানে গ্রেনেডও ছিল। সে গ্রেনেডের ছবি কিন্তু শুয়ে শুয়ে অনেকেই তুলতেছিল। গ্রেনেডের পিন আছে কি নাই। কখন ব্লাস্ট করবে তারা কিন্তু জানে না। তারপরও কিন্তু গ্রেনেডের ছবি তুলছে। অনেক পিন খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তারপরও কিন্তু ফটো সাংবাদিকরা অকুতোভয় সৈনিকদের মত ছবি তুলে গেছে। তারা নিজের জীবনের পরোয়া করে নাই। ঐটা ব্লাস্ট করলে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে এবং উনি বাঁচবেন কিনা সেটার কোনো নিশ্চয়তা নাই। একটা গ্রেনেড চার্জ হবার পর তো লোকজন মারাই যায়। তারপরও কিন্তু ফটোসাংবাদিকরা তার প্রফেশন ঠিকই পালন করে গেছে।

মোহাম্মদ রাসেল : আপনি তো পি.এম অফিসে আছেন। কি হিসেবে আছেন?

এস এম গোর্কি : বাংলাদেশের ইতিহাসে আমি প্রথম ফটোসাংবাদিক যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটাচমেন্ট হিসেবে আছি।

আমার আগে আর কোনো ফটোসাংবাদিক ওখানে কাজ করেন নি। ওখানে প্রেসিংয়ে যারা কাজ করেন সাধারণত তারা BSS, UNV, BTV, RADIO, DEP পাঁচটা মিডিয়ার লোকজন ঐখানে Attachment হিসেবে কাজ করতেন। আর বাহিরের কোন ফটো সাংবাদিক ঐখানে কাজ করতেন না। আমি বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক যিনি কোনো পত্রিকার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন আমেরিকায় state guest হিসেবে দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আমি হোয়াইট হাউসের ভেতরেও প্রোগ্রাম কাভার করে এসেছি।

মোহাম্মদ রাসেল : হোয়াইট হাউসে কি সব ফটোসাংবাদিক ঢুকতে পারে?

এস এম গোর্কি: না। অনুমতি পাওয়া মুশকিল। পত্রিকা থেকে একজন state guest হিসেবে যাওয়া বিশাল সম্মানের ব্যাপার। state guest হিসেবে কিন্তু খুব কম রাষ্ট্র প্রধানই আমাদের দেশ থেকে গেছেন।

মোহাম্মদ রাসেল : প্রাইম মিনিস্টার অফিসের কাজগুলো সাধারণত কোন ধরনের ?

এস এম গোর্কি: pmo মানে হচ্ছে prime minister office এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কাজগুলো হয় তার প্রেস এই কাজগুলো করেও মূলত। কারো সাথে মিটিং করা বা কোনো সভাসমাবেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কাজগুলো করেন সে গুলো কাভার করে নিউজ করাটা এবং ফটো সাপ্লাই দেওয়াটাই আসল কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে শৈশবে কবি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন শাহাদাত পারভেজ। প্রকৃতির অপূর্ণ সৌন্দর্য ও নদীবিধৌত সরল মাটির গন্ধে বড় হয়েছেন। কৈশোরে শুরু করেন সাংবাদিকতা। এখন পুরোনো ফটোসাংবাদিক। লেখালেখিও করেন সমান তালে। কাজ করছেন প্রথম আলোর সিনিয়র ফটোসাংবাদিক হিসেবে। ছবি তুলে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নানা পুরস্কার। বাংলাদেশ ও আলোকচিত্র সাংবাদিকতা নিয়ে চিত্রসাংবাদিক শাহাদাত পারভেজের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ইমতিয়াজ-আল-তারেক।

তারেক : এত পেশা থাকতে ফটোসাংবাদিক হলেন কেন?

শাহাদাত পারভেজ : কবি হওয়ার স্বপ্ন ছিল শৈশবে। কিন্তু সামাজিক অসংগতি ও বৈষম্যগুলো চোখে পড়তে শুরু করল কৈশোরেই। এসবের পরিবর্তন খুঁজতে গিয়ে শুরু করলাম লেখালেখি। একসময় মনে হলো, প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কলম যতটা না শক্তিশালী, তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ক্যামেরা। অনেকের ধারণা, কেউ যখন আর কোনো কাজ পায় না, তখন ধরে ক্যামেরা। ক্যামেরা বিধানে আমার যে জ্ঞান, তা আমি কাজে লাগাতে চাই মানুষের কল্যাণে। ফটোগ্রাফি আমার কাছে শুধু শখে ছবি তোলা নয়, এটি সামাজিক সচেতনতার এক বিশাল মাধ্যম। অনেক পেশায় যাওয়ার সুযোগ থাকার পরও মনে হয়েছে এটিই আমার যথার্থ কাজ। পরিবর্তনের জন্য একটি ছবির মধ্যে যতগুলো উপস্থাপনা থাকে, তার সবই আমাকে আলোকচিত্রী হতে বাধ্য করেছে।

তারেক : আপনার ফটোগ্রাফির শুরুটা শুনতে চাই।

শাহাদাত পারভেজ : ১৯৯১ সালের কথা। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। কবিতা লিখতে লিখতে জড়িয়ে পড়ি মফস্বল সাংবাদিকতায়। মফস্বল সাংবাদিকদের লেখা এবং ছবি তোলা দুটোই একসঙ্গে করতে হয়। কিন্তু আমার কোনো ক্যামেরা নেই। ফুফাতো ভাই আবু তালেব তাঁর পুরোনো ফিল্ম ফোকাস কনিকা ক্যামেরাটি কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করতে দিলেন। ক্যামেরা হাতে পেয়ে গাছ-মাছ, ফুল-পাখি, শিশু-নারী, নদী-প্রকৃতি কিছুই আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারে না। স্কুলের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে বিশ টাকা জমাতে পারলেই সাদাকালো রিভার ফিল্ম কিনে নিজের মতো করে এসবের ছবি তুলি। আর এগুলো প্রিন্ট করতে যাই গ্রামের বাজারের বর্ণালী স্টুডিওতে। কিছুদিনের মধ্যে স্টুডিওর মালিক পলেন দাসের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। পলেনদা-ই আমাকে ফিল্ম ডেভেলপ ও ছবি প্রিন্ট শিখিয়েছেন। ছবি তোলার হাতেখড়িও তাঁর কাছে। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফটোগ্রাফি শিখতে ভর্তি হই চঞ্চল মাহমুদ স্কুল অব ফটোগ্রাফিতে। পরে পাঠশালা-‘দ্য সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি’ থেকে ফটোসাংবাদিকতায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিই। ১৯৯১ সালের জুন থেকে ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নয় বছর আমার নিজের কোনো ক্যামেরা ছিল না। কখনো পলেনদার পেনটেক্স কে থাউজেন্ড ক্যামেরা কিংবা কখনো বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা ক্যামেরা ছবি তুলতাম। বেসিক প্রশিক্ষণের পর বাবাকে ক্যামেরা কিনে দিতে বলি। ক্যামেরা কেনার মতো যথেষ্ট টাকা তখন বাবার হাতে ছিল না। মায়ের অনুরোধ এবং আলোকচিত্রী চঞ্চল মাহমুদের পরামর্শে বাবা তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ৭০ হাজার টাকা তুলে একটি নাইকন এফএম-টু ক্যামেরা, দুটি লেন্স ও ফ্যাশগান কিনে দিলেন। সেই শুরু...

তারেক : বিপন্ন ও বঞ্চিত মানুষের চিত্র ক্যামেরায় ধারণ করতে আপনার কেমন লাগে?

শাহাদাত পারভেজ : আমার কেমন লাগে, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। আমি নিতান্তই একজন আলোকচিত্রী। সংবাদচিত্র ধারণ করা

আমার প্রধান কাজ। আমি চাই না, পাঠক আমার ব্যাপারে কৌতূহলী হোক। আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করুক। আমি চাই না, আমার তোলা ছবি দেখে কেউ বলুক, 'বাহ, কী সুন্দর কম্পোজিশন কিংবা কত সুনিপুণ আলোর ব্যবহার।' আমি চাই, আমার তোলা ছবি মানুষের প্রাতিহিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠুক। সমাজের ভেতর একটা নাড়াচাড়া দিক। ছবির মানুষদের (যাদের ছবি আমি তুলি) বোঝার চেষ্টা করুক পাঠক। তাদের এক্সপ্রেশন, হাহাকার, দুঃখবোধ, অসহায়ত্ব বোঝার চেষ্টা করলেই একজন আলোকচিত্রীকে বুঝতে পারা সহজ হবে। কতটা কষ্ট কিংবা দুঃখবোধের ভেতর দিয়ে ছবিগুলো তোলা হয়েছে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এসব ঘটনায় আমি যেসব মানুষের ছবি তুলি, তাদের কষ্টের চেয়ে আমার কষ্ট নেহাতই নগণ্য।

তারেক : ব্যক্তি ও আলোকচিত্রী-এই দুইয়ের মধ্যে কি কখনো সংঘাত হয়?

শাহাদাত পারভেজ : প্রথমত আমি মানুষ আর পেশাগতভাবে আলোকচিত্রী। বিভিন্ন ঘটনায় আমাকে ছবি তুলতে যেতে হয়। কোনো মানবিক ঘটনায় ছবি তুলতে গিয়ে যখন দেখি সেখানে আমি ছাড়া আর কোনো আলোকচিত্রী নেই, তখন আমি কয়েকটি ছবি তুলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। যখন আমি নিশ্চিত, আমার কোনো চেষ্টা ঘটনার মোর ঘুরিয়ে দিতে পারে, তখন আমি ক্যামেরা নামিয়ে ফেলি। আমি তখন ঘটনার শেষ দেখতে চাই না। কারণ, আমি যা তুলেছি, তা আমার কাছে এক্সকুসিভ, পাঠকের কাছে তো বটেই। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা আছে, যেখানে অনেক আলোকচিত্রী থাকেন। সেখানে ছবি তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কে ভালো ছবি তুললেন, কার এক্সেল ভালো হলো ইত্যাদি। এসব ঘটনায় আলোকচিত্রীরা ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবি তোলার চেষ্টা করেন। সেখানে পেশাগত দায়িত্বটা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। পেশাগত দায়িত্বের কাছে মানবতা শব্দটা তখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ।

তারেক : আপনার তোলা সংবাদচিত্র মানুষকে বেশ নাড়া দেয়। বিশেষ করে সহিংসতার ছবিগুলো। আবার কিছু কিছু ছবি খুবই নান্দনিক। একজন শিল্পীর মধ্যে এ রকম দ্বৈতসত্তার কীভাবে কাজ করে জানতে চাই।

শাহাদাত পারভেজ : কেউ ছবি তোলেন হৃদয় দিয়ে, আবার কেউ তোলেন মাথা খাটিয়ে। আমাদের দেশে নানা সময়ে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্রে অহরহ এসব ঘটনার ছবি ছাপা হয়ে থাকে। এসব ঘটনায় সংবাদচিত্রী থাকেন ঘটনাস্থলে; কিন্তু ছবিতে তাকে দেখা যায় না। ঘটনার নীরব সাক্ষী তিনি। এসব ঘটনায় সংবাদচিত্রীরা পাঠক, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে অনেক বেশি দায়বদ্ধ। যদিও পুরো ঘটনা দেখানোর সুযোগ নেই আলোকচিত্র সাংবাদিকতায়। তাই পুরো ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এমন এক বা একাধিক ছবি ছাপা হয় দৈনিকে। পাঠক আসলে ছবির মধ্যে দেখতে চায় প্রকৃত ঘটনা। ফলে একজন দায়িত্বশীল আলোকচিত্রীর প্রধান কাজ হচ্ছে সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা এবং প্রতিনিধিত্বশীল চিত্র উপস্থাপন করা। ঘটনা ভয়াবহ হলে ছবির উপস্থাপনাও ভয়াবহ হয়। আমার ধারণা, এ রকম ছবি পাঠকের ভালো লাগে না। তাই আমার ভাবনাগুলো চিত্রাকারে শান্তির নীলিমার খোঁজে অশান্তির দেশে। অর্থাৎ ইতিবাচক ছবি তুলতে চাই। আমার এই ভাবনায় আমি পুরোপুরি স্বাধীন। ফলে এই ভাবনাগুলো মানুষের কাছে অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ মনে হয়।

তারেক : কাদের কাজ দেখে আপনি ফটোগ্রাফিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন?

শাহাদাত পারভেজ : আনোয়ার হোসেনের ফটো অ্যালবাম ওমেন প্রথম দেখেই বিমোহিত হয়েছিলাম। নওয়াজেশ আহমেদ, নাইবউদ্দিন আহমেদের ছবি আমার জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ছেলেবেলায় মোহাম্মদ আলম ও রশীদ তালুকদারের ছবি দেখতাম ইণ্ডোফাকে। পাভেল রহমানের সংবাদচিত্র দেখে বিস্মিত হতাম। নাসির আলী মামুনের তোলা প্রতিকৃতিতে আলো-ছায়ার ব্যবহার বিস্ময়কর। শফিকুল ইসলাম কিরণের এসিডদগ্ধ নারীদের ছবি আমাদের মানবিক বোধকে নাড়া দেয়। আবীর আবদুল্লাহর

ছবি ভালো লাগে।

তারেক : একজন আলোকচিত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

শাহাদাত পারভেজ : ক্যামেরা, কলম ও নোট প্যাড মানুষকে ডমিনেট করতে পারে। মানুষের মনোজগতে প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা সব সময় ছবির মানুষদের আমাদের মতো উপস্থাপন করতে চাই। অথচ ছবির মানুষেরা আমাদের ক্যামেরায় কীভাবে উপস্থাপিত হতে চায়, সেটা অনেক সময় ভেবে দেখি না। আমি যখন শিশুদের ছবি তুলি, তখন দাঁড়িয়ে তুলি না, বসে যাই। কারণ, শিশু ও আমার উচ্চতা এক নয়। ফটোগ্রাফি আমার পেশা। আর পেশা মানেই পবিত্রতা। আমরা শিশুদের ভালোবাসি। কারণ, আমরা শিশু ছিলাম কিংবা আমাদের সবার ঘরেই শিশু আছে। শিশুদের ছবি তোলার সময়ও সম্মান দিয়ে তোলা উচিত। আমি যখন হিজড়াদের ছবি তুলি, তখন স্কাই আই এঙ্গেলে তোলার চেষ্টা করি। কারণ, এদের সবাই দেখে বার্ডস আই এঙ্গেলে। এরা সমাজে উপেক্ষিত বলেই এই ভিন্নতা। একজন আলোকচিত্রীর সঙ্গে অন্য দশজনের যে মৌলিক পার্থক্য, সেটি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভাজন কমায়, দূরত্ব কমায়। একজন আলোকচিত্রীর মূল কাজ হচ্ছে মানুষকে পড়তে পারা, বুঝতে পারা এবং তার ভাবনাগুলো মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।

তারেক : ফটোসাংবাদিকতা এবং ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি কোন মাধ্যমে কাজ করতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

শাহাদাত পারভেজ : পেশাদার ফটোসাংবাদিক হিসেবে আমাকে প্রতিদিনের ঘটনার ছবি তুলতে হয়। ফটোসাংবাদিকেরা কোনো কোনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকেন। কাজটা চ্যালেঞ্জিং, প্রতিদিনই দতার পরিচয় দিতে হয়। অনেক সময় ফটোসাংবাদিকেরা অ্যাসাইনমেন্টের চাপে মৌলিক কাজ করার সুযোগ পান না। তবে ফটোসাংবাদিকতা বলেন আর ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বলেন, সবকিছুর জন্যই দরকার ভিন্ন চোখ, ভিন্ন কিছু দেখতে পাওয়া। যা সবাই দেখতে পায়, তা আলোকচিত্রীর দেখার বিষয় হতে পারে না। একজন আলোকচিত্রী একটা দৃশ্য ভিন্নভাবে দেখবেন, এটাই স্বাভাবিক। ফটোসাংবাদিকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় দ্রুত। মুহূর্তেই ছবি তুলতে হয়। তা না হলে ঘটনা মিস হয়ে যেতে পারে। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফিতে ভাবনাচিন্তার জন্য অনেক সময় পাওয়া যায়। এর জন্য দরকার গবেষণা ও ব্যাপক পড়াশোনা। একজন আলোকচিত্রী ভাববেন বেশি, ছবি তুলবেন কম সময়। ছবি হচ্ছে আলোকচিত্রীর ভাবনার রিফ্লেকশন। ডকুমেন্টারি প্রকল্পটা যদি এক মাসের হয়, তাহলে তিন সপ্তাহ ভেবেচিন্তে এক সপ্তাহ ছবি তোলা উচিত। সংবাদ আলোকচিত্রও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডকুমেন্টারি ফটো হিসেবে স্বীকৃত হয়। ফটোসাংবাদিকতা পেশা হলেও ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করি। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বিষয়বস্তুর একেবারে কাছাকাছি নিয়ে যায় আলোকচিত্রীকে।

তারেক : এই পেশায় আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

শাহাদাত পারভেজ : আমাদের দেশের শিল্পকলায় আলোকচিত্র বিভাগ নেই। আলোকচিত্রের জন্য আলাদা কোনো ফ্যাকাল্টি অথবা ইনস্টিটিউট নেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোতেও আলোকচিত্র সম্পাদকের কোনো পদ নেই। যে পেশার গুরুত্ব এত বেশি, সে পেশার রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি নেই। এসবের বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন।

তারেক : নতুনদের স্বাগত জানাতে চান কীভাবে?

শাহাদাত পারভেজ : ফটোগ্রাফি একটি সৃজনশীল পেশা। সৃজনশীল মানুষ ছাড়া যে কেউ এ পেশায় আসতে সাহস পায় না। যেকোনো অন্যান্য, অবিচার, দুর্নীতি, শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সবচেয়ে সাবলীল ভাষা হচ্ছে ছবি। তাই মেধাবী,

সাক্ষাৎকার

শিক্ষিত ও স্মার্ট তরুণ-তরুণীদের এ পেশায় আসা উচিত। আমি সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের ফটোগ্রাফি শিখিয়ে অতৃপ্তি অনুভব করি। আমি শুধু শিক্ষাই দিই না, এদের জীবন থেকে অর্জন করি অনেক কিছু।

তারেক : একজন আলোকচিত্রী সমাজের কাছে কতটা দায়বদ্ধ?

শাহাদাত পারভেজ : যিনি ছবি তোলেন, তিনি কিন্তু ওই ছবির মধ্যে আছেন। তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু ঘটনার সময় তিনি সেখানে ছিলেন। ঘটনার সাক্ষী তিনি। তাঁর পরিবেশিত ছবি ওই ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের দেশে হরতালের সময় সংবাদপত্রে অনেক ছবি ছাপা হয়। ছবি নিয়ে বিতর্কও হয়। বিতর্ক যা-ই হোক, একজন দায়বদ্ধ আলোকচিত্রী ঘটনা যেভাবে দেখেছেন, তিনি সেভাবেই তাঁর ছবি উপস্থাপন ও প্রকাশ করতে চান।

দুই ভুবনের কারিগর:
স্টুডিওর বিদায়, ক্যামেরার বাজার আর আলোকচিত্রের “শিল্প” চর্চা
ড. মানস কুমার চৌধুরী

একা।

এটা এমন এক সময় যখন বাজারের বিষয়ে প্রায় কোনো সমালোচনা করা যায় না। যদি বাজার নিয়ে কোনো সমালোচনা করে ফেলেন আপনি তাহলে প্রথম অভিযোগটাই উঠবে আপনি বড় অবাস্তব এক মানুষ, চারিপাশের দুনিয়া নিয়ে কোনো রকম হালনাগাদ বোধবুদ্ধি রাখেন না। যদি এই অভিযোগ গুরুতরভাবে না তোলেন অপরপ তাহলে অবশ্যই আপনাকে ‘তাত্ত্বিক’ হিসেবে গালি শুনতে হবে। কিংবা চুলজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি হয়তো ‘আঁতেল’ বলেই আলোচনার ইতি টেনে দেবেন আপনার অপরপ। তবে শুধু যে এসব ভয়েই লোকজন বাজারের সমালোচনা করেন না তা অবশ্য নয়। বাজারের ক্রমাগত প্রশ্নাতীত একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে অনেকগুলো কারণেই। খোদ বাজারের শক্তিই একটা কারণ নিশ্চয়ই। মার্জ্বাদী আলাপচারিতার পরিমন্ডলও যে ক্রমাগত কমে আসছে সেটাও একটা রুঢ় বাস্তবতা। কিন্তু সবচেয়ে বিবর্তকর দিকটি হলো আপনি বাজারের সমালোচনা করছেন মানে যেন আপনি কোনো পণ্য ব্যবহার করবার অধিকারও হারিয়ে ফেললেন এই সমালোচনার মাধ্যমে। এত শক্তিশালীভাবে বাজার মানুষের মস্তিষ্ক আর সাধারণ-বোধবুদ্ধির মধ্যে ঢুকে বসে আছে যে বড় বাজার আর ছোট বাজারের মধ্যকার পার্থক্যটাও মানুষজন ভুলতে বসেছেন।

আলোকচিত্র নিয়ে কথা বলতে বসে বাজার নিয়ে আলাপ করা প্রায় ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার মতো লাগতে পারে, কিন্তু ক্যামেরার সুবিশাল বাজার নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া সাম্প্রতিক কালের আলোকচিত্র উৎপাদন বোঝা অসম্ভব একটা প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করি আমি। ঠিক এখানটাতে এসে ভাবছিলাম যে আলোকচিত্রের বাজার ও নানাবিধ এজেন্সির ভূমিকা ক্যামেরার বাজারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কিনা। নিজ গুণে ভীষণ জরুরি সেই আলাপ। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্যামেরার ক্ষীণ বাজার হচ্ছে আমার আগ্রহের জায়গা। বাজারটি ভীষণ ক্ষীণ, শক্তিশালী, উন্নত প্রযুক্তির ঘোষণাবাহী। এর শক্তিমত্তা এতটাই যে আলোকচিত্রীকে নৈমিত্তিক চাপে রাখতে পারে তাঁর ক্যামেরাটির অনাধুনিকতা নিয়ে। আগের বহুমূল্য ক্যামেরাটিতে হাত পাকিয়ে উঠতে না উঠতেই বহুবর্ণ কোনো বিজ্ঞাপনে তিনি জেনে গেছেন যে এই যন্ত্রটিও অপেক্ষাকৃত পুরনো হয়ে গেছে। আরও সক্ষম ক্যামেরা এখন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই বার্তায় যে আলোকচিত্রী খুশি হয়ে উঠবেন এবং যে আলোকচিত্রী বিষণ্ণ হয়ে উঠবেন তাঁদের দুজনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ক্যামেরার মালিকানা নিয়ে এই অশান্তিটুকু খোদ এই মাধ্যমের চর্চাকারদের জন্য একটা নৈমিত্তিক বাস্তবতা। এই প্রসঙ্গে যে কেউ বলে বসতে পারেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রায় সবকিছুই নিত্যনতুন চালে হাজির হয় আর এর ব্যবহারকারীকে পুরনো বানিয়ে দেয়। কিন্তু কথা হচ্ছে আলোকচিত্র নিয়ে, আলোকচিত্রীর অনুশীলন নিয়ে। আলোকচিত্রীর কারিগরি দক্ষতার থেকে অনেক জোরাল বিষয় হিসেবে ক্যামেরা নামক পণ্যটির গুণাগুণ নিয়েই চারপাশে আলোচনা বেশি হচ্ছে। সেটা একটা সঙ্কট বলেই মনে করি আমি।

দুই।

আলোকচিত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ আজব। আরও নিশ্চিত করে বললে স্টুডিও ফোটোগ্রাফির সঙ্গে। শৈশবে আর পাঁচজন বাচ্চার মতোই উত্তেজিত থাকতাম ছবি তুলবার যেকোনো আয়োজনে। কিন্তু স্টুডিওতে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রায় রিমাণ্ডে যাওয়া একটা চেহারা তৈরি হয়ে যেতো আমার। সঙ্গে থাকা মা, বাবা কিংবা মামা কেউই সেই মৃতবৎ চেহারায়ে এতটুকু প্রাণ এনে দিতে পারতেন

না। এরপর খোদ ফোটোগ্রাফারের চেষ্টা-চরিত্র চলত অনেক ধরে। থুতনিতে হাত দিয়ে, গাল টিপে দিয়ে, চুল ঠিক করে দিয়ে তিনিও তোড়জোর চেষ্টা চালাতেন যেন আমি আরেকটু জীবন্ত আচরণ করি ক্যামেরার সামনে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফায়দা হতো না। তিনিও শেষমেশ ঠিক কীভাবে আমার ভাবদামারা অবস্থা কাটাবেন কিংবা ক্যামেরার ফিল্ম ঠিক কয়টা খরচ করবেন এসব বুঝতে না-পেরে কোনো একটা সময় বলে বসতেন “বাহ। এবার সুন্দর হয়েছে”। বলাইবাহুল্য, ফলে, আমার যে গুটিকয় ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল সেগুলোতে যে আমিকে দেখা যায় তাতে আমি একটুও খুশি নই। এই অবস্থা এত বছর পরও বিশেষ বদলায়নি। ফোটো-এ্যালবাম রাখার অভ্যাস আমার গড়ে ওঠেনি। এর নানান কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এ্যালবামে নিজের চেহারা ও ব্যক্তিত্বের এই হাল দেখানোর অনীহাও একটা কারণ কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

এই পুরো পরিস্থিতিটাই আমি নিউ মার্কেটের সেই আলোকচিত্রীকে বলেছিলাম যিনি ১৯৯১ সালে আমার একটি পাসপোর্ট মাপের ফোটো তুলে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের একটা পোস্টারের জন্য আমার চিরাচরিত ভাবদা চেহারা আমি দেখাতে চাইনি। তিনি সবটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার আশঙ্কা ছিল তিনি হাসবেন। তিনি আসলে হাসলেন না। আমাকে স্টুডিওর ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন যে কিছু সময় নেবেন এবং আমার ছবি নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তিনি আমাকে বসিয়ে পাউডার দিয়ে খানিকটা মুখ মেরামত করলেন। একদম নৈমিত্তিক ট্যালকম পাউডার। এরপর তাঁর স্টুডিওর বহুপ্রাচীন তেল ও ময়লামন্ডিত চিরুনিখানা দিয়ে আমার চুলও আঁচড়ে দিতে শুরু করলেন। ওই চিরুনিখানা আমার চুলে লাগাতে আমি যে বিশেষ আগ্রহী ছিলাম তা নয়। এমনকি আমার তখন পর্যন্ত টিকে-থাকা চুলে অন্য কারো কেশবিন্যাসও বিশেষ আগ্রহের ছিল না। কিন্তু আমি ম্যাজিশিয়ানের সহকারীর মতো মুখস্তভাবে তাঁর অনুগত হয়ে থাকলাম। ফোটো তোলা হয়ে গেলে মুখময় হাসি সমেত তিনি জানালেন এবারের ছবিখানা আমার পছন্দ হবে। সাদাকালো সেই পাসপোর্ট ছবির চার কপি আমি ৩দিন পর কিংবা হয়তো পরদিনই নিয়ে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টারে আমার যে ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ল আমি তাতে মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। সম্ভবত, বিশ্ববিদ্যালয়ের চির সরকার-অনুগামী ভোটারও। ফলে, এই ফোটোখানা আমি যে প্রথম পাসপোর্টেও ব্যবহার করেছিলাম তা সঙ্গতই। এরপর আমার যাবতীয় অফিসিয়াল ফোটো আবারও সেই মৃতবৎ ভাবদা আমিকে দিয়েই তৈরি হয়। ওভাবেই আমার ফোটোগ্রাফিক জীবন কাটছে। নিউ মার্কেটে গেলেও সেই আলোকচিত্রীকে আর খুঁজে পাব বলে মনে হয় না। তাঁর চেহারা আমার মনে নেই, কিংবা নামও। নাম কিংবা চেহারা মনে থাকলেও তিনি যে ওখানে থাকতেন তা আমার মনে হয় না।

তিনি॥

ঢাকা শহরে প্রথম আসবার পর গুলিস্তানের নগরভবনের সামনে লাইন দিয়ে যেসব টাইপিস্টদের দেখতাম তাঁদেরকেও আর দেখি না। কিংবা নীলতে এলাকাতেও তাঁরা ছিলেন। তাঁরা ছোট শহরগুলোর কোর্টপাড়াতে নিয়মিতই থাকতেন। এখনও ছোট শহরগুলোতে দুই একটা টাইপযন্ত্র সমেত দুয়েকজনকে বসে থাকতে দেখা দেয়। কোর্ট-কাচারির সঙ্গে নানাবিধ লেখালেখি থাকে। আর থাকে দলিল বা স্ট্যাম্প টাইপ করা। এঁদের তুলনায় স্টুডিও ফোটোগ্রাফারদের ভাগ্যবান মানতেই হবে। কিংবা বলা যেতে পারে লেটারপ্রেসের টাইপ সেট করতেন যাঁরা তাঁদের কথাও। পুরু একটা চশমা চোখে লাগিয়ে বছরের পর একই গতিতে একই রকম মনোযোগ দিয়ে দস্তায় বানানো ম্যাচের কাঠির থেকে একটু মোটা কাঠিগুলো কাঠের ফ্রেমে ভরে চলেছেন। এই দৃশ্য শৈশবে আমাদের ছাপাখানা নিয়ে নানান উত্তেজনার সবচেয়ে বড় মনুষ্য উপাদান। টাইপিস্টদের তবু ছোট শহরে এখনো দেখা যায়। সনাতনী ছাপাখানার সেসব লিপিকার কারিগরদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা পরে কীসব পেশায় গেছেন, আদৌ গেছেন কিনা কিংবা কেউ কেউ কম্পিউটারে তালিম নিয়ে নতুন করে ছাপার লিপিকার হয়েছিলেন কিনা সেসব নিয়ে আমার বিস্তর

কৌতুহল কাজ করে। কিন্তু ছাপোষা চাকরির বাইরে এসবের উত্তর খুঁজতে আর বের হওয়া হয় না পথে পথে। স্টুডিও ফোটোগ্রাফাররা অন্তত কোথাও হারিয়ে যাননি। অনেকেই আলোকচিত্রের দোকানখানা রেখেই কম্পিউটারে ফোটোশপ শিখে নিয়েছেন, রিটাচের আর কোনো দরকার নেই তাঁর জীবনে। কিংবা কোনো কম্পিউটার জানাশোনা কর্মচারিকে বসিয়ে দিয়েছেন দোকানের একাংশের মালিকানা সমেত। অথবা তিনি নিজেই হয়ে গেছেন কালার ফোটো ল্যাবের স্থানীয় প্রতিনিধি। ছবি ছাপিয়ে এনে কদিন পর গ্রাহককে সরবরাহ করে দিচ্ছেন। অথবা একটা ভিডিওগ্রাফারের সঙ্গে দল বেঁধে বিয়ে বা এরকম অনুষ্ঠানের কাজ পাবার চেষ্টা করছেন। অথবা এর সবগুলো মিলে মিশেই একটা প্রতিষ্ঠান হবার চেষ্টা করছে সাবেকি ফোটো স্টুডিও। কোনো সন্দেহ নেই যে যাঁর লগ্নি করবার সামর্থ্য যে রকম তিনি সেভাবেই টিকে আছেন; কিংবা নেই।

চার।

আলোকচিত্রের সঙ্গে আমার আজব সম্পর্ক এরপরেও বদলায়নি। আমি আর তেমন কাউকেই জানি না যিনি বছরের পর আলোকচিত্রের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কাজ করেছেন কিন্তু নিজে ছবি তোলেন না। ফোটোগ্রাফি তাঁর পেশা হোক বা নেশা, কিংবা একেবারেই আর পাঁচটা যোগাযোগ-হাতিয়ারের একটা, ক্যামেরা থাকেই আলোকচিত্রের শিক্ষকদের। আমি ক্যামেরা হাতে ধরলে প্রায় কবুতরের বাচ্চা ধরার মতো নার্ভাস থাকি। শৈশবের সেই ভ্যাবদামারা ভূমিকা বিশেষ বদলালো না, শুধু উপলক্ষ বদলালো। তারপরও বছর দশেক আগ পর্যন্ত, আলোকচিত্রীদের পড়ানোর প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত, মাঝে মাঝেই আমার পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফার হবার বাসনা দেখা দিত। একটা কারণ হয়তো এই যে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁদের অনুশীলনী ফোটোগ্রাফির নিয়মিত মডেল আমাকে বানিয়ে ফেলেছিলেন। বিশেষত একজন, বাসার পাশে সুলভ বিধায়, আমাকে ক'দিন পরপরই ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তখনো ঢাকায় ডিজিটাল ক্যামেরা এসে বসতে পারেনি, ২০০১-০২ এর কথা। ডজন কয়েক রীল তিনি অকাতরে আমাকে দিয়ে ভর্তি করেছেন। কী এক রহস্যে, হয়তো কৃতিত্বটা তাঁরই, আমার আর ক্যামেরার সামনের সেই ভ্যাবদামি পাথরসম আচরণ আর নেই। আমি যেন কিছুই হয়নি ধরনের আচরণ করতে পারি। স্থির আলোকচিত্রের সামনে একটা 'অভিনয়' তখন আমার রপ্ত হয়ে গেছে। আলোকচিত্রী হবার আগ্রহটা কেন দাঁড়ায়নি সেটা ব্যাখ্যা করা সমূহ কঠিন একটা ব্যাপার, বিশেষত এতদিন ধরে এই শাস্ত্রের আশপাশে থাকবার পর। নানান কিছুর মধ্যে ক্যামেরার বাজার নিজেই একটা কারণ। আর ক্যামেরা চালাচ্ছেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একত্রে বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল শ্রেণীকক্ষে। কিংবা যখন তাঁরা খোদ ছবিরই একটা বিষয়বস্তু বানাচ্ছেন আমাকে সেই পরিসরেরও নিজস্ব একটা উদ্বেজনা আছে। আমি ক্যামেরা ও ফোটোগ্রাফির সঙ্গে আমার এই নতুন সম্পর্কেই স্থিত হয়ে গেছিলাম। চৌকষ এবং মানানসই।

পাঁচ।

আলোকচিত্র "শিল্পচর্চা" কিনা কিংবা আলোকচিত্রী "শিল্পী" কিনা এ নিয়ে আলোকচিত্রী এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মানুষজনের মধ্যে বাদানুবাদটা অনেক আগে থেকেই। অনেক ঝইঝামেলা ডিঙিয়ে পাশ্চাত্যের অনেক বিদ্যায়তনে আলোকচিত্র একটা শাস্ত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তর্কটা এখন আর তেমন জীবন্ত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোকচিত্র বিষয়ক লেখাপড়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিল্পকলা কিংবা ললিতকলা বিষয়ের মধ্যে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার অংশ হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানের। সে যেটাই হোক না কেন, সাধারণ্যে আলোকচিত্রের এখনো নানানভাবে প্রমাণ দিতে হয় এর 'শাস্ত্রীয়' হতে পারা নিয়ে। বাংলাদেশে চিত্রটা পাশ্চাত্যের থেকেও কর্কশ। আলোকচিত্রীদের মনে তাই 'শিল্পী' হয়ে উঠবার আগ্রহ ও যন্ত্রণা দুটোই খুব প্রাসঙ্গিক। তারপরও সাম্প্রতিক বাংলাদেশে যে অবস্থাটা দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকগুলো বছরের অনেকগুলো মানুষের প্রচেষ্টার কারণে বদলানো। শুরুতে বেগ সাহেব

প্রবন্ধ

কিংবা আরও কিছু মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টার পর দৃক আলোকচিত্র গ্রহাণুরের জন্য ৮০'র শেষভাগে বাংলাদেশের আলোকচিত্রের পরিস্থিতি একদম বদলে দিয়েছে। এটা একটা স্বতন্ত্র আলাপ এবং স্বতন্ত্রভাবেই আলাপ হয়ে থাকে। ফলে, নতুনভাবে আলোকচিত্র মাধ্যমে যেসব নাগরিক মধ্যবিত্ত এসে কাজ করতে শুরু করছেন তাঁদের জন্য একটা তৈরি জমি রয়েছে। সেটা 'শিল্প' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য তিনি বিচলিত থাকুন কিংবা না থাকুন। শিল্পস্বীকৃতির জন্য এই আকৃতি বা পেরেশানি ছোট শহরের সেই স্টুডিওগুলোর আলোকচিত্রীদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু। কিংবা দেখা যায় না বড় শহরের এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট স্টুডিওগুলোর আলোকচিত্রীদেও মাঝেও। আগে দেখা যায়নি, কিংবা এখনও।

ছয়া

একভাবে খাপছাড়া কিছু ভাবনা নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম। কোথাও একটা অশান্তি ছিল, হয়তো বলবার মতো কিছু কথাও ছিল। সেগুলো খুব দানা বাঁধল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল যেসব সন্তানেরা আলোকচিত্র চর্চায় আসছেন তাঁদের শিল্পস্বীকৃতি কিংবা পেশাস্বীকৃতির ওই পেরেশানিটা অনেক কমে যাচ্ছে। কোনো একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার পুরস্কার কিংবা কর্মচুক্তি হলে তো কথাই নেই, এমনকি একদম হাতেখড়ির কালেও পেরেশানিটা কম হতে পারে। ক্রমাগত নতুন নতুন ক্যামেরা বাজারে আসছে। ঢাকার বাজারেও আসছে। কিংবা খরচ করলে আপনি বিদেশ থেকে আনিতে পারবেন যে কোনো একটা ক্যামেরা। যেকোনো সামর্থ্যের ক্যামেরা। যেকোনো দেশের উৎপাদিত ক্যামেরা। যেকোনো স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের ক্যামেরা। আরও সমর্থ ক্যামেরা আপনার হাতে। আরও আধুনিক ক্যামেরা আপনার হাতে। আরও দামী ক্যামেরা আপনার হাতে। গত কিছুকাল ঢাকায় আলোকচিত্র নিয়ে পাবলিক আলাপ-আলোচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকল ক্যামেরার জাতপাত। সনাতনী 'শিল্প'কলার সীমানার টেনশনটা এখন মুখ্য সঙ্কট নয়।

ক্যামেরা নিজেই একটা টিকেট। একটা ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি। সৃজনশীলতা ঘোষণার একটা ফ্রি-পাস।

এই নতুন পরিস্থিতিটাকে বিলীয়মান স্টুডিওর আলোকচিত্রীরা কীভাবে দেখেন তা জানতে হলেও আমার রাস্তায় ঘুরতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রিপ্রিজেন্টেশন

ড. ফাহিমদুল হক

রিপ্রিজেন্টেশন হলো ভাষাকে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাছে দুনিয়াকে অর্থপূর্ণভাবে বলা বা উপস্থাপন করা। এই ভাষা হতে পারে আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, পেইন্টিং ইত্যাদি। রিপ্রিজেন্টেশনের ধারণা সেই ভাষাকে এবং এর অর্থকে সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে। অর্থবহনকারী শব্দ, ধ্বনি ও ইমেজকে আমরা চিহ্ন (সাইন) নামক সাধারণ পরিভাষায় বর্ণনা করে থাকি। আমরা আমাদের মাথায় যেসব-ধারণা ও সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ধারণাগত সম্পর্ক নিয়ে ঘুরি-ফিরি, চিহ্ন সেগুলোকে রিপ্রিজেন্ট করে অথবা প্রতিনিধিত্ব করে এবং এগুলো একত্রে আমাদের সংস্কৃতির অর্থ-পদ্ধতি তৈরি করে। ট্রাফিক লাইটের যে লাল রঙ কিংবা হলুদ কিংবা সবুজ, সেই লাল-হলুদ-সবুজের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই: লাল মানে যেমন 'খামো' এবং সবুজ মানে 'যাও'। আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে লালের মানে 'খামা' এবং সবুজের মানে 'যাও'-কে সঙ্কেতাবদ্ধ (এনকোড) করে নিয়েছি। যেকোনো রিপ্রিজেন্টেশন তাই সাংস্কৃতিক। একটি বিজ্ঞাপনের চিত্র বা পোস্টারের তাই ওপরের নির্দেশিত অর্থ (ডিনোটোটিভ মিনিং) থাকে, আমরা যদি তার সঙ্গে লেপ্টে থাকা সাংস্কৃতিক সঙ্কেতলিপি বা কোডগুলোক আলাদা করতে পারি সঙ্কেতোদ্ঘাটনের (ডিকোড) মাধ্যমে, তবে সেই চিত্রের গূঢ়ার্থও (কনোটোটিভ মিনিং) বের করা সম্ভব। ফরাসি তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্থ (Roland Barthes) প্রবর্তিত পদ্ধতিতে আমরা এই কাজটি করতে পারি।



'মিথোলজিস' গ্রন্থের 'মিথ টুডে' প্রবন্ধে রোলাঁ বার্থ একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা সাংস্কৃতিক স্তরে রিপ্রিজেন্টেশন সত্যিকার অর্থে কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে আমাদের সহায়ক হয়। একদিন সেলুনে গিয়ে তিনি ফরাসি ম্যাগাজিন 'প্যারিস ম্যাচ'-এর প্রচ্ছদে দেখতে পান একজন তরুণ নিগ্রো ফরাসি ইউনিফর্ম পরে ওপরের দিকে তাকিয়ে স্যাঁলুট ঠুকছে, সম্ভবত সে তিনরঙা ফরাসি পতাকার দিকে তাকিয়ে ছিল। কোনো অর্থ পেতে চাইলে প্রথম স্তরে আমাদের ইমেজটির প্রতিটি দ্যোতককে (সিগনিফায়ার) যথাযথ ধারণায় সঙ্কেতোদ্ঘাটিত (ডিকোড) করতে হবে। এখানে দ্যোতকগুলো হলো সৈন্য, ইউনিফর্ম, স্যাঁলুট-ঠোকা হাত, ওপরে-তোলা চোখ, ফরাসী পতাকা। এই একপ্রস্থ দ্যোতক এখানে সাধারণ যে-অর্থটি বর্ণনা করছে তা হলো, "একজন কালো সৈনিক ফরাসি পতাকাকে স্যাঁলুট করছে" (নির্দেশিত অর্থ বা ডিনোটোটিভ মিনিং)। কিন্তু বার্থ বলছেন এই ইমেজের একটা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অর্থও রয়েছে।

যদি আমরা গ্রহণ করি, “কালো সৈন্য ফরাসি পতাকাকে স্যালুট করছে, এই ছবির মাধ্যমে ‘প্যারিস ম্যাচ’ কী বোঝাতে চাচ্ছে?” বার্থ মনে করছেন এর উত্তরে আমরা এই বার্তা পেতে পারি যে: “ফ্রান্স একটা বৃহৎ সম্রাজ্য, এবং তার প্রতিটি নাগরিক, বর্ণনির্ভরশেষে, তার পতাকার নিচে থেকে, বিশ্বজুতার সঙ্গে তাকে সেবা করে থাকে (নির্দেশিত অর্থ) এবং ফ্রান্সকে উপনিবেশবাদের দ্বারা অভিযুক্ত করে থাকে নিম্নোক্তরা তাদের জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো উত্তর হয় না, যেখানে একজন নিগ্রো তার তদারকপিত নিপীড়কের প্রতি সম্মান দেখাতে কতোখানি উদ্যমী তা দেখা যাচ্ছে (গূঢ়ার্থ বা কনোটেশন মিনিং)।”

বার্থের এই প্রকৃত বার্তা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আপনি যাই ভাবুন না কেন, যথার্থ সেমিওটিক বিশ্লেষণের জন্য আপনাকে অবশ্যই বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্ম সীমারেখা বের করতে পারতে হবে, যে-পদ্ধতিতে এই বৃহত্তর অর্থ উৎপাদনের বিষয়টি বের হয়ে আসবে। বার্থ বলছেন এখানে রেপ্রিজেন্টেশন ঘটছে দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়ায়। প্রথমত, দ্যোতক (ইমেজের উপাদান) ও দ্যোতিত (ধারণাসমূহ - যেমন সৈন্য, পতাকা এবং অন্যান্য) মিলে একটা চিহ্ন গঠন করছে যার একটা নির্দেশিত অর্থ রয়েছে: “কালো সৈন্য ফরাসি পতাকাকে স্যালুট ঠুকছে”। দ্বিতীয় স্তরে এই সমাপ্ত বার্তা বা চিহ্ন আরেকপ্রস্থ দ্যোতকের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে- সেটি হলো ফরাসি উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত একটা বৃহত্তর, আদর্শগত থিম। প্রথম সমাপ্ত অর্থটি রেপ্রিজেন্টেশন প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতক হিসেবে কাজ করছে এবং যখন একজন পাঠক এই দ্যোতককে বৃহত্তর থিমের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ছেন তখন মুহূর্তের মধ্যে অধিক বিস্তৃত ও আদর্শগতভাবে কাঠামোবদ্ধ বার্তা বা অর্থ পাচ্ছেন। বার্থ এই দ্বিতীয় ধারণা বা থিমের একটা নাম দিচ্ছেন - তিনি একে বলছেন “‘ফরাসি উপনিবেশবাদ’ ও ‘সামরিকায়ন’-এর উদ্দেশ্যমূলক মিশ্রণ।” তিনি বলছেন এই মিশ্রণ ফরাসি উপনিবেশ ও তার বিশ্বাসী নিগ্রো সেনা-জোয়ানের জন্য দেয় বার্তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে। বার্থ এই দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতনায়নকে বলছেন মিথ-এর স্তর। এই প্রসঙ্গে তিনি যোগ করছেন, “মিথটির পিছনে ফরাসি উপনিবেশবাদই তাড়না হিসেবে কাজ করছে। ধারণাটি একসারি কার্যকারণ ও ফলাফল, অভিসন্ধি ও ইচ্ছাকে পুনর্নির্মাণ করে। এই ধারণার মাধ্যমে একটা সম্পূর্ণ নতুন ইতিহাস মিথটির মধ্যে রোপিত হয় ফরাসি উপনিবেশবাদের ধারণা বিশ্বের সমগ্রতার সঙ্গে আবার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে; ফ্রান্সের সাধারণ ইতিহাসকে এর উপনিবেশিক অভিযানের সঙ্গে, এর বর্তমান সঙ্কটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।”

আমরাও পারি

রোলাঁ বার্থ নির্দেশিত পথে আমরা যেকোনো ধরনের রেপ্রিজেন্টেশনের দ্যোতক ও দ্যোতিতের সাহায্য নিয়ে নির্দেশিত অর্থের পাশাপাশি গূঢ়ার্থ বের করতে পারি। একটি বিজ্ঞাপনের চিত্রে পণ্যের সঙ্গে নারী-মডেলের সম্পর্কের যে-মিথ কিংবা পর্যটনের প্রচারপত্র/পোস্টারে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক রেপ্রিজেন্টেশনের যে-মিথ, হংকং-সাংহাই ব্যাংকের বাংলা ভাষার প্রতি দরদার মিথ, এসবকিছুকে বুঝতে এর পেছনের রাজনীতিকে বোঝা প্রয়োজন। বার্থের পদ্ধতি আমাদের সেই উপলব্ধিতে পৌছতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র: স্টুয়ার্ট হলের গ্রন্থ ‘রেপ্রিজেন্টেশন: কালচারাল রেপ্রিজেন্টেশন এন্ড সিগনিফাইং প্র্যাকটিসেস’ (লন্ডন: দি ওপেন ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৭)।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিজিটাল ফটোগ্রাফির সফল পথ পরিক্রমা

রফিকুল ইসলাম (এফবিপিএস)

ডিজিটাল ছবি বলতে কী বোঝায়? এখনকার দিনে কাউকে জিজ্ঞেস করলে সোজা বলবেন, ‘ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি মানেই ডিজিটাল ছবি’। সাধারণ মানুষ এভাবে উত্তর দিলে তা নেয়া যেতে পারে। তবে উত্তরটি গভীরতা সম্পন্ন নয়।

পাশাপাশি যদি ছবি তোলার ফিল্ম কিংবা সিনেমার ফিল্ম এবং ডিভিক্যামে শুট করা একটি ভিডিও-র টেপ রাখা হয়, তাহলে ফিল্মে ইমেজগুলো সরাসরি দেখতে পাবেন, কিন্তু ভিডিও টেপের ছবিগুলো সরাসরি দেখতে পাবেন না, পেছন থেকে আলো ফেলেও না। ভিডিও টেপের ছবি দেখতে হলে তা উপযোগী কোনো ভিডিও ক্যামেরা কিংবা ভিটিআর-এর সাহায্যে মনিটরে দেখা সম্ভব। কেননা, ভিডিও টেপে রক্ষিত বিষয়গুলো আসলে ইলেকট্রনিক অথবা ডিজিটাল ডাটা যা ছবিটাকে কেমন দেখাতে হবে তার নির্দেশনা।

একইভাবে ছবি তোলার পর প্রসেস করা একটি ফিল্ম এবং একটি এসডি মেমোরি কার্ড (যার মধ্যে ছবি আছে) পাশাপাশি রাখলে ফিল্মে সরাসরি ছবি দেখা যাবে, কিন্তু কার্ডের ছবি সরাসরি দেখা যাবে না। কার্ডের ছবি দেখার জন্য কম্পিউটার এবং বিশেষ কোনো সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে। কেননা কার্ডের ভেতরের ছবিগুলো সরাসরি কোনো ছবি নয়, বরং ছবিগুলোকে মনিটরে কেমন দেখাতে হবে, বাইনারি পদ্ধতিতে লিখিত তার নির্দেশনা অর্থাৎ ডিজিটাল ফাইল।

মনে রাখা উচিত ডিজিটাল ইমেজ শুধু ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়েই হয় না। বরং ডিজিটাল ভিটিআর (ডিজিটাল ভিডিও টেপ রেকর্ডার/রিডার), স্ক্যানার (ড্রাম স্ক্যানার/ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার), মেডিক্যাল ইমেজিং-এ ব্যবহৃত ডিজিটাল যন্ত্রপাতিসমূহ এবং এ রকম অনেক কিছুই ডিজিটাল ইমেজ তৈরি করে থাকে।

ডিজিটাল ফটোগ্রাফির ইতিহাস বেশ জটিল, মতভেদপূর্ণ এবং কনফিউজিং। এর প্রথম দিকের ঘটনাগুলো আপনার-আমার চোখের সামনে হয় নি। তথ্য পাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক উৎস বিভিন্ন ওয়েবসাইটে থাকা প্রবন্ধসমূহ। সে সব প্রবন্ধে কেউ একটি ঘটনাকে জুড়ে দিয়েছেন, কেউ সেটাকে বাদ দিয়ে গেছেন। কেউ বলেন ভিটিআর-এর আবিষ্কার এবং ব্যবহার শুরু হওয়াটাই ডিজিটাল ইমেজিং-এর গোড়া। আবার কেউ বলেন অ্যামেরিকার বেল ল্যাবে ইমেজ সেন্সর তৈরি হওয়াটাই ডিজিটাল ইমেজিং-এর শুরু।

ভিটিআর এবং ইমেজ সেন্সরের আবিষ্কার

১৯৫১ সালের (মতান্তরে ১৯৫২) আগ পর্যন্ত টেলিভিশনে যেকোনো দৃশ্যমান ঘটনাকে সরাসরি ব্রডকাস্ট করতে হতো। এর কোনো কপি রেখে তার ব্রডকাস্ট করা সম্ভব হতো না। ১৯৫১ সাল থেকে ভিটিআর-এর ব্যবহার শুরু হলে ভিডিও প্রোগ্রামগুলো টেলিভিশন ক্যামেরা থেকে এক ধরনের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ভিডিও টেপে রেকর্ড করে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। তবে ভিটিআর দ্বারা রেকর্ডকৃত ইমেজগুলো এখনকার ডিজিটাল ভিডিও কিংবা ডিজিটাল স্টিল ইমেজের অনুরূপ ছিল না বরং এগুলো ম্যাগনেটিক টেপে কোডেড সিগন্যাল হিসেবে সেভ হতো। পরে ভিডিও টেপ প্লেয়ার দিয়ে কোডেড সিগন্যালগুলো আনকোড হয়ে ইমেজে রূপান্তর হয়ে দেখার উপযোগী হতো। বিং ক্রসবি ল্যাবরেটরিজ (ক্রসবির অর্থায়নে একটি রিসার্চ টিম, যার প্রধান ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জন মুলিন) সেই সময়ের প্রাথমিক ভিটিআর তৈরি করে।

১৯৬০ সালের দিকে নাসা তাদের স্পেস প্রোবের সাহায্যে চাঁদের ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে অ্যানালগের পরিবর্তে ডিজিটাল সিগন্যাল

প্রবন্ধ

ব্যবহারের শুরু করে। পৃথিবীতে পাঠানো এই ছবিগুলোর মানোন্নয়নে নাসা কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে থাকে।

১৯৬৯ সালের ১৭ই অক্টোবর। এই দিনটিকেই ধরতে হবে ডিজিটাল ইমেজিং-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন বা মাইল ফলক। আমেরিকার এটিএনটি (AT&T)-এর বেল ল্যাবের দুজন বিজ্ঞানী, জর্জ স্মিথ এবং উইলার্ড বয়েল একটি ইমেজ সেন্সর চিপ বানালেন যাকে বলা হয় চার্জড কাপল ডিভাইস (CCD)। এই ইমেজ সেন্সরই হলো ডিজিটাল ক্যামেরার প্রাণ যা পরবর্তীতে ফিল্মের জায়গায় বসিয়ে ডিজিটাল ছবি তোলা সম্ভব হয়।

১৯৭০ সালের মধ্যেই স্মিথ এবং বয়েল প্রথম সলিড স্টেট ভিডিও ক্যামেরা তৈরি করতে সমর্থ হন। এরপর এর উন্নতি ঘটিয়ে ১৯৭৫ সালে তারা অফিসিয়ালি জানিয়ে দেন যে তাদের এই ক্যামেরায় তৈরি হওয়া ভিডিও ইমেজের শার্পনেস টেলিভিশন ব্রডকাস্টের জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ৬ অক্টোবর জর্জ স্মিথ এবং উইলার্ড বয়েল সিসিডি আবিষ্কারের জন্য যুগ্মভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা ঘোষণা হয়।

এটিএনটির বেল ল্যাবেই শুধু নয়, ফিল্ম এবং ক্যামেরা প্রস্তুতকারী প্রথম সফল প্রতিষ্ঠান কোডাক-এর ল্যাবেও ইমেজ সেন্সর নিয়ে চলছিল গবেষণা। ১৯৭০ সাল নাগাদ কোডাকের বিজ্ঞানীরা হোম এবং প্রফেশাল ইউজারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সলিড-স্টেট ইমেজ সেন্সর তৈরি করেন। এই ইমেজ সেন্সর আলোর মাত্রা পার্থক্যকে ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তর করে ডিজিটাল ছবি তৈরি করে। কোডাকের সেই সময়ের এই ইমেজ সেন্সর কোন মডেলের ক্যামেরায় ব্যবহার হয়, তা আমি জানতে সমর্থ হই নাই। সম্ভবত ঐ সময়ে এটির কোনো বাণিজ্যিক উৎপাদন হয় নাই।

সিসিডি এবং সিএমওএস

আমরা জানি দুই ধরনের ইমেজ সেন্সর ডিজিটাল ভিডিও এবং স্টিল ক্যামেরায় ব্যবহার হয়, সিসিডি (CCD; Charged Couple Device) এবং সিএমওএস (CMOS; Complementary Metal Oxide Semi Conductor)। সিএমওএস-কে অনেকে সংক্ষেপ করতে সিমোস বলে থাকেন।

মজার ব্যাপার একই ব্যক্তি বিজ্ঞানী ডালসা সিসিডি (১৯৬০ সালে) এবং সিএমওএস (১৯৭০ সালে) পদ্ধতির উদ্ভাবক। সান্ড্ভাস চ্যামবারলেইন নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই সব বিষয়ে গবেষণা করছিল, ডালসা-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ছিলেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ডালসা ১৯৬০ সালে সিসিডি-র উদ্ভাবক হয়ে থাকলে এর সাথে ১৯৬৯ সালে স্মিথ এবং বয়েলের তৈরি সিসিডি-র কী পার্থক্য ছিল? বিষয়টির ওপর আরো তথ্য উৎঘাটন করা প্রয়োজন। যেমন আমরা বলি, রেডিও-র আবিষ্কারক কে? স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু না কি মার্কোনি? সিসিডি আবিষ্কারের বিষয়টাও হয়ত এ রকম ছিল।

আনুমানিক ২০০৫ সাল পর্যন্ত সিএমওএসের ওপর সিসিডির প্রাধান্য চলতে থাকে। সিসিডি-র তুলনায় সিএমওএস তৈরি করা কম জটিল ছিল। সিএমওএসের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল কম আলোয় তোলা ছবিতে প্রচুর নয়েজ হওয়ার। এর ভালো দিক হলো, এটি কম পাওয়ার গ্রহণ করে, ফলে ব্যাটারির চার্জ দীর্ঘক্ষণ থাকে। সিসিডি এবং সিএমওএসের যত রকম দোষ-গুণ বলা হত, এখন তার সবটি প্রযোজ্য নয়। উভয়টির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে। এখন সবচেয়ে দামী ক্যামেরাগুলোতে সিএমওএস ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিকভাবে তৈরি প্রথম সিস্টেম-ভিডিও ক্যামেরা ১৯৮১ সালের ২৫ শে আগস্ট সনি কর্পোরেশন সনি ম্যাভিকা (Sony Mavica) নামের প্রোটোটাইপ স্টিল-ভিডিও ক্যামেরা বাজারজাত শুরু করে। ম্যাগনেটিক ভিডিও ক্যামেরা; এই তিন শব্দ থেকে ম্যাভিকা শব্দটি নেয়া হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে ম্যাভিকা এখনকার মত ডিজিটাল ছবি তৈরি করত না। ম্যাভিকা ছিল তখনকার ভিডিও ক্যামেরার স্টিল অ্যানালগ প্রকৃত অর্থে ম্যাভিকা এখনকার মত ডিজিটাল ছবি তৈরি করত না। ম্যাভিকা ছিল তখনকার ভিডিও ক্যামেরার স্টিল অ্যানালগ ভার্সন। তবে এতে 570x490 রেজুলেশনের সিসিডি ব্যবহার হত এবং ইলেক্ট্রনিক সঞ্চালন প্রক্রিয়া কাজ করত। মেমরি স্টিক তখনও আবিষ্কার হয়নি। ম্যাভিকার রেকর্ডকৃত অ্যানালগ ছবিগুলো দু'টি দুই ইঞ্চি মাপের ফ্লপি ডিস্কে সেভ হত। একটি ডিস্কে ছবির উজ্জ্বলতার বিষয় অপরটিতে রঙগত বিষয় রেকর্ড থাকত। এক সাথে উভয় ডিস্ক হতে ক্যামেরার ভিডিও মনিটরে কিংবা টেলিভিশনে ছবিগুলো একটি একটি করে প্লে করা যেত। রেজুলেশন কম থাকায় এ থেকে ভালো প্রিন্ট পাওয়া যেত না। ১৯৮০-র দিকে বেশ কয়েকটি কোম্পানি ম্যাভিকার মত স্টিল-ভিডিও ক্যামেরা তৈরি করতে এগিয়ে আসে।

পিছিয়ে নেই কোডাক, ফুজি, নাইকন, ক্যানন ১৯৮৬ সালে কোডাকের বিজ্ঞানীরা ১.৪ মেগাপিক্সেল ইমেজ সেন্সর তৈরি করতে সক্ষম হন। এটা ছিল সেই সময়ের প্রথম মেগাপিক্সেল সেন্সর যা থেকে ভালো মানের 5x7 ইঞ্চি সাইজের প্রিন্ট করা যেত। ১৯৮৭ সালে কোডাক ইলেক্ট্রনিক স্টিল ভিডিও ইমেজ রেকর্ডিং (ছবি তোলার ক্যামেরা), স্টোরিং (সেভ করে রাখার ডিভাইস), ম্যানুপিউলেটিং (ফটোশপের মতো কোনো সফটওয়্যার), ট্রান্সমিটিং (এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা ট্রান্সফার) এবং প্রিন্টিং-এর জন্য এক সাথে সাতটি যন্ত্র বাজারে ছাড়েন।

১৯৮৮ সালে ফুজি DS-IP নামে একটি কনজুমার লেভেলের একটি ক্যামেরা বাজারে ছাড়েন। ১৯৯০ সালে ডিক্যাম নামের একটি প্রতিষ্ঠান Dycam Model ১ নামে কনজুমার লেভেলের একটি ক্যামেরা অ্যামেরিকায় ছাড়েন। লজিটেক এই ক্যামেরাটিকে Fotoman নাম দিয়ে বিক্রয় করত। এই ক্যামেরার মধ্যে এক মেগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার হত, ৩২টি কম্প্রেস হওয়া ছবি র‍্যামেই সেভ হত। এর সিসিডি-র রেজুলেশন ছিল 376x240 পিক্সেল, টোনাল ডেপথ (শেডস) ছিল ২৫৬ (৮-বিট) গ্রে, ফরম্যাট ছিল টিফ। শুধুমাত্র গ্রে চ্যানেল থাকা মানে ছবিগুলো সাদাকালো ছিল।

১৯৮৭ সালে ক্যানন কোম্পানি Canon RC-701 নামে একটি ভিডিও-স্টিল ক্যামেরা তৈরি করেন যা প্যান অ্যামেরিকান গেমস-এর নিউজ কভার করার জন্য টেস্ট এবং ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরাটি এর ডিস্কে ৫০টি রঙিন ছবি তুলতে পারতো। এই ৫০ টি ছবি সাধারণ টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে দেড় থেকে তিন মিনিটের মধ্যে ভিন্ন কোনো স্থানে ট্রান্সমিট করা যেত। ফটো-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে Canon RC-701 এর ব্যবহার একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯৯০ সালের প্রথম দিকে কোডাক ফটোসাংবাদিকতার উপযোগী করে প্রফেশনাল মানের ক্যামেরা সিস্টেম DCS (Digital Camera System) বাজারে ছাড়েন। নাইকনের F-3 ক্যামেরাটির সাথে কোডাকের ডিজিটাল ইমেজ সেন্সর এবং কম্পিউটার চিপসসমূহ ব্যবহার করে এই ক্যামেরাটি তৈরি করা হয়েছিল। এর সেন্সর রেজুলেশন ছিল ১.৩ মেগাপিক্সেল। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথম এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা।

ফিল্ম বেজুড ফটোগ্রাফ-এর তুলনায় ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি সে সময়ে বেশ নিম্নমানের ছিল। কয়েকটি বিষয় তখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছিল, যেমন,

প্রবন্ধ

- (১) বড় প্রিন্ট করার উপযোগী ইমেজ রেজ্যুলাশন, যার জন্য আরো বেশি মেগাপিক্সেলের সেন্সর দরকার।
- (২) সঠিক রঙ আসবে এবং কম আলোতে ছবি তুললেও নয়েজ হবে না এমন সেন্সর।
- (৩) ক্যামেরার ভেতরের কর্মকাণ্ড পরিচালনে উন্নতমানের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার।

শুরু দিকের ক্যামেরাগুলোর সাইজ এবং শেইপ অনেকটা ঢাছস ধরনের ছিল। একটি ক্যামেরার মধ্যে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (মাদার বোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, এলসিডি মনিটর) সংযোজন করতে গিয়ে এর আকৃতি প্রায় দিগুণ হয়ে যেত। হার্ডওয়্যারগুলো অনেক ছোট করে তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় এখন বেশ ছোট আকারের ডিজিটাল ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আগে দুই বা তিন মেগাবাইটের একটি ছবি (ডিজিটাল ছবির ফাইল) মেমরি চিপসে সেভ হতে কিছুটা সময় নিয়ে নিত, ততক্ষণ ছবি তোলা বন্ধ রাখতে হতো। এখন প্রসেসর এবং মেমরি চিপস অনেক বেশি ফাস্ট, র‍্যামের ধারণ ক্ষমতাও অনেক বেশি, ফলে পরপর কিংবা কন্টিন্যুয়াস মোডে অনেক বেশি সংখ্যক ছবি তোলা সম্ভব হয়। মেমরি চিপসগুলোর ধারণ ক্ষমতা এখন অনেক বেশি, ১৬ কিংবা ৩২ গিগাবাইট, যা অতীতে স্বপ্ন দেখার মতো ছিল।

১৯৯৯ সালে নাইকন দুইটি কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরা বাজারে ছাড়ে, Coolpix 950 এবং Coolpix 700। প্রথমটি জুম লেন্সযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি ফিক্সড ফোকাল লেন্থ লেন্সযুক্ত ছিল। ৯৯-এর আগেই কোডাক ৬ মেগাপিক্সেলের প্রফেশনাল ক্যামেরা তৈরি করে, যা কজুমারদের সাধারণ বাইরে ছিল। এর ওজন ছিল ৩.৭৫ পাউন্ড। দেখতে ছিল একটা ইন্টারনেটের মতো।

আইবিএম এবং কোডাকের কোল্যাবোরেশনে ইমেজ এক্সচেঞ্জের (ছবি পাঠানো এবং গ্রহণ) জন্য ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। হিউলেট প্যাকার্ড সর্ব প্রথম ডিজিটাল ছবির কালার প্রিন্ট করার প্রিন্টার তৈরি করে।

১৯৯৬ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৮৫% পত্র-পত্রিকা ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহারের আওতায় আসে। তখন থেকে ফটোসাংবাদিকদের ডিজিটাল ক্যামেরা এবং কম্পিউটার ব্যবহার জানা জরুরী হয়ে পড়ে।

বেয়ার্স/সুপার সিসিডি/ফোবেয়ন

ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের ফটোডায়ডগুলোর ওপর কালার ফিল্টারের সেট থাকে। এই কালার ফিল্টারের সেট না থাকলে ইমেজ সেন্সর রঙিন ছবি দিতে পারতো না, সাদাকালো ছবি পাওয়া সম্ভব হতো। ফটোডায়ডগুলো এবং এগুলোর ওপর কালার ফিল্টার কী নিয়মে সাজানো থাকবে, সেই বিবেচনায় বেয়ার্স, সুপার সিসিডি এবং ফোবেয়ন এই তিন প্রকৃতির ইমেজ সেন্সর দেখা যায়।

কুজি তার ক্যামেরাগুলোতে সুপার সিসিডি ব্যবহার করে। সেখানে ফটোডায়ডগুলো আয়তাকার ইমেজ সেন্সরের ওপর কনকুনিভাবে সাজানো হয়। ডিজিটাল কনভার্সনের সময় পিক্সেলগুলো কোনাকুনি না থেকে খাড়া-পাশাপাশি কলাম-রো'তে সাজিয়ে যায় (রি-স্যাম্পলিং হয়)। কুজি দাবী করে এতে তাদের ক্যামেরার ডিজিটাল ইমেজে নয়েজ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

কুজি এবং সিগমা বাদে বাকী সব ক্যামেরাতে বেয়ার্স টেকনিকের সিসিডি বা সিএমওএস ব্যবহার হয়। বেয়ার্স টেকনিক হলো কোডাকের আবিষ্কার। এখানে এক একটি ফটোডায়ডের ওপর রেড, গ্রিন এবং ব্লু ফিল্টার আলাদা আলাদাভাবে থাকে। পাশাপাশি ও ওপর-নিচ মোট চারটি ফটোডায়ডে ফিল্টারগুলো রেড-গ্রিন-ব্লু-গ্রিন এভাবে আবর্তিত হয়। বেয়ার্স প্যাটার্নের নকশা দেখলে বিষয়টি বোঝা সহজ হয়। ডিজিটাল ছবি হওয়ার সময় একটি পিক্সেলের রঙ পার্শ্ববর্তী পিক্সেলগুলোর রঙ শেয়ার করে রঙ রি-কনস্ট্রাক্ট হয়। বেয়ার্স টেকনিকের সমস্যা হলো ছবির প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশে বা পিক্সেলে বিষয়বস্তুর রঙ একশতভাগ আসে না। তবে সাধারণ চোখে এটা বড় কোনো সমস্যা নয়।

২০০২ সালে ফোবেয়ন নামে একটি প্রতিষ্ঠান নতুন ধরনের একটি ইমেজ সেন্সর তৈরি করতে সমর্থ হয়। বেয়ার্স টেকনিকের সাপে এর মৌলিক পার্থক্য হলো, এর প্রতিটি ফটোডায়ডের ওপর রেড, গ্রিন এবং ব্লু-এর তিনটি ফিল্টার ওপরে-ওপরে সাজানো হয়। কালার ফিল্ম টেকনোলজির সাথে এর মিল আছে। ফলে একটি ফটোডায়ড এক্সপোজার নেয়ার সময় আলোর যে রঙটি গ্রহণ করে, পিক্সেল তৈরি হওয়ার সময় কারো সাথে শেয়ার না করে সেই রঙটিই তৈরি হয়। এতে করে ছবিতে তুলনামূলক বেশি শার্পনেস এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশে সঠিক রঙ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সিগমা এই টেকনিকের স্বত্ব কিনে নিয়ে তার তৈরি ক্যামেরায় এটির ব্যবহার শুরু করে। অন্য কোনো ক্যামেরা প্রস্তুতকারক ফোবেয়ন টেকনিকের সেন্সর ব্যবহার করতে পারে না। সিগমা দাবী করে তাদের ছয় মেগাপিক্সেলের ছবি $6 \times 3 = 18$ মেগাপিক্সেলের সমমান। তবে বিভিন্ন কারণে সিগমা ক্যামেরা ফটোগ্রাফারদের কাছে ক্যানন, নাইকন বা সনি-এর মতো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রেজুলেশন বিবেচনায় ফিল্ম বনাম ডিজিটাল

এখন থেকে প্রায় ছয় বছর আগেও (২০০৬) ছয় মেগাপিক্সেলের ছবিকে হাই রেজুলেশন মনে করা হতো। ৩৫মিমি নেগেটিভ ফিল্ম স্ক্যান করেও ডিজিটাল ছবি তৈরি করা যেত। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছয় মেগাপিক্সেল ছবিকে ৩৫মিমি নেগেটিভ ফিল্মের সমমান ভাবা যেত। তখন ভাবা হতো ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি ৩৫মিমি ট্রান্সপারেন্সি/স্লাইড ফিল্মের সমমান হতে পারবে না। ২০১২ সালে সেই ধারণা পাল্টে গেছে। এখন ১০, ১২, ১৫, ১৮, ২২, ২৪ এমনকি ৩৬ মেগাপিক্সেলের এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা পাওয়া যায়। এখন এসএলআর ক্যামেরার ১০ থেকে ১৫ মেগাপিক্সেলকে ৩৫মিমি স্লাইড সমমান এবং ১৮ থেকে ২৪ মেগাপিক্সেলকে মেডিয়াম ফরমেট স্লাইড সমমান ভাবা যেতে পারে।

ডিজিটাল ক্যামেরার তোলা 'র' ছবির কালার ডেপথ (ডিজিটালের ভাষায় বিট ডেপথ) ফিল্মের কালার ডেপথের সমমান ভাবা যেতে পারে।

শেষ কথা

ফিল্ম ফটোগ্রাফির তুলনায় ডিজিটাল ফটোগ্রাফি অনেক বেশি জটিল। তবে ব্যাপক অটোমেশনের কারণে সাধারণ মানুষ তেমন কিছু না শিখেও ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে পারে, গ্রহণ করার মতো একটা না একটা কিছু হয়ে যায়। প্রকৃত অর্থে যারা ফটোগ্রাফার হবেন, তাঁদের উচিত এর গভীরের দরকারী বিষয়গুলো জেনে এগিয়ে যাওয়া।

ফিল্মের যুগে অ্যামেচার ফটোগ্রাফাররা ৩৫মিমি ফিল্ম ব্যবহার করতেন। তাঁরা কিন্তু মেডিয়াম ফরমেট ক্যামেরা ব্যবহার করতেন না; সেগুলো ছিলো মূলত হাই প্রফেশনালদের জন্য। একজন অ্যামেচার যখন এক লাখ টাকার বেশি মূল্যের ক্যামেরা কেনেন, ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের লেন্স কেনেন, তখন বিষয়টি কষ্টদায়ক মনে হয়। কেননা তাঁর জন্য এত দামী কিছু দরকার নেই। মূলত এটা একটা লোক দেখানোর প্রতিযোগীতা। দামী ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে বড় ফটোগ্রাফার সাজার বাতিক শুরু হয়েছে। এতে করে আমাদের দেশে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটছে। সময় নিয়ে শিখলে অনেক কম দামের ক্যামেরা ও লেন্স দিয়ে অনেক ভালো মানের ছবি হওয়া সম্ভব। ভালো ছবি হওয়ার জন্য শুধু ক্যামেরা নয় বরং ক্যামেরার পেছনের মানুষটির জ্ঞান, শিল্পভাবনা এবং পরিশ্রম বেশি প্রয়োজন।

চট্টগ্রামের আলোকচিত্র অঙ্গন ও মৃণাল সরকার মউদুদুল আলম

মৃণাল সরকার-আলোকচিত্র মানুষ। আলোকচিত্রীর প্রিয় মানুষ। আলোর দিশারী। ১৯৩৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রংপুরের কেরানীগঞ্জ-এ জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ সরকার। স্কুল-শিক্ষক। মা প্রভাৱাণী সরকার গৃহবধু। প্রাথমিক শিক্ষা রংপুরে। পরে বাবার সাথে খুলনায়। এখানে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৪৮ সালে। কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে চারুকলায় তালিম। পরে-খুলনায় একটি ফটো স্টুডিওতে আলোকচিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। ডার্করুম থেকে আউটডোর ফটোগ্রাফি। পরে ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে হুমেন-ফরেষ্ট ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউটে আলোকচিত্রী পদে যোগদান। এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজে বিকেলে নিজ উদ্যোগে আলোকচিত্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু। কাকতলীয়ভাবে ঐ সময় আমি ঢাকায় বেগার্ট ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফি'র মনজুর আলম বেগ থেকে প্রশিক্ষণ নিই। ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর কোর্সে আমি প্রথম হই। এতে বেগ স্যারের দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হয়। বললেন-চট্টগ্রামে একটি আলোকচিত্র সংগঠন আছে। বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি। অনুভব করলাম-এই ধরনের একটি সংগঠন চট্টগ্রামেও করা যায়। আমি বেগ স্যারকে আমার মনের কথা জানালাম। উনি বললেন-চট্টগ্রামে মৃণাল সরকার নামে একজন আলোকচিত্রী আছেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আগে থেকেই মৃণাল সরকারকে জানতাম। চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমাজে তাঁর সাথে আমার দেখা হতো। কিন্তু, আলোকচিত্র বিষয়ে আলাপ হয়নি অতীতে। একদিন চেম্বার প্রেসের ইউনুস হাবের কক্ষে মৃণালদার সাথে কথোপকথন হয়। আমি তাঁকে চট্টগ্রামে একটি আলোকচিত্র সংগঠন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। বেগ স্যারের কথাও বলি। উনি আমাকে বিকেলে আর্ট কলেজে আসতে বললেন। পরে তার কার্যালয়ে অনেক বৈঠক করি-চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটি করার লক্ষ্যে। চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটি গড়ার পেছনে মৃণালদার সাংগঠনিক যোগাযোগ অনেক সফল ভূমিকা রাখে। অতঃপর ১৯৮৩ সালের ১১ মার্চ চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সূচনা হয়। মৃণাল সরকার সভাপতি এবং আমি সম্পাদক হয়ে ১৫ সদস্যের কার্যকরী পরিষদ গঠন করি। এটির অধীনে চট্টগ্রামে প্রথম জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ১১ নভেম্বর চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে। মৃণালদা এই সংগঠনের লোগো এবং স্যুভেনিয়রের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করেন। এখানে বলতে হয় মৃণালদা একজন প্রকৃত অর্থে শিল্পী ছিলেন। তাঁর সুন্দর হস্তলেখা, ডিজাইনে পরিশীলিত স্পেস এবং ভাল আবৃত্তিকার হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এই আলোকচিত্রীর গভীর জ্ঞানের কথা নাই বা বললাম। একজন সফল আলোকচিত্র শিক্ষক-সবার সাথে আলাপচারিতায় তা প্রকাশ পাওয়া যেত। তিনি বাংলাদেশের ছেলেদের আন্তর্জাতিক ভূমানে আলোকচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। আমি তাঁর সাথে ভারতে দুটি আলোকচিত্র কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। ১৯৮৯ সালে আলোকচিত্র শিল্পের ১৫০ বছর পূর্তিতে তাঁর সাথে দিল্লীতে গিয়েছিলাম। তিনি ভারতের বরেন্য আলোকচিত্রীদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আইআইপিসি কনফারেন্সে তিনি মূল প্রবন্ধটা পড়েন। ভারতের পণ্ডিতেরা তাঁর সাথে আমার কর্মশালায় যাওয়ার সুযোগ হয়। তিনি তাঁর রচনায় বাংলাদেশের সমসাময়িক আলোকচিত্রের ধারা তুলে ধরেন। উপস্থিত সুধীদের এদেশে প্রতিভাবান আলোকচিত্রীদের কথা বলেন। বাংলাদেশে আলোকচিত্র ফেডারেশন গড়ার লক্ষ্যে মৃণাল সরকার কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর সাথে আমাদের কালের আলোকচিত্রের প্রবর্তারা আনোয়ার হোসেনও ছিলেন। ফেডারেশনের প্রথম পরিষদে মৃণাল সরকার সভাপতি এবং আনোয়ার হোসেন মহাসচিব নির্বাচিত হন। আমি ও খালিদ মাহমুদ মিঠু সদস্যরূপে থাকি। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে তাঁর ও আনোয়ার ভাইয়ের প্রচেষ্টা বেশীদূর এগুতে পারেনি। যা ছিল আলোকচিত্র

আন্দোলনের জন্য অপঘাত ।

এরপর মৃণাল সরকার ট্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফারস-এর ব্যানারে প্রথম আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী করেন ১৯৯০ সালে । এটি হলো বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রয়াস । মৃণাল সরকারের আর্থিক সংগতি না থাকলেও মনের অফুরন্ত অনুভব ছিল অকৃত্রিম । আমার সফল সংগঠক হওয়ার পেছনে মৃণাল সরকারের হাতে-কলমে শিক্ষার অনেক অবদান রয়েছে । তার দ্বিচক্রযানটি সবসময় আলোকচিত্রের উন্নয়নের জন্য সচল ছিল । ৫০ বছর উর্ধ্ব মানুষটি আমাকে পেছনে নিয়ে ঘুরতেন বিভিন্ন স্থানে তথ্যের সন্ধানে ও সাংগঠনিক কাজে । প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা হওয়া চাই, আমার বাসায়-না হয় তাঁর বাসায় । তাঁর পরিবারের সদস্যরা সন্ধানে ও সাংগঠনিক কাজে । তবে তাঁর ছেলে-মেয়েদের সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল । তারা আমাকে 'কাকু' বলে ডাকতো । এ পৃথিবীর পড়ন্ত বেলায় মৃণালদার সাথে অনেক স্মৃতিই আছে । অনেক আনন্দের এবং মনে রাখার মতো । কিন্তু পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে সবাই চলে যায় । মৃণালদাও চলে গেলে ২০০০ সালের ১৭ জুলাই । কিন্তু কিছু কথা মানুষকে আঘাত করে । আমরা চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আলোকচিত্রে অবদান রাখার জন্য সম্মাননা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই । আমি মৃণালদার নাম প্রস্তাব করি, সম্মাননা দেয়ার জন্য । কিন্তু তাঁর নামটি ঐদিন গৃহীত হয় নি । মনজুর আলম বেগ, গোলাম কাশেম ড্যাভি ও রশিদ তালুকদারকে সম্মাননা দেয়া হয় । সম্মাননা নিতে এসে বেগ স্যার বললেন- আপনাদের চট্টগ্রামে এই পদক পাওয়ার মানুষ ছিল । মৃণাল সরকারকে আপনারা পদক দিতে পারতেন । তাঁর বক্তৃতায় তিনি কথাটি আক্ষেপের সাথে বললেন । মৃণালদা অসুস্থতার কারণে ঐদিন অনুষ্ঠানে ছিলেন না । বেগ স্যার তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাসভবনে যান । তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করেন । আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মৃণাল সরকারের চিকিৎসার জন্য টাকা তুলে দেন । দীর্ঘজীবন পর আমার অনুশোচনা-মৃণাল সরকারের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় নি । আগামী প্রজন্ম যদি তাঁকে মনে রাখেন, তাহলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আলোকচিত্র শিল্প সত্যিকার অর্থে আলোকিত হবে ।

লেখক: ফটোগ্রাফার

প্রসঙ্গঃ আলোকচিত্রের ব্যাখ্যা হাসিব জাকারিয়া

“Recently photography has become almost as widely practiced an amusement as sex and dancing, which means that like every mass art form, photography is not practiced by most people as art. It is simply a social rite, a defense against anxiety and a tool of power.”

- Susan Sontag, “On photography” 1977.

বিভিন্ন প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে প্রতিবছর কোটি কোটি মানুষ হাজার কোটি ছবি তুলছে। আর এই ছবি প্রতিদিনই উঠে আসছে খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে, বই-এ, বিলবোর্ডে, যাদুঘরে, গ্যালারিতে, এমএমএস-এ, ফেসবুকে, ব্লগে, ওয়েবসাইটে। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেও মানুষ ছবি এঁকে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে; আর মাত্র চার হাজার বছর যাবৎ মানুষ অক্ষর ব্যবহার করে মনের কথা লিখেছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন, এই যে অক্ষরগুলো এখন আপনি দেখছেন, সেগুলো প্রত্যেকটিই রেখা, বৃত্ত, উপবৃত্ত, ত্রিভুজ বা সহজভাবে কতগুলো চিহ্ন। “গ-া-ধ-া” এই চারটি চিহ্নের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের মনের ভেতর কেবল মাত্র একটি ভারবাহী, নিরীহ প্রাণীই ভেসে উঠে না, কারো কারো ছেলেবেলাও ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু একজন চীনা নাগরিকের কাছে এই চারটি চিহ্নের বা শব্দটির কোন অর্থ আছে কি? একই কারণে চীনা আলোকচিত্রীর তোলা ছবি বাংলাদেশী দর্শকের কাছে অর্থবহ নাও হতে পারে। প্রফেসর John Tagg মনে করেন, “Photography cannot be understood as having a static identity or singular cultural status”.

আমাদের স্কুল কলেজে বাংলা ভাষা, ইংরেজী ভাষা, আরবি ভাষা, গণিতের ভাষা, ভূগোলের ভাষা শেখানো তো হয়, আলোকচিত্রের ভাষা শেখানো হয় কি? তাহলে একদম না শিখে না জেনে আমরা কি করে আলোকচিত্রকে মূল্যায়ন করি? এর স্বাদ আস্বাদনই বা করি কি ভাবে? আজকের দিনে কেউ যখন একটি মোটামুটি দামের ক্যামেরা কেনে, বন্ধু-বান্ধবরা ধরেই নেয় যে কাল থেকে ক্যামেরার এই গর্বিত মালিক ভাল ছবি তুলতে থাকবেন, ক্যামেরার বিজ্ঞাপন দেখলে অন্ততঃ তাই মনে হয়। ক্যামেরা মুখ চিহ্নিত করতে পারে (Face detection), হাসি চিহ্নিত করতে পারে (Smile detection), আর শাটারে রিলিজ বাটনে চাপ দিলে ঝকঝকে ছবি তো তুলতে পারেই। প্রায় ১২৪ বছর আগে ১৮৮৮ সালে “দি ইস্টম্যান ড্রাই প্লেট এ্যান্ড ফিল্ম কোম্পানী” তাদের Kodak ক্যামেরার বিজ্ঞাপনে সেই বিখ্যাত স্লোগানটি দিয়েছিলেন “You press the button we do the rest”. সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আলোকচিত্র আমজনতার হাত ধরে এক নতুন ভাষায় রূপ নিয়েছে। হালের এই আমজনতা আর্টের বিপুল বোঝা কাঁধে নিয়ে ছবি তোলা আরম্ভ করেনি, বরং “button” “press” করেছে - ভুল করেছে এবং একজন আরেক জনের ভুল থেকে শিখে আলোকচিত্রের এই নতুন ভাষা ও ভাষারের জন্ম দিয়েছে।

আজকের “শূন্য” এবং “এক” এর ডিজিটাল যুগে গণতন্ত্র রাজনীতিতে মরীচিকা হলেও আলোকচিত্রের মাধ্যমটিতে গণতন্ত্রায়ন হয়েছে। আজকের একটি ছবি তুলে বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর জন্য দরকার, চোখ, মগজ, একটি ক্যামেরা বা একটি ফোন, একটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ। অবশ্য আজকাল ক্যামেরা, কম্পিউটার আর নেট সংযোগ ফোনের মধ্যেই থাকে। আজকে তাই আমরা সবাই উৎপাদক, সম্পাদক, ভোক্তা। আমরা কেবল খবরের পাঠক নই, খবরে অংশগ্রহণকারীও। কাজেই আজকের যুগে

কেবল ছবি দেখে ভাল বা খারাপ বললে অথবা “like” ক্লিক করলেই চলবে না। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে, অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে।

সকল ইমেজের ব্যাখ্যা আবশ্যিক

আমাদের সকলের মধ্যেই যে কোন আলোকচিত্রকে “সরল” বা নিরীহ ভাবে দেখার প্রবণতা আছে। অর্থাৎ, ফটোর দিকে তাকিয়ে আমরা ধরে নেই যে এটা প্রকৃত ঘটনা, সত্য, এটা বাস্তবের প্রতিনিধি বা প্রতিচ্ছবি। কিন্তু নিরীহ বা সরল চোখ বলে কিছু নেই। আমরা যখন আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে দেখি আমরা তখন কি আমাদের শিক্ষা(পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের), অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করে দেখি? যেহেতু সরল চোখ বলে কিছু নেই, অবশ্যই সরল ক্যামেরাও নেই। কাজেই সকল ছবির ব্যাখ্যা প্রয়োজন; সেটা যত সরাসরি, বাস্তব, নিরীহ বা সরল দেখতেই হোক না কেন। কোন ফটোগ্রাফই সরল, নিরীহ বা নিষ্প্রাণ না; কটাক্ষ, সংস্কার আর পক্ষপাতের উর্দ্ধে না। সকল ফটোই কোন একটা উদ্দেশ্যে বা কারণে তোলা হয়, বা বানানো হয়। তাই এরা পাঠ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবিদার। মজার ব্যাপার হচ্ছে কবিতা বা পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত ভাবে আমরা যতটা ব্যাখ্যা করার চিন্তা করি, আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে ততটা করি না।

সকল ইমেজের ব্যাখ্যা অবশ্যক এই নিয়মটি “Art speaks for itself” এই ধারণাটির বিপরীতে অবস্থান করে। মার্কিন দার্শনিক এবং সমালোচক Aurthur Danto মতে “An art work is different from an ordinary object because it is about something” সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে একটি ল্যাংড়া আম আর ল্যাংড়া আমের ছবি এক বিষয় যে নয়, আত্মপ্রেমিকরা অবশ্যই তা জানেন। ছবিটি আম সম্পর্কিত, আম নয়। তদুপরি প্রতিটি ছবির একটা দৃষ্টিকোণ থাকে। হয়তো এই আম সম্পর্কিত নিরীহ ছবিটি আমে বিষ প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। ছবি এবং তার ব্যাখ্যা ইতিহাস এবং প্রসঙ্গ সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল। ভবিষ্যতে যখন আর কোনদিন এই নিরীহ চেহারার আম খেয়ে কোন শিশুর অকাল মৃত্যু হবেনা তখন এই আমের ছবির ব্যাখ্যা আর আজকের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই এক হবে না। Susan Sontag তার “On Photography” বই এ লিখেছেন, “A photograph of 1900 that was affecting then because of its subject, would today, be more likely to move us because it is a photograph taken in 1900.”

আমরা তখনই কেবলমাত্র আলোকচিত্র থেকে তথ্য এবং জ্ঞান পাই, যখন আমরা ইমেজ বা আলোকচিত্রকে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যার মাধ্যমে ছবিটির মর্ম নিরীক্ষণ বা উপলব্ধি করার শক্তি অর্জন করি।

আলোকচিত্রকে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়।

বাস্তবতার বর্ণনা ব্যতিরেকে আলোকচিত্রকে বোঝার অন্য কোন উপায় নেই। আর ভাষা হচ্ছে সাদামাটা ভাবে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম। ব্যাখ্যা করার অর্থ আলোকচিত্রকে ভাষার মাধ্যমে বোধগম্য করে অর্থবহ করা। তাই আলোকচিত্রকে ব্যাখ্যা করতে হলে নিচের প্রশ্নগুলোর মত প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

আলোকচিত্রটিতে আমি যে বস্তু বা ঘটনাকে দেখতে পাচ্ছি সেটা কি?

আলোকচিত্রটির বিষয় কি?

ছবিটি কি অভিব্যক্ত করে?

আলোকচিত্রীর কাছে এর অর্থ কি?

প্রবন্ধ

কি কি তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই আলোকচিত্রটি তৈরি?

আলোকচিত্রটি কি কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া?

আলোকচিত্রী কি ভাবে এই আলোকচিত্রটি তৈরি করেছেন?

ছবিটি কোন ঘরানার?

আলোকচিত্রী কি উদ্দেশ্যে এটা তুলেছেন?

ছবিটি কি কোন সমস্যা সমাধান করে, সমস্যাকে হালকা করে নাকি সমস্যাকে বাড়ায়?

অন্যদের কাছে ছবিটির অর্থ কি?

আমার কাছে ছবিটির অর্থ কি?

ছবিটি কি আমার জীবনকে কোন ভাবে প্রভাবিত করে?

ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন এবং এর উত্তরের মাধ্যমে আলোকচিত্রের গভীরে ঢোকা যায় এবং একে উপলব্ধি করা যায়।

তবে, অনেক সময় ছবির সাথে যে লেখা থাকে তা ছবির অর্থকে ভুল পথেও নিয়ে যায়। ১৯৫৩ সালে ফরাসি আলোকচিত্রসাংবাদিক রবার্ট ডোয়ানু (Robert Doisneau) ফরাসি ক্যাফের উপর ছবি তুলছিলেন। প্যারিসের ক্যাফে ছিল তার প্রিয় বিষয়। তিনি একদিন এক ক্যাফেতে ঢুকলেন এবং দেখলেন যে একজন ভদ্রলোক এবং এক জন ভদ্রমহিলা বসে wine খাচ্ছেন। দৃশ্যটি দেখে তিনি ছবি তোলার আকর্ষণ বোধ করলেন এবং ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার অনুমতি নিয়ে তাদের ছবি তুললেন। রবার্ট ডোয়ানুর “At the Cafe” ১৯৫৮ সালে “Le Point” নামের ফ্রান্সের একটি বহুল প্রচলিত ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তার এই কাজটি ছিল প্যারিসের ক্যাফে নিয়ে।



Robert Doisneau, At the cafe, (1958)

এরপর ডোয়ানু তার এই ছবিটি অন্য ছবিগুলোর সঙ্গে তার এজেন্টের কাছে দিয়ে দেন। কিছুদিন পর এজেন্ট, ডোয়ানু বা ছবির

প্রবন্ধ

পাত্রপাত্রীর অনুমতি ছাড়া ছবিটি একটি মদ্যপান বিরোধী সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেন এবং ছবিটি সংস্থাটির এ্যালকোহলের কুফল বিষয়ক ব্রশিউয়্যারে স্থান পায়। আরও পরে এবার আলোকচিত্রী, ছবির পাত্রপাত্রী এবং ডোয়ানুর এজেন্টের অনুমতি ছাড়াই একটি ফরাসি ট্যাবলয়েড “Le Point” ম্যাগাজিন থেকে ছবিটি কপি করে ছাপায়। এবার ছবিটির নীচে ক্যাপশন ছিল “Prostitution in the ChampsElysées”। ছবিটির ভদ্রলোক সম্ভব কারণেই ট্যাবলয়েড ফটোগ্রাফার আর এজেন্টের নামে মামলা করেন। আদালত ট্যাবলয়েড আর এজেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে ডোয়ানুকে অব্যাহতি দেয়। অর্থাৎ ছবির সাথে লেখা বা ক্যাপশন দর্শকদের ছবিটির অর্থ কি তার দিকনির্দেশনা দেয় সত্যি, তবে ক্যাপশনের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি খুটিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

আলোকচিত্রের অর্থ কেবলমাত্র আলোকচিত্রী যা বোঝাতে চেয়েছেন তার মধ্যেই সীমিত নয়। আলোকচিত্রী Minor White বলেছিলেন “The photographers frequently photograph better than they know”. ফলে আলোকচিত্রীর ব্যাখ্যা অনেকগুলো ব্যাখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যা। একটি আলোকচিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হতেই পারে। ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে একটি আলোকচিত্র সম্পর্কে দর্শক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। আলোকচিত্রকে বর্ণনা করার মাধ্যমে এর মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে, এর অর্থ সম্পর্কে, এর অনুভূতি সম্পর্কে এর ভাব এবং চরিত্র সম্পর্কে কথা বলা, আলোচনা করা সম্ভব। যখন বিখ্যাত সমালোচকরা কোন আলোকচিত্র নিয়ে লেখেন তখন তারা (তাদের মতে) ঐ আলোকচিত্রটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুঁজে বের করেন, চেষ্টা করেন আলোকচিত্রটির অংশসমূহ কি ভাবে একে অন্যের সাথে খাপ খেয়েছে তা বোঝার। তারা খুঁজে বের করেন আলোকচিত্রটির বিষয়বস্তুর উপর এর গঠনের বা form এর প্রভাব। তারপর এ সব তথ্য এবং আলোকচিত্রটি সম্পর্কে তাদের অনুভূতি তারা আমাদেরকে জানান।

পরিশেষে সকল আলোকচিত্রই রহস্যোদ্ভারের অপেক্ষায় থাকা কোন সংকেত বা রূপক। আর্ট সমালোচক টেরি ব্যারেট মনে করেন, “A Photograph always shows us something as something” এই জটিল “as” অংশটির জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই রূপক বা সংকেতকে বাদ দিয়ে কেবল সোজাসুজি আলোকচিত্র দেখার অর্থ হচ্ছে আলোকচিত্রের গূঢ় অর্থপূর্ণ দিকটিকে ভুল বোঝা।

তথ্য নির্দেশিকা :

1. The Weight of Photography; Edited by Johan Swinnen & Luc Deneulin
2. Criticizing Photographs; Terry Barrett
3. On Photography; Susan Sontag
4. Counter FOTO; Edited by Saiful Huq.

লেখক : ভাইস প্রিন্সিপাল, পাঠশালা।

সাইদা খানম : জীবন ও কর্ম দীন মোহাম্মদ শিবলী

একজন আলোকচিত্রী হিসেবে বেড়ে ওঠার যাত্রায় আমার জীবনের অতীত অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে সব সময় ভাবায়। অনেক প্রশ্ন জন্মে প্রতিনিয়ত। আবার জমাও থেকে যায় কিছু কিছু। যেমন একটি প্রশ্ন করি নিজেকে সবসময়, 'আমার জীবনে ফটোগ্রাফির বীজ কখন প্রথিত হয়েছিল?' সে কারণেই অন্য একজন ফটোগ্রাফারের সাক্ষাৎকার নিতে প্রথমেই আমার জানতে ইচ্ছে করে তাঁর গুরুটা। আবার ফটোগ্রাফি স্কুলের একজন শিক্ষক হিসেবে নানা ফটোগ্রাফারের ছবি দেখেই তাঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। সাইদা খানম-বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী। তাঁর কিছু ছবি নানা মাধ্যম ঘুরে আমার হাতে এসেছিল। এর কিছু ছবি 'বাংলাদেশের আলোকচিত্রের ইতিহাস' পড়াতে আমি ব্যবহার করি সব সময়। শিক্ষার্থীদের সেসব ছবি দেখাই এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় নানামাত্রিক কথা বললেও অনেক প্রশ্ন জমা থেকেই যায় মনের ভেতর। সবকিছু মিলিয়ে জুন মাসের (২০১২) এক বিকেলে প্রথম মুখোমুখি হই সাইদা খানম আপার। আমার ভেতর জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টাই ছিল পুরোটা সাক্ষাৎকারে। এরপর বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে কথা হয়েছে কয়েকবার। তার কিছুটা এখানে তুলে ধরলাম।

আপনি কী হতে চেয়েছিলেন বা কী হওয়ার স্বপ্ন ছিল আপনার?

এভারেস্টে ওঠার স্বপ্ন ছিল আমার (হাঁসতে হাঁসতে)। কিছুদিন আগে নিশাত ও ওয়াসফিয়া নারী পর্বতারোহী বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন। পুরো জাতি এতে আপ্ত এবং আমিও এর বাইরে নই। কিন্তু আমার স্বপ্ন অধরা থাকলেও ওদের বিজয়ে আমিও शामिल হয়েছি। এতে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে মনে করি।

আপনি ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন কীভাবে এবং প্রথম ক্যামেরা কীভাবে আপনার হাতে এলো?

আমার মেজো আপা হামিদা খানম, যিনি হোম ইকোনমিকস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাঁর বন্ধু লুৎফুল্লাহ চৌধুরী আমাকে একটি কোডাক বক্স ক্যামেরা উপহার দেন। আমার প্রথম যে ছবি ছিল, সেটি কলকাতার একজন কাবুলিওয়ালার। রবিঠাকুরের কাবুলিওয়ালা আমার মনের ভেতরে ভীষণ দাগ কেটেছিল। সে জন্যই আমি এই ছবি তুলি।

এই কাবুলিওয়ালাকে কোথায় পেলেন?

হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে।

সালের কথা জিজ্ঞেস করতেই হেসে ফেললেন। আমি অন্য পথ ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বয়স তখন কত ছিল?

এই মনে করো চৌদ্দ-পনেরোর মতো।

আবার জানতে চেষ্টা করি, বক্স ক্যামেরা তো খুব বেসিক ধরনের ক্যামেরা ছিল। কীভাবে শিখলেন ছবি তোলা?

কোডাক প্রথম রোল করা ফিল্ম এবং ছোট বক্স ক্যামেরা বাজারজাত করে উনিশ শতকের শেষে নব্বইয়ের দশকে। আমি যখন বক্স ক্যামেরা হাতে নিই, তখন যথারীতি এ ধরনের ক্যামেরার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেছে। টিপ মারলেই তো ছবি উঠত। বড় বড় ফিল্ম ছিল। এখনকার মতো ছোট ছোট না এবং দেখা যেত না। ফটোগ্রাফিতে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো, কিশোরী বয়সে কলকাতায় কোনো এক গ্যালারিতে 'লাইফ' শীর্ষক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখতে যাই। বিশাল বিশাল সব প্রিন্ট ছবি। আমেরিকান ফটোগ্রাফারদের ছবি। মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসার সব ছবি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছবি দেখছিলাম। ছবি

দেখতে দেখতে তাঁর সঙ্গে আমার তর্ক হয়। কেননা, আমার কাছে মনে হয়েছিল, ফটোগ্রাফি শুধুই ফটোগ্রাফস তৈরি করে না, এটি শিল্পমাধ্যম। ছবি আঁকা যেমন শিল্প, ফটোগ্রাফিও তেমনই শিল্প। কিন্তু সে বলল, ফটোগ্রাফি শিল্প নয়। তখন আমি বলেছিলাম, আমি দেখিয়ে দেব ফটোগ্রাফি একটি শিল্প। বক্স ক্যামেরাতেই ছবি তুলি, কিন্তু মন আর ভরে না। যাঁর কাছে দেখতাম ভালো ক্যামেরা আছে, বলতাম- দাও না আমাকে, ছবি তুলি। অনেকে দিত, অনেকে দিতে চাইত না। কেননা, আনাড়িকে ক্যামেরা দেওয়া উচিত হবে কি না ভাবত। অনেকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে। মন খারাপ হতো। তখন আমার আপা, হামিদা খানম পড়ালেখা করতে আমেরিকা গেলে আমার জন্য একটি 'রোলিকড' ক্যামেরা এনে দেন। এই 'রোলিকড'টা পেয়েছিলাম বলেই মনের মতো ছবি তুলতে পেরেছি। তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরোর মতো।

আপনি কি নিয়মিত প্রদর্শনী দেখতে যেতেন?

না, সে রকম নয়। প্রদর্শনী খুব একটা হতো না। গ্যালারির বলতেও তেমন গোছানো কিছু ছিল না।

আপনার সঙ্গে 'বেগম' পত্রিকার যোগাযোগ কীভাবে হলো?

'বেগম' পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এলো দেশ ভাগের পর। তখন আমার কবি খালা মাহমুদ খাতুন সিদ্দিকা আমাকে নিয়ে গেলেন 'বেগম' অফিসে। ঢাকা তখন ছোট মফস্বল শহর। খালা আমাকে নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি নারী প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সব সময় প্রেরণা দিতেন। তিনি আমাকে প্রথমেই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলেন। বেগমের কাভারের ছবি তুলতে হবে এবং ভেতরের জন্যও নানা ধরনের ছবি তুলতে হবে। মেয়েদের খেলাধুলা, সভা-সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে হবে। আমি তখন থেকেই দুই ধরনের ছবি তুলতে শুরু করি। একটি হলো, গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদীনালা, পোর্ট্রেট- এসব ছবি, যেগুলো কাভারের ওপর দেওয়ার জন্য। অন্যটি হলো বিভিন্ন নারী কর্মকাণ্ডের ছবি।

আমার ফটোগ্রাফির সূচনা কলকাতায় হলেও তার ধারাবাহিকতা এবং পরিপূর্ণতা আসে পাকিস্তান সময়ে ঢাকায়। ঢাকা অত্যন্ত ছোট মফস্বল শহর বিধায় 'ফটোগ্রাফি' বিষয়টিই ক্ষুদ্র একটি গণ্ডিতে চর্চা হতো। মাত্র দুটি স্টুডিও ছিল এবং তারাই ফিল্ম ডেভেলপ, প্রিন্ট এগুলোতে সহায়তা করত। পুরান ঢাকার একটি স্টুডিও ছিল ডাস এবং অন্যটি হলো জায়েদি স্টুডিও। এই জায়েদি স্টুডিওর জায়েদ ভাই নন-বেঙ্গলি ছিলেন এবং তিনি আমাকে ফটোগ্রাফির বিষয়ে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও সহায়তা করেছিলেন। আমার ছবির কম্পোজিশন তাঁকে অবাক করেছিল। মূলত অনুপ্রেরণা দিতে এবং ভালো ছবি তুলতে সাহায্য করতেই তিনি বেশ কিছু বিদেশি ফটোগ্রাফি-বিষয়ক পত্রিকা আমার হাতে তুলে দেন। মূলত আমার ফটোগ্রাফির প্রথম প্রশিক্ষক ছিলেন এই জায়েদ ভাই।

আপনি কি নিয়োগপ্রাপ্ত পেশাজীবী আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ করতেন?

না না, আমার কোনো বেতন ছিল না। শুধু ফিল্ম ডেভেলপ এবং যাতায়াতের টাকা পেতাম। এটা কোনো চাকরি ছিল না। কিন্তু দেশের ভেতরে বা বাইরে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে গেলে কাগজপত্র যা যা প্রয়োজন হতো, সবই পেতাম।

সে সময়ের সংবাদপত্রের ফটোসাংবাদিকদের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ, যোগাযোগ হতো?

না, খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। আমি আমার মতো ছবি তুলতাম। সত্যিকার অর্থে কেউ আমাকে কোনো সাহায্য করেনি। অন্য কোনো নারী ফটোগ্রাফারও ছিলেন না।

'বেগম' পত্রিকায় কত দিন কাজ করেছেন?

আমি এখনো মাঝেমধ্যে বেগমে ছবি দিই। নিয়মিত নই। তবে সম্পর্কের ছেদ হয়নি। বেগম ছাড়াও আমি আরও বিভিন্ন পত্রিকায় ছবি দিতাম। তখন সেগুলো বের হতো। অবজারভার, মনিং নিউজ, দৈনিক বাংলা, পাকিস্তান নিউজ, বাংলার খবর, সংবাদ, ইন্ডেক্স- সবগুলোতে ছবি ছাপা হতো।

আপনি কীভাবে কাজ করতেন বা ছবি দিতেন?

আমি সরাসরি পত্রিকা অফিসে গিয়ে ছবি দিয়ে আসতাম। আমি চিত্রালীর হয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি তুলতাম। বিশেষ করে, কলকাতায় গেলে ক্যামেরা নিয়ে স্টুডিও মহলে ঘুরে বেড়াতাম। তৎকালীন চিত্রালীর সম্পাদক বলে দিতেন, কোথায় গেলে কাকে পাওয়া হবে। আমি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সিনেমার শুটিংয়ের ছবি তুলতাম।

তাহলে কি স্টুডিও মহলে ছবি তুলতে গিয়েই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয়?

না, সেভাবে নয়। আমি সরাসরি তাঁর সাক্ষাৎকার নিতেই কলকাতায় যাই। এর আগে স্টুডিও মহলেই ছবি তুলেছি ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, মলিনা দেবী, সৌমিত্র, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখের। তাঁরা খুব অবাধ হতেন এ বিষয়টি ভেবে, একজন নারী হয়ে আমি ক্যামেরা হাতে ছবি তুলছি। আমাকে ডেকে গল্প করতেন এবং আগ্রহ হয়ে ছবি তুলতে বলতেন। সত্যজিৎ রায়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য পারভেজ সাহেবকে বললেও তিনি প্রথম দিকে আগ্রহ দেখাতেন না। কলকাতায় এলে ছবি বিশ্বাস এবং অন্যরা বললেন, সত্যজিৎদা বেশ গম্ভীর মানুষ, সহজেই সাক্ষাৎকার দেন না; ছবি তোলেন না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যিনি 'পথের পাঁচালী' তৈরি করেছেন, একজন মানবদরদি মানুষ, তিনি আবার এত কঠিন হবেন কেন? আমি ফোন করলাম তাঁকে। এটা ১৯৬২ সালের কথা। ঢাকা থেকে ফোন করেছিলাম এবং তিনি আসতে বললেন কলকাতায়। আমি কলকাতায় গেলে মামার বাড়িতে উঠতাম। সত্যজিৎ রায় আমাকে ফোন করার দুদিন পরে আসতে বললেন। তখন হেমন্তকাল ছিল। হালকা ঠাণ্ডা। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখি, চাদর গায়ে তিনি কী যেন লিখছেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, তিনি এত বড় একজন পরিচালক আর আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ, আমি কী সাক্ষাৎকার নেব? ভাবলাম, ফিরে আমি। তিনি ভেতরে আসতে বললেন। আমি সালাম দিলে তিনি বসতে বললেন। এরপর তিনি আবার লিখতে শুরু করলেন। দীর্ঘক্ষণ পর মুখ তুলেই আমার দিকে তাকিয়েই রইলেন। তাকিয়ে থেকে কী ভাবলেন, আমি জানি না। তবে আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

তিনি আমাকে হঠাৎ জানতে চাইলেন, 'আপনি আমার সম্পর্কে কী জানতে চান?' প্রশ্নটা ছিল অনেক কঠিন। আমি জানতাম, তিনি কিছুদিন আগে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটি করে এসেছেন। সেটা তাঁর নিজের লেখা, নিজের পরিচালনায় কালার সিনেমা। আমার গল্পটা জানা ছিল না। তাঁকে বললাম, যদি গল্পটা বলতেন, তাহলে এটা নিয়ে লিখতাম। তিনি বলতে শুরু করলে আমি তার ভেতর থেকেই প্রশ্ন করে করে আমার সাক্ষাৎকার এগিয়ে নিলাম। কে কে অভিনয় করেছেন? কার অভিনয় কেমন ছিল? সবচেয়ে ভালো করেছিলেন ছবি বিশ্বাস, সেটি বললেন। তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোও জেনে নিলাম। সাক্ষাৎকার শেষে ছবি তুলতে চাইলে তিনি সাংঘাতিকভাবে খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'আমার দেশে মেয়েরা এই লাইনে আসেই না, কিন্তু তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগল।'

তখন কোন ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন?

এই রোলিকড দিয়েই। ঘরের মধ্যে হওয়ায় আমি বাব্ব ফ্যাশ দিয়ে কিছু ছবি তুলি। ফ্যাশের আলো দেখে পাশের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায় বেরিয়ে এলেন দ্রুত, দেখার জন্য যে কী হলো। তিনি এসে আমার হাতে ক্যামেরা দেখে হেসে ফেললেন। তিনি অনেক আদর-যত্ন করেছেন। তিনি সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি যখন কলকাতায় আসবে, অবশ্যই চলে আসবে এখানে।' এর পর থেকে আমার আর কখনোই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়নি সত্যজিৎ রায়ের; এবং ৩০ বছর তাঁর ছবি তুলি। তাঁর মৃত্যুর পর

প্রবন্ধ

সেসব ছবি নিয়ে প্রথমে ঢাকায় ও পরে কলকাতায় প্রদর্শনী করি। ভারতীয় হাইকমিশনারের উদ্যোগে বড় বড় প্রিন্ট করে কলকাতার নন্দনে প্রদর্শনী হয়। কলকাতায় বিপুল সাড়া পড়ে প্রদর্শনীর জন্য। এত প্রেসের মানুষজন এসেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শুধু যে কলকাতায় মানুষ তা-ই না, অন্য রাজ্য থেকেও মানুষ এসেছিলেন অনেক।

মনজুর আলম বেগ, গোলাম কাশেম ড্যাডি- তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটে কীভাবে?
বেগ সাহেব যখন সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ছিলেন, তখন তিনি বিদেশে ছবি পাঠানোর জন্য আমার ছবির প্রিন্ট করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি তো ফটোগ্রাফিতে ছিলেন এবং ডার্ক রুমে কাজ করতেন। ডার্করুমে গিয়ে মাঝেমাঝে কাজ করতাম প্রিন্টের জন্য। সেখানে থেকেই পরিচয়। তাঁকে আমার ছবি দেখাতাম এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠাতে তাঁর পরামর্শ নিতাম। তিনি ভীষণ সাহায্য করতেন ও অনুপ্রেরণা দিতেন। এরপর তাঁর হাত ধরে বেগার্ট ইনস্টিটিউট হলে যেতাম গল্প করতে। জানতে চাইতাম, বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে, ফটোগ্রাফির টেকনিক ইত্যাদি। তখন আমি বেগমে কাজ করলেও খুব একা কাজ করতে হতো। কেউ ছিল না সাহায্য করার।

১৯৭১ সালে আপনি যে ছবিগুলো তুলেছিলেন, তার পেছনে কী অনুপ্রেরণা ছিল?

১৯৭১ সালে মার্চে ঢাকায় প্রচণ্ড আন্দোলন চলছে। তখন মেয়েরাও বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। আজিমপুর মাঠে প্রশিক্ষণ চলত। আমি সেখানে গিয়েই ছবিগুলো তুলি। এগুলো শুধু বেগমের জন্য তুলিনি। নিজের মধ্যে তাগাদা ছিল, ইতিহাস ধরে রাখার। তখন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধারণ করছি কি না, তা বলতে পারব না, তবে নারী জাগরণের চিত্র ধরে রাখতেই আমার চেষ্টা ছিল বেশি। আমার শুধু মনে হতো, আমি যেন দেশের কাজ করছি। ছবিগুলো দেখে যেন গ্রামের মেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়, সে চেষ্টাও ছিল সব সময়।

সাদ্দা খানমের তুলে রাখা ইতিহাসের নানা প্রান্তের ছবিগুলো এখনো তাঁর কাছে বাস্তববন্দী হয়ে আছে। অনেক নেগেটিভ হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু ছবি টিকে আছে মাত্র। এই অসামান্য 'ভিজ্যুয়াল হিস্ট্রি' সংরক্ষণের নেই কোনো জাতীয় ব্যবস্থা। তিনি আশা করেন, এগুলো টিকে যাবে, কিন্তু কীভাবে তা তাঁর জানা নেই। একজন নারীর চোখে বাংলার নারীর রিপ্রেজেন্টেশন কেমন, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে সাদ্দা খানমের তোলা ছবির মধ্য দিয়ে। সেই চেষ্টা হওয়া জরুরি। সাক্ষাৎকারের শেষে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিশোরী বয়সে 'লাইফ' প্রদর্শনী দেখে তাঁর মধ্যে যে জেদ চেপেছিল আমি ফটোগ্রাফি-আর্টিস্ট হবো, সে বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি কী? তিনি বললেন, আমি নিজেকে অবশ্যই আর্টিস্ট মনে করি।

লেখক; শিক্ষক, পাঠশালা।

আব্দুল্লাহ এইচ. কাফি

একজন চিত্রশিল্পীর কাছে তার হাতের পেন্সিলটি কিংবা রং তুলিটি যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একজন আলোকচিত্রীর কাছে তার ক্যামেরাটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে আলোকচিত্র শিল্পে ডিজিটাল ক্যামেরার আবির্ভাব যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। দিনদিন এর ব্যবহারের পরিধিও বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশে আলোকচিত্র শিল্পীরা অনেকেই তাদের ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। আর এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এদেশের আলোকচিত্রীদের সাথে ক্রমাগত প্রতারণা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অনুমোদিত ডিলারদের চেয়ে কিছু কমদামে ক্যামেরা কেনার লোভ দেখিয়ে ঐ সকল ব্যবসায়ীরা খুব ভালভাবেই আকৃষ্ট করছেন ক্রেতাদের। আর এ বিষয়ে কিছুটা অজ্ঞতার কারণে নবীন আলোকচিত্রী শিল্পীরাও ছুটছে তাদের পেছনে। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে ডিলারদের চেয়ে কম দামে ঐ সকল ব্যবসায়ীরা কিভাবে ক্যামেরা বিক্রি করছেন, নাকি ডিলাররাই বেশি দামে ক্যামেরা বিক্রি করছেন? এ প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজেই মেলে। শুধু প্রয়োজন একটু চিন্তা করার। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ঐ সকল ব্যবসায়ী ক্যামেরার ব্যবসা করছে শুধু ক্যামেরা বিক্রি করার জন্য। কিন্তু ক্যামেরার ওয়ারেন্টি বা সার্ভিসিংয়ের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কোথায়? বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অনুমোদিত ডিলার ছাড়া অন্য কেউ যদি বলে তারা কোন কোম্পানির ক্যামেরার ওয়ারেন্টি কিংবা উন্নতমানের সার্ভিসিং দিয়ে থাকে তাহলে সেটি নিতান্তই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া ও ক্যামেরাটি পুরাতন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে হাতুড়ে কারিগর দ্বারা পরিচালিত এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্ভিসিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। যেখানে এসব হাতুড়ে বা আধা শিক্ষিত কারিগররা উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে হাতের সাহায্যে ক্যামেরা মেরামত করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফাররা এরকম হাতুড়ে কারিগরদের কাছ থেকে তাদের ক্যামেরা সার্ভিসিং করিয়ে সাময়িকভাবে লাভবান হলেও ভবিষ্যতে তারা অনেক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্যামেরার ক্ষতির জন্য আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার যত্ন সম্পর্কেও অজ্ঞতাও কোন অংশে কম দায়ী নয়। কারণ ক্যামেরা নামক যন্ত্র দিয়ে সুন্দর সুন্দর শিল্প সৃষ্টির জ্ঞানের পাশাপাশি এ যন্ত্রটির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকাও ফটোগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ কারিগর দ্বারা পরিচালিত সার্ভিসিং সেন্টারগুলো দাবী করছে তারা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা, কোনো ক্যামেরা কোম্পানি তাদের সার্ভিস ট্রেনিং বাইরের কাউকেই দেয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যামেরা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নজির আছে কেবলমাত্র হাতেগোনা কিছু অনুমোদিত ডিলারের। এর মধ্যে ক্যানন ক্যামেরা সার্ভিসিং এবং বিক্রির জন্য ক্যাননের অনুমোদিত ডিলার জে.এ.এন এসোসিয়েটস অন্যতম। বাংলাদেশে একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটিই সরকার অনুমোদিত ক্যানন ক্যামেরা আমদানী ও উন্নত মানের সার্ভিসিং প্রদান করে থাকে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে জে.এ.এন এসোসিয়েটসের রয়েছে ক্যাননের আধুনিক ও মূল সফটওয়্যার প্রযুক্তি এবং দক্ষ কারিগর। তবে যাই হোক ক্যামেরা কেনার আগে নতুন আলোকচিত্রীদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তারা যে ব্র্যান্ডের ক্যামেরাই কিনুক না কেন সেটা যেন অনুমোদিত ডিলারদের কাছ থেকে কেনেন। সামান্য কিছু কম দামে কেনার লোভে যত্রতত্র গড়ে ওঠা ক্যামেরার দোকান কিংবা হাতে হাতে বিক্রয়কারীদের কাছ থেকে কিনলে ক্যামেরার সত্যিকারের ওয়ারেন্টি, সার্ভিসিং কিংবা ক্যামেরাটির আসল বা নকলের প্রশ্নটি থেকেই যাবে।

সাংবাদিকতা ও কিছু কথা

নাজমুল হোসেন

সম্প্রচার মাধ্যমের সংবাদকর্মী হিসেবে ফটোসাংবাদিকদের সাথে দেখা হয় প্রতিনিয়তই, সেমিনারে, রাজপথে। ফটোগ্রাফির প্রতি প্রবল দুর্বলতা আছে। কিন্তু তাতে কি? আমার রিজিক জোটে টেলিভিশনে রিপোর্ট করে। কিন্তু মাঠে-ময়দানে ফটোজার্নালিস্ট ও টেলিভিশন ক্যামেরাজার্নালিস্টদের অসাধারণ সাহসিকতা দেখে অবাক হই। প্রচণ্ড এ্যাকশনে কিংবা বুলেট-টিয়ারশেলের মধ্যে যেভাবে তারা ছুটোছুটি করেন সত্যিই রোমাঞ্চকর ও ভীতিকর। তবুও তাদের নিত্য ছুটতে হয়, ছবি সন্ধানে; ইতিহাসকে লেন্সে ধারণ করতে।

দেশে দুই ধারার ফটোগ্রাফার বিদ্যমান। পেশাদার; অপেশাদার। ফটোসাংবাদিকতা; ফ্যাশন ফটোগ্রাফি। লেন্স, অ্যাপারচার, শাটারস্পিড এসব হিসেব নিয়ে রোজকার ব্যস্ততা। কিন্তু লেন্সের আড়ালে লুকিয়ে আছে কত গল্প, কত কষ্ট। থাকে অজানা অধ্যায়। পেশাগত ইর্ষা কিনা জানিনা ফটোগ্রাফারদের সাথে টিভি ক্যামেরাম্যানদের মাঝে মাঝেই বচসা হয়। অগত্যা সহকর্মীদের পক্ষ নিতে হয়। তবে এই সম্পর্কটা অতটা অম্ল তা কিন্তু নয়। দু'জনেরই কাজ ছবি তোলা। টিভিক্যামেরাম্যানরা চলমান চিত্র আর ফটোসাংবাদিকরা স্থিরচিত্র ধারণ করেন। তবে প্রায়শই তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব দেখা দেয়। অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে গিয়ে একে অপরকে যেভাবে চিৎকার করে সরে যেতে বলেন, তা সত্যিই হতাশাজনক। কেন এমনটা হবে?

কিছু শ্রমিকটু শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যেমন; সম্প্রচার ক্যামেরা সাংবাদিকরা ফটোসাংবাদিকদের বলে 'স্টিল' আর উল্টো আমাদের বলা হয় 'ডান্ডা বা চোঙা সাংবাদিকতা'। এধরনের শব্দচয়ন নিয়ে আগে আপত্তি তোলা হয়ে গেলেও এখন গাসওয়া হয়ে গেছে।

আট বছর আগের কথা। ক্যাম্পাস জীবন শুরু থেকেই ইচ্ছা ছিল সাংবাদিকতা করার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টিভিক্যামেরা দেখলেই ছলেবলে ক্যামেরার সামনে ঘুরাঘুরি করতাম। যদি টিভিতে দেখা যায়! বিষয় এখন হাড়ে হাড়ে টের পাই। কারণ রিপোর্টিং স্পটে অতিসাহসী জনগণ যখন ক্যামেরার সামনে চড়কির মত ঘুরতে থাকেন তখন বিষয়টি বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য তাদের মাঝে একদা নিজেকেই খুঁজে পাই।

প্রথম বর্ষে ধারণা ছিল, যারা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরাঘুরি করেন তারাই সাংবাদিক। যার লেন্স যত বড় তিনি মনে হয় তত বড় সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় ক্যারিয়ার শুরুর পর ধারণা পাল্টে গেছে। এখন স্পটে সেই বিখ্যাত ফটোসাংবাদিক পাভেল ভাই, এনাম ভাই, গোর্কি ভাই, জিয়া ভাই, ফিরোজ ভাই, অপু ভাই, জয় ভাই, কল্লোলভাই, কাজল ভাইদের সাথে দেখা হলে পুলকিত হই। তবে ফটোসাংবাদিক হওয়ার সুপ্ত বাসনা পূরণ না হওয়ার ক্ষেদ আছেই বহাল তবিয়ে। ভাবি ইস যদি তাদের মত ফটোগ্রাফার হতে পারতাম!

আগেই বলেছি, ফটোগ্রাফির প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। তাই ফটোসাংবাদিকদের সাহসিকতা বরাবরই আমাকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু যখন দেখি ফটোগ্রাফি নিয়ে এত গ্রুপিং, এত পলিটিং তখন খুব ব্যথিত হই। গ্রুপ পলিটিক্সে বাংলাদেশে এ আর নতুন কি? তবে প্রশ্ন ফটোগ্রাফাররা কেন একে অপরের উন্নতি সহ্য করতে পারেন না? যদিও প্রশ্নটি সরাসরি হয়ে যায়; কিন্তু আমি রিপোর্টিং খাঁচের সোজাসাপ্টা কথা বলতে পছন্দ করি।

প্রবন্ধ

ফেসবুকে বাংলাদেশ ওল্ড আর্কাইভ নামের একটি গ্রুপ আছে। মাঝেমাঝেই গ্রুপটির ওয়ালে দেড়শ বছরে পুরোনো ছবি দেখি। এমনকি ছয় দশক বা ত্রিশ বছর আগের পুরোনো ছবিগুলো দেখে শিহরিত হই। ছবিগুলো ব্রিটিশ আর্কাইভ থেকে সরবরাহকৃত। কিন্তু আমার প্রশ্ন ব্রিটিশ ফটোগ্রাফারদের ছবি যদি যুগ-যুগান্তরে সংরক্ষিত থাকলে আমাদের ফটোগ্রাফারদের অনুপস্থিতি কেন? যদিও নিজের তোলা ছবি কেউ পাবলিক সম্পত্তি হতে দেবেন না। তাই বুঝি এই বঞ্চনা!

অনেক খ্যাতনামা ফটোসাংবাদিকদের প্রয়াণের সাথে সাথে তার ছবিগুলোও সমাহিত হয়ে যায়। আর হারিয়ে যায় ইতিহাসের অনেক নিদর্শন। আর আমরা যারা পরের প্রজন্মের, ইতিহাসকে হাতড়ে বেড়াতে গিয়ে বঞ্চিত হই।

আরেকটি বড় অভিযোগ, আমাদের ফটোগ্রাফাররা তাদের ছবিগুলো সংগ্রহ করেন না। অলসতা নাকি খামখেয়ালিপনা? তারা ছবি তুলে যান নিরন্তর। কিন্তু ছবিগুলো যে ইতিহাসের অংশ সেদিকে খেয়াল দেয় না অনেকেই। অযত্ন আর অবহেলায় অনেক দুর্লভ ছবি হারিয়ে যায়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস সমৃদ্ধ। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ফটোসাংবাদিকতা। অথচ ক'টা পত্রিকা অফিসে ফটো আর্কাইভ আছে। খোদ ইণ্ডেফাকের মত পত্রিকায় সময় অনুযায়ী ছবিগুলো নিয়ে আর্কাইভ নেই। তবে আছে, পত্রিকার সংখ্যার আর্কাইভ। অথচ উপেক্ষিত ফটোগ্রাফি। কিন্তু কেন? তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ফটো আর্কাইভ করা কি এতটাই কঠিন কাজ। ছবি স্ক্যান করে ডিভিডি কিংবা হার্ডড্রাইভে রাখতে কয় টাকা খরচ হবে? অথচ অবহেলায় আমাদের ঋদ্ধ ইতিহাস যাচ্ছে হারিয়ে!

ফটোগ্রাফারের মানদণ্ড কি? রামসাম যদুমধুদের ফটোসাংবাদিকতা করার লাইসেন্স দেয়া কতটা সমীচিত? দায়টা অনেকটা পত্রিকা অফিসগুলোর। অল্প টাকায় ফটোগ্রাফার পেতে গিয়ে আনাড়িদের হাতে তুলে দেয় ক্যামেরা। ঢাকার বাইরের চিত্র আরও ভয়াবহ! একই অবস্থা অনেক টিভিক্যামেরা জার্নালিস্টদের বেলায়। কমিটমেন্টের জায়গায় তাদের ঘাটতি কলংকিত করে সাংবাদিকতাকে। কোন সমাধান আছে কি?

বিগত ক'বছর ধরে টিভিক্যামেরা জার্নালিস্টরা তাদের অবস্থান সুসংহত করতে পেরেছে। পেশাদারিত্বের জায়গায় ছাড় দিতে নারাজ। বেতন-ভাতায় দরকষাকষিতে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। পাশাপাশি মালিকপক্ষ কিন্তু তাদের মূল্যায়ন করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ ফটোগ্রাফারদের প্রতি পত্রিকা মালিকপক্ষের আচরণ এখনও অপরিবর্তিত। কেন? এই অবস্থার জন্য দায়টা কার? আবার ফিরে আসি সিনিয়রদের সেই গ্রুপিং এবং দলীয় লেজুরবৃত্তির কথায়।

বাংলাদেশে ক'টা পত্রিকা অফিসে ফটো এডিটর পদ আছে? আর থাকলেও তাদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কি আদৌ একজন নিউজ এডিটরের সমপর্যায়ের। অথচ কায়িক শ্রম ও সৃষ্টিশীলতায় একজন ফটোসাংবাদিক অনেক বেশি আন্তরিক। অথচ ফটোসাংবাদিকের বয়স যত বাড়ে তার চাকুরীর নিরাপত্তা তত প্রকট হয়। আর অবসরকালীন সময়ে নেই পেনশন সুবিধা, প্রাপ্য সম্মান। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। তবে সময় এসেছে সব জড়তা আর ভেদাভেদ ভুলে যাবার। অনেক হয়েছে অভিমান, বিভেদ ভুলে গিয়ে একই ছায়াতলে আসা কি আদৌ সম্ভব? আমি আশাবাদী; সবই সম্ভব। সুকান্তের কবিতার মত,

অবশেষে সব কাজ সেরে, আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে

করে যাব আশীর্বাদ, তারপর হব ইতিহাস।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশে আলোকচিত্র

পাভেল রহমান

ফটোসাংবাদিকতার শুরুটা আমি যেভাবে করেছি, একটা সময় তার চেয়েও খুব কঠিন ছিল কাজটা। ১৯৫২ সালের কথা যতদূর শুনেছি, তখন আমাদের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার তেমন ভাবে কাজ করতেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র অথবা শিক্ষক যারা তাদের ক্যামেরা দিয়ে যেভাবে পেরেছে কাজ করেছে এবং সেগুলোই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তখন বুলেটিন আকারে ছবি ছাপা হত। কারণ পত্রিকায় ছবি ছাপা হলে সব পত্রিকাকে পুলিশ দ্বারা নিগৃহীত করা হয়েছে। বুলেটিন আকারে যেসব ছবি ছাপা হত সেগুলো দেয়ালে স্টেটে দেয়ার পরে মানুষের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া হত সেখানেও ক্যামেরা ও ছবির ভূমিকা রয়েছে। তখন স্টুডিও থেকে ফটোগ্রাফাররা যে ছবি তুলে আনতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলিবিদ্ধ ছাত্র যখন মেডিকেল কলেজে যেত, তখন সেই সব ছবি তুলে এগুলো প্রচার করা হত। সে ছবি ঢাকার বাইরে না গেলেও ঢাকার ভিতরে যে আলোড়ন তুলেছিল তা ছিল অকল্পনীয় একটি ঘটনা। স্বাধীনতার আগে যে সমস্ত ছবি তোলা হত, সে সমস্ত ছবি প্রিন্ট করাও একটা বিরাট ঝামেলা ছিল। কারণ, পুলিশি বাধা থাকত। তার মধ্যেও আমানুল হক সাহেব বা আমাদের রফিকুল হক স্যার যা করেছেন তা অনেক অনেক বেশি মূল্যবান ও প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতার আগে যেমন ছবি ছাপা হত ব্লকে, জিংক প্লেটে পত্রিকার জন্য। আজাদ পত্রিকা অথবা সংবাদ বা ইত্তেফাকে তখন ছবিগুলো কিয়ার ছিল না, তবুও একটা কিছু মেসেজ নিয়ে আসত ছবিগুলো। তখন ছবিগুলো দেখার জন্য আমরা উদগ্রীব ছিলাম। সেটা ১৯৬৫ সালে, যখন আমি একদমই ছোট। আমরা তখন যশোরে ছিলাম। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে বঙ্গবন্ধু ও আরো অনেকের ছবি ছাপা হত। কোর্টের এবং অন্যান্য বিভিন্ন সময়ের সেই সব ছবি আমরা দেখতাম। আমি যশোরের কথা বলছি, সেখানে কিছু দেখতাম। ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমি যখন ঢাকায় এসে পৌছাই তখন ছবিগুলো অনেক কিয়ার হয়েছে কেবল। আরেকটু ইমপ্রুভ হয়েছে পত্রিকায়। যারা ফটোসাংবাদিকতা করতেন সেই সময়ে তারা ছবি তুলে যে মেসেজ দিতেন সেটাই ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্মুখে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার। কারণ রেডিও, টেলিভিশন ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে। পত্রিকাও নিয়ন্ত্রণ করত সরকার। কিন্তু তারপরেও ছবি ছাপা হত এবং সেই ছবি দেখে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে আন্দোলন গড়ে উঠত। টেলিভিশন বা রেডিওতে শুনে কিন্তু তা হয়নি। সেসময় একমাত্র বাহন বলতে ছিল ক্যামেরা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারার পরিবর্তনে ফটোসাংবাদিকতার ভূমিকা আমি বলব অনন্য ও অতুলনীয়। এই ভূমিকাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।

ছবি যে কতো শক্তিশালী হতে পারে তা আমি আমার নিজের তোলা একটা ছবির কথায় স্মরণ করতে চাই। ১৯৮৭ সালে পহেলা জানুয়ারী যে ছবিটা তোলা হয়েছে 'নূর হোসেনের' 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' খ্যাত ছবিটি। এই ছবিটি সাংঘাতিকভাবে মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল এবং একটি সরকারকে পতনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি আমার এই ছবিটা দেখেই বুঝতে পারি আগের ছবিগুলো কত শক্তিশালী হয়েছিল এবং কিরূপ ভূমিকা রেখেছিল। আইয়ুব শাহী ও ইয়াহিয়া খানের পতনের বিরুদ্ধে এবং আমাদের বিশাল পাওয়া স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ফটোগ্রাফির ভূমিকা ছিল অনন্য। সেই স্বাধীনতার ভূমিকায় যেসব আলোকচিত্র বা যেসব আলোকচিত্রগ্রাহী ও বাহকরা রয়েছেন তাদের ছবি সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়িত করেছিল। সেই ছবিগুলো যা এখন আমরা ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখি। এক একজন ফটোসাংবাদিক যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছবির মাধ্যমে ধারণ করেছেন তারা এক একজন

অনুলিখন

আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের রূপকার। তারা তাদের ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে সারা দেশে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ছবিগুলো আগামী প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিবে এই দেশের মানুষ এবং ফটোসাংবাদিকদের ভূমিকা। মানুষ ইতিহাসকে চোখের সামনে দেখতে পাবে। আমাদের দেশে এমনিতেই শিক্ষিতদের হার অনেক কম। সেই তুলনায় আমি বলব যে একটি ছবির ভূমিকা যা হাজার শব্দের চেয়ে শক্তিশালী (যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি) তার ভূমিকা অসাধারণ। একটা অশিক্ষিত মানুষ পড়তে পারে না কিন্তু সে একটা ছবি দেখে আলোড়িত হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ে। তার এই চেতনাকে বহন করে আমরা যে ছবি তুলি, ক্যামেরার মাধ্যমে যে মেসেজটা পৌঁছানোর চেষ্টা করি, তা আমি বলব সেটা শত শত ভাগ সত্যি এবং শতভাগ সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। আমি ফটোসাংবাদিকতায় অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন যারা, দেশের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামগুলিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের স্মরণ করি। ভবিষ্যতে যারা আলোকচিত্রী হিসেবে আসবেন তারাও একই ভূমিকা রাখবেন এবং আমাদের গণতন্ত্রকে ফটোসাংবাদিকতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। গণতন্ত্রের আন্দোলন ছাড়া ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়ছে। ১৯৭০ সালে হাজার হাজার প্রাণ চট্টগ্রামের উপকূলে ঝড়ে জীবন দিয়েছিল। সেই ছবিগুলো আমি যখন দেখি তখন আমার গোলাম মাওলার কথা মনে পড়ে। যিনি দৈনিক পাকিস্তানে কাজ করতেন। তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যখন শিক্ষকতা ছেড়ে ফটোসাংবাদিকতা করলেন তার সেই ছবিগুলো আমাকে খুব আলোড়িত করেছিল। এবং আমি বলব যে সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ছবিগুলো দেখলাম পরবর্তীকালে জলোচ্ছ্বাসের যে ছবিগুলো দেখেছি, নীল আর্মস্ট্রং-এডুইন এরা যে চাঁদে গিয়েছিল সেই ছবিগুলো দেখেছিলাম। এই ছবিগুলো এখনো চোখের সামনে ঝলঝল করে। আমি ফটোসাংবাদিকতায় এসেছি কিন্তু এই ছবিগুলো দেখেই মনে হয়েছিল একটি ছবি কতভাবে একটি মানুষের মনকে আলোড়িত করতে পারে। সেই পথ থেকেই আমি মনে করেছিলাম আমার ছবিও মানুষকে আলোড়িত করবে। আমি আমার বাবার সেই শখের ক্যামেরা নিয়ে যে শুরুটা করেছিলাম সেই শুরুটা আজকে শেষের দিকে। আমি দেখেছি, আমি যে হাজার হাজার ছবি তুলেছি তার মধ্যে মনকে গভীর মত হলেও কিছু ছবি তুলেছি। শ্রদ্ধেয় রশীদ তালুকদার, শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আলম, শ্রদ্ধেয় গোলাম মাওলানাদের সামনে রেখে এবং তাঁদের তোলা সেইসব ছবি থেকেই আমরা আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোকে চোখের সামনে দেখতে চাই। শুধু আমরাই না আমাদের ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও দেখতে পাবে। এই ছবিগুলো তোলার ক্ষেত্রে শুধু আমাদের দেশের ফটোসাংবাদিকরাই না, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেরও বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তাদের ক্যামেরাও আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করেছে। আশা পারোখ নামে একজন ফটোসাংবাদিক, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ছবিগুলো তোলার ক্ষেত্রে যার বিশাল অবদান রয়েছে। এভাবে নাম না জানা অনেক ফটোসাংবাদিক রয়েছেন। এপির ফটোসাংবাদিক যিনি পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশ নিয়ে সেইসব ছবি ভবিষ্যতে আমাদের আলোড়িত করবে বলে আমি মনে করি।

লেখক: ফটোসাংবাদিক এপি

স্পোর্টস ফটোগ্রাফির কিছু কথা

শামসুল হক টেংকু

বাংলাদেশে স্পোর্টস ফটোগ্রাফি আগে থেকেই ছিল। ছোটবেলায় দেখেছি পাকিস্তান আমলে অনেকগুলো স্পোর্টস পত্রিকা ছিল যেমন, দৈনিক বাংলা। স্বাধীনতার পরেও সেগুলো পড়েছি। আমি যখন জয়েন করলাম 'সাপ্তাহিক'। তখন ফটোগ্রাফি সম্পর্কে ছোট ছোট লেখাও লিখতাম। 'সাপ্তাহিক পাব্লিক', 'সাপ্তাহিক আগামী'তে কাজ করতাম। ৯০ এর পর আজকের কাগজে জয়েন করি। আজকের কাগজে জয়েন করার পর থেকেই আরো ভালভাবে বুঝতে পারি স্পোর্টস এ ফটোগ্রাফি করার ব্যাপার আছে, এ বিষয়ে ফটোগ্রাফির গুরুত্ব আছে। আজকের কাগজে আমার জয়েন করার পর থেকেই বাংলাদেশে স্পোর্টস ফটোগ্রাফির উত্থান হয়। আজকের কাগজের পর ভোরের কাগজ, ভোরের কাগজের স্পোর্টস বিভাগটা সবচেয়ে Rich এবং খুব শক্তিশালী ছিল। স্পোর্টস দিয়েই ভোরের কাগজ সেসময় একটা স্থান করে নিয়েছিল। সেখানে ছবি এবং রিপোর্টিং দুটোই ছিল। স্পোর্টস ফটোগ্রাফির ব্যাপারে বলব যে স্পোর্টস ফটোগ্রাফি করতে হলে খেলাটা সম্পর্কে জানতে হবে, তা যে খেলাই হোক। আর যদি জানা না থাকত তাহলে ঐ খেলার ব্যাপারে কোনো ম্যাগাজিন কিংবা অন্যকিছু পুরনো বইপত্র পড়ে নিতাম। সেই সময়তো আর এতো ইন্টারনেটের যুগ ছিল না। আমি অবশ্য বাইরের পত্রিকা, এএফপি এর ছবি দেখতাম। তখন আমি অফ ট্রাকে এ ছবি তুলার শুরু করলাম। যেগুলো ফলাও করে ছাপা হলো। তো আমি এখানে একটা মেসেজ দিতে চাই যারা ফটোগ্রাফি করে তাদের খেলাধুলা সম্পর্কে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত টার্নিং পয়েন্টটা, তারপর ঐ খেলার নায়ক কে, কার চাহিদা বেশি, সে নায়কের অ্যাকশন ব্যর্থতাও একটা ছবি। খেলার নায়কের ব্যর্থতায় কোন একটি দল হেরে গেল। কিংবা তার দেওয়া গোল, তার রান, তার ইনিংসের ভালো একটা উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স কারণে তার দল জিতে গেল। যেমন একটা টার্নিং পয়েন্ট এ সাকিব একটা ভালো করল যার সাথে সাথে বল এবং ক্যাচটা সে নিয়ে নিল। ঐ ছবিটা যদি তুলতে পারি এটা একটা বিশাল ব্যাপার। কারণ এ টার্নিং পয়েন্টটায় ব্যাটসম্যানটা আউট হওয়ার পর বিপরীত দল হেরে গেল। একটা চিন্তা ভাবনা সব সময়ই মাথায় রাখতে হবে যে সেটা হলো যে মাঠে যে খেলা হচ্ছে সে সম্পর্কেই খেয়াল রাখলে হবে না মাঠের সার্বিক বিষয়ে নজর রাখতে হবে এবং খুবই সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করতে হবে। যখনই আমাকে অফিস থেকে এসাইনমেন্ট দেয় যেকোনো খেলার আগে সেটা হোক ন্যাশনাল, হোক ইন্টারন্যাশনাল, সেটা ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ হোক কিংবা ফার্স্ট ডিভিশন খেলা হোক কিংবা বাচ্চাদের এইজ গ্রুপের খেলা। আমি যেটা করি আগের দিন রাতে সেটা চক আউট করি। সবকিছুর বেলাই এটা করা উচিত বলে আমি মনে করি। সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক, লেখার ক্ষেত্রে হোক, কিংবা কোন কাজে যাওয়ার আগে যদি চক আউট করা যায় যে আমি আগামীকাল এই কাজটা করলে হয়তো আমার ডিফারেন্ট হবে। এই ডিফারেন্ট কাজটা করার জন্য আমি সব চক আউট করি। আর আগেতো আমরা যখন ছবি তুলতাম তখনতো ফিল্মের ছবি। ফিল্মের ছবিটা বুঝতে হতো, আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে ফিল্ম অনেক খরচ করতাম। আমি বেশি করে ছবি তুলতাম আর এর মধ্য থেকে একটা ছবি বেিরিয়ে আসতো কারণ ক্যামেরার মধ্যেতো আর ছবি দেখা যায় না। আমি বলব যে, এখনতো ছবি অনেক সহজ হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফাররা সহজ হয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে অনেক ফটোগ্রাফার হয়েছে। ছবি দেখা যায়, ডিলিট করা যায়। খারাপ হলে আর একটা তোলা যায়। বর্তমানে বলব আমাদের ফটোগ্রাফি আন্তর্জাতিক মানেরই কারণ আমাদের এখানে এএফপিসহ অনেক বিদেশি গণমাধ্যমের নিজস্ব ফটোগ্রাফার আছে। আগেও ছিল। এর মধ্যে আমাদের একজন স্পোর্টস ফটোগ্রাফার যিনি বাইরের দেশে ফটোগ্রাফি করেন এবং এএফপিতে তিনি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তিনি জুয়েল সামাদ। সে ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টেও এখন ফটোগ্রাফি করছে।

গত চায়না অলিম্পিকেও সে বেশ ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। এএফপি থেকে খেলাধুলার ফটোগ্রাফির জন্যই তাকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাঠানো হয়। সবমিলিয়ে বলব আমাদের স্পোর্টস ফটোগ্রাফির মান অনেক ভালো এবং আন্তর্জাতিক মানের। আরেকটা কথা যে কোন কাজের জন্যই প্রিপারেশন নেওয়াটা ভালো।

এখনতো মাধ্যম সহজ হয়ে গেছে। যে কোন খেলার বিষয়ে আমি যদি নাও জানি তাহলে ইন্টারনেটে সার্চ দিলে ঐ ছবি চলে আসত। তখন আমার সম্যক ধারণা হয়ে যায় যে, খেলাটার ছবি এভাবে তুললে পাঠকের ভালো লাগে।

এখনো বাংলাদেশে কয়েকটা পত্রিকা ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলো স্পোর্টস ফটোগ্রাফির মর্যাদা দেয় না। আমি আরেকটা কথা বলব যে, স্পোর্টস ফটোগ্রাফিটা করতে হবে নিউজভিত্তিক। মানে আমি ফটোজার্নালিজম করছি, তাইনা? তাহলে মাঠে এবং রিপোর্টারদের মধ্যে একটা কানেকশন থাকতে হবে। যে আমার রিপোর্ট করছে কিংবা আমার স্পোর্টস এডিটর কি চায় এর রিপোর্টের সাথে যদি আমার ছবি মিল হয়ে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আর যদি মাঠে গিয়ে দেখে সে মনে করে অ্যাকশন হইছে ছবিটা। ওটাও ভালো ছবি। অ্যাকশন ভালো ছবি কিন্তু নিউজের সাথে মিলল না। যেমন মনে করেন আমার, আমাদের এশিয়া কাপে সাকিবের কান্নার যে ছবিটা খুবই নাড়া দিছে। আমাদের ফাস্ট পেজে ছাপা হয়েছিল। বাইরে থেকে অনেক ফোন পেয়েছি। অস্ট্রেলিয়া থেকেও ফোন পাইছি যে এটা সারা জাতি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের কথা মনে করিয়ে দিছে। সারা জাতি ঐ দিন কাঁদছে না জেতার পর, তাই না? তো, এইগুলো সব কন্টাক্ট প্লাস স্পোর্টস এডিটরকেও ফটোগ্রাফারের সাথে মিলিয়ে চলতে হবে। তাহলেই সেই ছবিটা পূর্ণাঙ্গভাবে রূপ পাবে এবং পরিস্ফুট হবে।

নতুনদের মাঝে এখন স্পোর্টস ফটোগ্রাফির বিরাট চার্ম দেখতে পাই আমি। আসলে প্রথমেই স্পোর্টস ফটোগ্রাফিতে আসতে চায়। তারপর কয়েকদিন কাজ করে আবার হারিয়েও যায়। জানিনা কিভাবে হারিয়ে যায়। বা চার্ম কিভাবে হারিয়ে ফেলে জানি না। কিন্তু আমরা খুব কষ্ট করেছি। আমি চৈত্র মাসে সারাদিন বসে ছিলাম বা ফোসকা পড়ে গেছে। তো একইরকম ধ্যানধারণা থাকতে হবে ও একইরকম কষ্ট করার মন মানসিকতা থাকতে হবে। নয় ঘন্টা মাঠে থাকার মত। দাঁড়িয়ে থাকার মত। এখনতো মানে এতই, যেগুলো অনেকের পরিহার করা উচিত যেমন আমি নিজে কাজ করব, নিজে ভালো ছবিটা বাছাই করবো। আরেকজনের অপেক্ষায় অনেকে থাকে, আরেকজনের কাছে ছবি নিয়ে। এখনতো কাজ সহজ হয়ে গেছে। ইমেইলের ব্যাপার, নেগেটিভের ব্যাপার নেই, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি এগুলো পরিহার করা উচিত এবং আমাদের সম্ভাবনাময় অনেক ভালো ফটোগ্রাফার আছে, কাজ করছে।

বাংলাদেশে স্পোর্টস ফটোগ্রাফির উপর কোন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয়নি এ পর্যন্ত। যে যার মত করে করছে। আমার ফটোগ্রাফি এসেছে ফ্যামিলিগতভাবে। আমার চাচা ফটোগ্রাফার ছিলেন। পিআইডি চীফ ছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের তিনি ফটোগ্রাফার ছিলেন। আমার বড় ভাই পিআইডি ফটোগ্রাফার। সে সূত্রে আমি ফটোগ্রাফি করেছি এবং আমার নেব্লট জেনারেশনের কাউকে ফটোগ্রাফি করাতে চাই না। আমার ছেলের ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি না করেছি। কারণটা বর্তমানে এর অবস্থা খুব ভাল না। মানে চাকরির পজিশনটা ভালো না।

ফটোগ্রাফারদের এই সম্মান দেয়া হচ্ছে না। এর কারন অনেকগুলো। যেমন আমি বার ঘন্টা কাজ করছি কেউ আবার এক ঘন্টাও কাজ করছে না। কারো কাছ থেকে ছবি নিয়ে ছেপে দিচ্ছে। অনেক নতুন ছেলে কাজ করতে এসেছে দেখছি। কিন্তু তাদের কাজ করার চেয়ে অন্যের কাছ থেকে ছবি নেয়ার প্রবণতা বেশি। আবার আসলো, ছবি তুললো, চলে গেলো সেই ধৈর্য্যটা ধরল না। স্পোর্টস ফটোগ্রাফিতো একটা মজার ব্যাপার, সেকেন্ডে সেকেন্ড ছবি। এখন মনে হবে যে এই ছবিটা নিউজ হবে আবার পাঁচ সেকেন্ড

পর মনে হবে এই ছবিটা বাদ, পরেরটাই নিউজ হবে।

আমাদের স্পোর্টস ফটোগ্রাফারদেরকে সব ধরনের খেলা কাভার করতে দেয়া হয়, বাইরের দেশে পৃথক খেলার জন্য পৃথক ফটোগ্রাফার থাকে। এটাকে আমি আমাদের অর্জন মনে করেছি। আমার প্রতি আস্থা আছে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের। কিংবা স্পোর্টস এডিটরের যে, ঐ কাজ করলে সে এটা নিয়েই কাজ করবে এবং ফাঁকিবাজি করবে না এবং আমি সেটা চেষ্টা করি। আমি সব সময়ই মাঠে সবার আগে যাই। মাঠ থেকে সবার পরে আসি। একান্ত যদি আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা বা আমার কেউ মারা গেছে এরকম ব্যাপার ছাড়া। আমি জীবনে বহু অফডে করি নাই। আমি ঈদের দিনেও খেলার ছবি তুলেছি। ঈদে পত্রিকা বন্ধ ছিল কিন্তু তারপরও ওইদিন ছবি তুলেছি। আমি এই রকম অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি বলে আজ আমি শামসুল হক টেংকু হয়েছি। এই ত্যাগটা স্বীকার করতে হবে। সবার উপরে আমি বলব যে আমার দেশের যে অবস্থা যুবসমাজ বা সরকার সবাই ব্যর্থ, তাই না? সরকার বলেন, বিরোধী দল বলেন সবাই ব্যর্থ। কিন্তু আমি মনে করি আমি যদি ঠিক হয়ে যাই, বিরোধীদলও ব্যর্থ হবে না, সরকারও ব্যর্থ হবে না। আমরা কেউ কি সরকার প্রধানের কথা মানি? সরকার প্রধান বলল, কাজটা আজকে করতে হবে বা করা যাবে না। আমরা কি সেটা মানি? কিংবা আমাদের কেউ বা পুলিশ কি মানে? এইটা যদি মানতাম তাহলে আমার দেশ সোনার বাংলা হয়ে যেত। আমার কাজের প্রতি আমার অনেস্ট থাকতে হবে।

Sports Photography তো খুবই মজার। এত ভ্যারিয়েশনের ছবি তোলা যায়। Colorful দর্শক, এই যে চার্ম, বাচ্চা ছেলে, বয়স্ক মহিলা, সুন্দরী মহিলা, ভাল নানান পোশাকের জিনিসপাতি, কত কালার, একটা জায়গায়। সম্প্রতি আমি টাঙ্গাইলে গেলাম, দেখলাম মাঠের অব্যবস্থাপনা। মাঠের অব্যবস্থাপনা হতেই পারে। নির্মাণ কাজ চলতেই পারে, কিন্তু তার পরিবর্তে একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, তাই না? যে মাঠে খোড়াখুড়ি হতেই পারে, কিন্তু প্রেয়ারটার দাম বেশি। মাঠে যেকোন সময় প্রেয়ারের নানা সমস্যা হতে পারে। একটা ছবি তুললাম, মাঠে ছাগল গরু চরছে। বি-লীগ মানে বাংলাদেশের এক নাম্বার লীগ। ছবি তুললাম। সবাই বললেন, টেংকু ভাই কি করলেন? আমি বললাম ঠিকই করছি। খারাপ কাজ করি নাই। আপনারা কাজ করছেন, ঠিক আছে। কিন্তু দুইটা পাটাতন দিয়ে দিতেন প্রেয়াররা হেটে যেত। মাঠে কেন ছাগল যাবে?

স্পোর্টস ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আমি সর্বোপরি একটা কথাই বলব, মনোযোগী হওয়া। আমার মনে হয়, মনোযোগের বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক: স্পোর্টস ফটোগ্রাফার, দৈনিক প্রথমআলো

প্রসঙ্গ: World Press

শফিকুল আলম কিরণ

World press ফটোজার্নালিজম ভিত্তিক একটি ফটোগ্রাফিক প্রতিযোগিতা। এটা হয় নেদারল্যান্ডের আর্মস্টারডামে। প্রায় প্রতিবছরই এরা এই প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করে এবং এখানে সাধারণত ফটোজার্নালিস্টদের ছবিগুলো বেশি প্রাধান্য পায়। সমসাময়িক যেসকল ঘটনা ঘটে বিশ্বজুড়ে, সেটা মানুষ সাধারণত জানে। এ ধরনের বিষয়গুলোই বেশি প্রাধান্য পায় এখানে। আমিও world press এ একজন পার্টিসিপেন্ট হিসেবে এখানে অংশগ্রহণ করি ১৯৯৯ সালে। সেই প্রতিযোগিতায় আমি যে বিষয়টি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমার সেই বিষয়টা ছিল এসিড সারভাইভারদের নিয়ে। ওয়ার্ল্ড প্রেস বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। যেমন, একক বা স্টোরি বেইজড সাবজেক্টগুলো আহ্বান করে। এটা ওয়ার্ল্ড প্রেসে আমি দেব এরকম কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না বা দেব বলে ছবি তোলা এরকম কোন বিষয় নয়। আমি সে সময় সামাজিক ইস্যু নিয়ে কাজ করেছিলাম, বা যে ফটোগ্রাফি নিয়ে আমি সাধারণত কাজ করি। আমরা সাধারণত সবসময় সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি যেগুলো social issue দিয়ে মানুষকে নাড়া দিতে পারে। মানে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন করতে পারি। সামাজিক সচেতনতা ডেভেলপ করতে পারি সমসাময়িক সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে। তখন বাংলাদেশে অনেক এসিড ভিকটিম ছিল বা অনেক এসিড আক্রমণ হত, বিশেষ করে মেয়েদের উপরে। আমি সেসময় এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার চিন্তা করি এবং সেটা ছিল ১৯৯৭ সালের কথা। প্রথম যখন পত্রিকায় এসিড সারভাইভারদের ছবিগুলো দেখতাম তখন আমার খুবই কষ্ট হতো। এসিড মারার ঘটনাগুলো বেশিরভাগই ঘটত যখন ছেলেরা মেয়েদের প্রপোজ করত এবং রিফিউজ হতো আর তখনই এসিড মারতো। কোথায় এদের চিকিৎসা হয় আমি তার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি। জানতে পারি, ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে একটি বার্ণ ইউনিট আছে যেখানে এদের চিকিৎসা করা হয়। আমি তখন সেখানে যাই। সেটা ছিল একটা রুম এবং তাতে ছিল আটটা বিছানা। পত্রিকাতে এসিড সারভাইভারদের একটা দুইটা ছবি দেখেছিলাম কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখলাম যে, আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখন আমার মাথায় আসল, এ ঘটনাটি আমি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরব ফটোগ্রাফি দিয়ে। সাধারণ মানুষ পত্রিকায় এর দু'একটা ছবি দেখে আর পত্রিকার খবর পড়ে কিন্তু তারা এর ভেতরের কি অবস্থা বা আক্রান্তদের কি কষ্ট তা অনুধাবণ করতে পারে না। তখন আমার মাথায় আসে, আমি এ ব্যাপারে কাজ করব। কাজ করে সাধারণ মানুষকে দেখাবো। মানুষ বুঝতে পারবে যে এই কাজটা ঠিক না এবং আক্রান্তদের জন্য কিছু করা উচিত। ছবিগুলো দেখে যদি মানুষ বুঝতে পারে বা সচেতন হতে পারে তাহলে আমি বুঝতে পারব যে আমার ছবির মাধ্যমে আমি মানুষকে কিছু জানাতে পেরেছি। এবং ১৯৯৯ সালে এ নিয়ে কিছু ছবি আমি ওয়ার্ল্ড প্রেসে জমা দেই। আমার বন্ধুরাও অনেকে বলেছে যে, এটি ওয়ার্ল্ড প্রেসে দেওয়ার মত একটি বিষয়। তখন আমি পাঠালাম। পাঠানোর পর মনে হয় নি যে পুরস্কার পাব, পুরস্কারের আশায় বা এরকম কিছুই মাথায় ছিল না। কিন্তু যখন আমি পুরস্কারটা পেলাম, এটা ছিল বাংলাদেশের প্রথম। তখন আমার আরো বেশি খারাপ লাগতে লাগল। পুরস্কার পাওয়ার পর সাধারণত আনন্দ হয়, কিন্তু আমার মনে হল আমি কাদের ছবি দিয়ে পুরস্কার পেলাম? এগুলোতো অনেক কষ্টের ছবি। আমার হয়তো নাম হবে, মানুষ আমাকে বাহবা দেবে, কিন্তু ওদের কি হবে? এটা আমার ভেতরে ভেতরে অনেক বেশি কষ্ট দিত। আগে যখন আমি শুরু করি, তখন ডাক্তার প্রাণ গোপাল বার্ন ইউনিটের প্রধান ছিলেন, তিনি আমাকে ছবি তোলার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে একদিন ফোন করে বললেন, 'তুমি তো অনেক ছবি তুলেছ, বিদেশী একটা গ্রুপ এসেছে। তাদেরকে তোমার তোলা ছবি

থেকে কিছু মেয়ের ছবি দাও, যেগুলো দেখে চিকিৎসার জন্য পাঠাবো।' আমি দশটি মেয়ের একটি ছবি পাঠাই এবং সেইখান থেকে তারা সাতজন মেয়েকে স্পেনে চিকিৎসার জন্য নেয়। এরপর আমার মনে অনেক আশার সঞ্চার হয় যে, তাদের জন্য কিছু করতে পারলাম। World press পাওয়ার পরও আমার মনে হল মানুষ এটাকে কিভাবে নিবে, এগুলো তো কষ্টের ছবি। তা ওখানে যাওয়ার পর মানুষ এটা নিয়ে আগ্রহ দেখাল এবং সাধারণ মানুষ তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা জিজ্ঞেস করেছিল। তখন ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে 'এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশন' নামে একটি ফাউন্ডেশন হয় এবং আমি এর সাথে যুক্ত। এদের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে আমি ছবি দেই, ছবিগুলো এদের কাজে দেয়। এটাও আমার কাছে খুব আশা লাগে যে, আমি ছবি তুলছি, একারণে আমার ছবি দেখে মানুষ এদেরকে সাহায্য করতে পারছে। শুরুর দিকে, ১৯৯৭ সালে আমি যখন শুরু করি, তখন এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশন ছিল না। তখন আমি নাসরিন হক এবং অন্যান্যদের অনেক সহযোগিতা পাই এবং তারা এসিড সারভাইভারদের সাহায্য করত। সারভাইভাররা কাউন্সেলিংয়ে আসত। এদের সাথে আমার কথা হত এবং ওরা আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তারা আমাকে সবসময় খবর দিত, কখন কোথায় কি হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি মেয়ের নাম বলি-ইরা। তার সাথে আমার দেখা হয় ঢাকা মেডিকলে। তার পুরো মুখ পুড়ে গিয়েছিল, একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুরো মুখ ঢেকে, চোখ দুটো বের করে ও কাউন্সিলিং করতো। অন্য সারভাইভারদের সাহস দিত যে, তোমরা সাহস হারিও না। আমি একটি সংগঠনে কাজ করি। আমিও একজন সারভাইভার। আমি তোমাদের জন্য কাজ করব। এরপর এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশন হওয়ার পর আমি তাদের ওখানে যাই এবং সারভাইভারদের জন্য কাজ করি। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পুরস্কার পাওয়ার পর অনেকের কাছে এটা ছিল অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে ছিল অনেক কষ্টের ব্যাপার। আমার মনে ভয় ছিল যে, আমি মানুষের সামনে ছবিগুলো কিভাবে তুলে ধরব, কারণ অনেক ছবি ছিল যাতে অনেকের পুরো মুখ নষ্ট হয়ে গেছে, আসল চেহারা নাই। আয়নায় সে মেয়েটা তার মুখ দেখতে পারে না, যে কিনা সুন্দর একটা মেয়ে ছিল। তাদের ছবি আমি কিভাবে দেখাব? কিন্তু এরকম দেখে এখন মানুষ তাদের সাহায্যের জন্য জানতে চাইল। তখন আমার মনে স্বস্তি আসল যে, আমি ছবি তুলছি দেখে তাদের সাহায্য করতে পেরেছি। এখনও এ ধরনের সাহায্যগুলো হচ্ছে। কারণ এসিড সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মশালা-সেমিনার হয়, সেখানে আমার ছবিগুলো ব্যবহার করে তারা। পাশাপাশি এখন আমি যে কাজগুলো করছি, যে মেয়েরা সাবলম্বী হচ্ছে এটা এখন আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। কষ্টের পরেও যে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, আমার ছবিগুলো দেখিয়ে হয়তো মানুষের মধ্যে এ আশাটা জাগাতে পেরেছি আমি। এবং মানুষ বুঝতে পারবে আমারও কিছু করার আছে। সরকারের এখানে আইনি ব্যাপারগুলো বেশ শক্তিশালী কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী না থাকার কারণে সারভাইভাররা বঞ্চিত হয়। এখন ৫০ বেডের একটি হাসপাতাল হয়েছে সারভাইভারদের জন্য। পাশাপাশি এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সারভাইভারদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। একটি অপারেশন থিয়েটার হচ্ছে। আইনি সেবার মাধ্যমে সারভাইভারদের সাবলম্বী করছে তারা। এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনের মেয়েরা এখানে কাজ করে। তারা পরবর্তীতে সরকারি চাকরি করছে, বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করছে, গ্রামীণ ফোনে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ফজিলা নামে এক সারভাইভারের কথা আমার মনে পরে। তাকে দেখতাম এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনে কাজ করত। কম্পিউটার শিক্ষার পর অনলাইনে বিভিন্ন জায়গায় জীবন বৃত্তান্ত জমা দিত। সে একটি সংগঠনে তার জীবন বৃত্তান্ত জমা দিলে সেখানে তার চাকরি হয়। সেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করত। পরবর্তীতে গ্রামীণ ফোনে সে নিজে থেকে যোগাযোগ করলে, সেখানে তার চাকরি হয়। এখন সে খুব ভাল আছে। গ্রামীণ ফোনে আরও কয়েকটি এরকম মেয়ে চাকরি করছে। বিভিন্ন কল সেন্টারে এরকম আক্রান্ত মেয়েরা কাজ করছে। তাছাড়াও দেখলাম বেশ কিছু মেয়ে সরকারি চাকরি পেয়েছে। তারা বেশ ভাল আছে।

অনুলিখন

ওয়ার্ল্ড প্রেসের ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফাররা শুধু অংশ নিতে পারে। ওয়ার্ল্ড প্রেস এখন একটি জায়গা যেখানে মানুষ জানতে পারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব ঘটনা। ওয়ার্ল্ড প্রেসে মানুষ বেশি জমা দেয় যুদ্ধ, নতুন বৈজ্ঞানিক কিছু বিষয় যেগুলো বিশ্ব জুড়ে মানুষ জানে। এ ধরনের বিষয়গুলোকে তারা বেশি প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের অনেক ভাল ভাল প্রতিযোগী ভাল ভাল ছবি পাঠায়। কিন্তু যেহেতু এটি বিশ্বব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা, তাই আমরা জানি না অন্য ফটোগ্রাফাররা কি ছবি পাঠায়। বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা ছবি পোষ্ট করে কম। তারপরও দুইজন ফটোগ্রাফার জে.এম.বি আকাশ এবং শোয়েব ফারুকি ওয়ার্ল্ড প্রেস পেয়েছে। আমাদের বন্ধু আবির আব্দুল্লাহ ওয়ার্ল্ড প্রেসে বিচারক হয়েছে। আমি ছাড়াও আরো কয়েকজন ওয়ার্ল্ড প্রেসে পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ থেকে, যা খুবই আশার ব্যাপার। বাংলাদেশ থেকে আরো দু'জন ফটোগ্রাফার আছেন, শহীদুল আলম যিনি ওয়ার্ল্ড প্রেসে জুরি বোর্ডের বিচারক ছিলেন। তরুণ ফটোগ্রাফারদের মধ্যে আছে আমাদের বন্ধু আবির আব্দুল্লাহ যিনি ওয়ার্ল্ড প্রেসের বিচারক হয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বড় অর্জন। নতুন যারা ছবি পাঠাচ্ছে তাদের জন্য বলতে গেলে খুব শক্তিশালী ও মানসম্পন্ন একটি পোর্টফোলিও হতে হবে। সেক্ষেত্রে সামাজিক ছবিও হতে পারে। সামাজিক বিষয়গুলো নিয়েও আমরা ছবি পাঠাতে পারি। তবে সবগুলো ঘটনা সত্য হতে হবে। সত্য ঘটনাসহ ছবির পাশাপাশি একটা ভাল লেখা পাঠানো হলেও ওয়ার্ল্ড প্রেসে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

লেখক: ফটোগ্রাফার, ম্যাপ

মৃণাল সরকার স্মরণে

আনোয়ার হোসেন

আমি আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন বলছি। শংকরে। আজকে ৭ তারিখ। সন্ধ্যাবেলা। বিষয়-শ্রদ্ধেয় মৃণাল সরকার। আজ এই গোখুরী ক্ষণে বসে জীবনের একটা দিন শেষ হওয়ার মত আমার মৃণালদাকে খুব মনে পড়ছে। উনি কিছুদিন আগে পৃথিবী ত্যাগ করেছেন এবং যেদিন চলে যান সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বন্ধু আনোয়ার হোসেন পিন্টুর অফিসে আসেন। আলোচনায় উনি আমার প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন। ওনার মনে হয়তোবা বিষয়টা দাগ কেটেছিল। তো, মৃণাল সরকার নামটা অনেকে জানে না, এটা বিস্ময়কর! যারা আলোকচিত্রে পাইয়োনীর, আমাদের পুরোধা। আমি মনে করি, উনি বাংলাদেশের পুরোধাদের একজন। আমাদের এখানে গোলাম কাশেম ড্যাডি, মৃণাল সরকার, যাদের মাধ্যমে হাতখড়ি হয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পের উৎপত্তি। আমাদের প্রত্যেকেরই ফ্যামিলির একটা ব্যাপার থাকে, ধর্মের একটা ব্যাপার থাকে, সমাজের একটা ব্যাপার থাকে। এরকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো অস্বীকার করা যায় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের দেড়শ বছর নিয়ে সবাই হইচই করছে। নবী-পরগন্নার দুই হাজার আড়াই হাজার বছর নিয়ে হইচই করছে। কিন্তু নিজের দেশেই যেটা দেখা যায় তাদের অনেকে আলোকচিত্রের সেই বিখ্যাত বা পুরোধাকেই ভুলে গেছেন, তাদের নামই কেউ জানে না এবং সচেতনভাবে তাদের নামটা যেন কেউ না জানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। এটা খুবই দুঃখজনক। আমি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করি '৬৯, '৭১ সাল থেকে, তখন থেকেই মৃণালদার সাথে পরিচয় হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সুনীল জানা নামে একজন আলোকচিত্রী ছিলেন। উনি ভারতবর্ষের প্রথম বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী। এই সুনীল জানা 'লাইফ' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে এইদিক ওইদিক খুঁজলে তোমরা সুনীল জানা'র কিছু কিছু দারুণ ছবি পাবে। আমি হেমন্তের ছবি দেখলাম সেদিন আর কার যেন ছবি দেখলাম সেখানে ছোট করে লেখা 'আলোকচিত্রী: সুনীল জানা'। 'সুনীল জানা' সাদাকালোর উপর অসাধারণ কাজ করেছিলেন। লোকে বলে, সুনীল জানা সমাজতান্ত্রিক মাইন্ডের ছিলেন, আসলে পশ্চিমবঙ্গে এখনো একটা বড়ো সংখ্যার বুদ্ধিজীবী সমাজতন্ত্র ঘেঁষা। আমি শুনেছি, এই সুনীল জানা সমাজতন্ত্র ঘেঁষা ছিলেন বলেই উনাকে 'লাইফ'এর স্থায়ী স্টাফ করা হয়। আমি মৃণালদার কাছে শুনেছি উনি সুনীল জানার সহকারী ছিলেন। আমাদের জীবনে অনেক সহকারী আসে, Trainee আসে তো উনি সেরকম ছিলেন। ওনি একটা Phase এ সুনীল জানার সহকারী ছিলেন। এবং প্রাউডলি আমাদেরকে উনার মুখটা দেখিয়ে বলতেন, "আমার এই দিকের দাঁতটা যে ভাঙ্গা, এটা সুনীল জানা রাগ হয়ে থাপ্পড় দিয়েছিলেন একদিন। তারপর থেকে ভাঙা।" এটা সম্ভব এবং আমি ওনাকে বিশ্বাস করি। মৃণালদাকে আমি যতটুকু চিনি উনার বাসায় আমি ঘুমিয়েছি জীবনের সুবিধা ও অসুবিধার সময়ে। উনি চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে ফরেন্সিট ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল আলোকচিত্রী ছিলেন। উনার ওখানকার বাসায় অনেক দিনই ছিলাম। উনার স্ত্রী এবং কন্যারা আমাকে চিনত, ঢাকায় আসলে তো দেখা হতোই। এই সুবাদে আমার সাথে অনেক গল্প হয় এবং আলোকচিত্র শিল্পে যে ডিভিশন, ওনার যে সিনসিয়ারিটি এটা মনে পড়ে। আমার মনে আছে বাংলাদেশে আমি একবার নিজেও একটা ছোটখাট গ্রুপ করি যেহেতু বৃহত্তর গ্রুপের সাথে একধরনের মনোমালিন্য হচ্ছিল। বাংলাদেশে আমাদের এক ফটোগ্রাফি সংগঠনের উদ্যোগে একটা আলোকচিত্র ফেডারেশনের গঠনের চেষ্টা হয়। এ আলোকচিত্র সংগঠনই মৃণাল সরকারকে প্রেসিডেন্ট এবং আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচন করে আমাদেরকে তার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমরা আমাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলাম এবং সেখানে তেরটা না সতেরটা

স্মৃতিচারণ

সংগঠন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। সেই ডকুমেন্টও আমার কাছে আছে। আমি বলছি ১৯৮৯, '৯০ এর কথা। তখন বাংলাদেশে আলোকচিত্র ফেডারেশন হয়ে গিয়েছিল মুনালদার আন্ডারে। কর্মকাণ্ডের মধ্যে বগুড়ায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও কনফারেন্স, ময়মনসিংহের আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও কনফারেন্স উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঢাকাতেও দু-চারবার প্রদর্শনী হয়েছিল। চট্টগ্রামে হয়েছিল কিনা আমার ঠিক জানা নেই। যাই হোক আলোকচিত্রের রাজনৈতিক কারণে সেটা আস্তে আস্তে ভেঙে যায়।

মাঝে একদিন আমার একটি বই ছাপা হল, আমার প্রথম বই 'A Journey Through Bangladesh' ১লা বৈশাখের দিন বইটির প্রথম প্রকাশ হয়। বইটির প্রথম কপি গিয়েছিল বাংলা একাডেমীতে। বইটা এখন কোথায় আছে আমি জানি না। আমি বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটিসহ দুজনকে উৎসর্গ করে বইটার একটা কপি রিপ্রেজেন্ট করি। তারপরে ২৪/৪৮ ঘন্টার মধ্যে একটা হলুদ লেগে গেল, আমাকে Address করে এই করে ও করে অনেক কিছুই ঘটল। বাংলাদেশের কে কি বলে জানি না। কিন্তু আমাকে আন্তর্জাতিক মহলের, ফিয়াপ নামের যে সংগঠনটি আছে তাদের প্রধানরা বলেছেন, 'Anwar, Did not everything start after the book, your book was published' সেই সুদূরে বসেই ইউরোপে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের প্রধানরা অনুভব করেছেন বইয়ের ফলে এটা ঘটেছে। ঢাকায় হয়তো তাই ঘটেছে, আমি তার মতামত দিতে পারবো না। দেওয়াটা শালীনও হবে না। মুনাল দা তখন এই ব্যাপারে একটু ভেঙ্গে পড়েন এবং মুনাল দার কখনোই ঐ রকম পাওয়ার মতো পাওনা হয়নি জীবনে। তিনি অনেকটা নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন-যাপন করতেন। কোনোমতে সংসার চালাতেন। বাংলাদেশের সরকারের বনবিভাগের আলোকচিত্রী হয়ে আর কতো টাকাই বা বেতন থাকে। আরেকবার ঢাকায় আমাদের আলোকচিত্র ফেডারেশনের আন্ডারে বড় একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনী হলো। ওতে উনি প্রধান ভূমিকা রাখেন। তখন আমি প্রথম দেখলাম যে কিভাবে জাজিংটা করতে হয়। জাজিং এর জন্য যে একটা প্রপার লাইট সেটআপ থাকে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে একটা নর্ম আছে জাজিংয়ের এটা উনি জানতেন। এটা ফলো করে একটা কাঠের বাক্স বানালেন। ঐ বাক্সের পেছনে বাস্ক এবং নিউট্রাল কিছু লোক থাকবে এবং তারা কয়টা বাস্ক জ্বলল এটার নোট নেবে এবং বিচারকরা সামনে বসবেন। প্রত্যেকের হাতে একটা সুইচ থাকবে যেগুলোর কানেকশন থাকবে বাস্কগুলোর সাথে। ছবি পছন্দ হলো নাকি অপছন্দ হলো এ অনুযায়ী বাস্কগুলো জ্বলবে নিভবে। ঐ জাতীয় একটি ফুল প্রফ টাইপের সিস্টেম। কেউ জানতে পারবেনা কি হচ্ছে কিন্তু পেছনে যারা থাকবে তারা আবার ঠিকমত নোট করতে পারে। তাই ব্যাপারটা আমার কাছে মজা লেগেছিল খুব। এভাবে দিন কেটে গেল। মুনাল দার একটা মেয়ে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, খুব ভালো রবীন্দ্র সংগীত করতো। তার কি হয়েছে জীবনে জানিনা। আমি যতদূর জানি ওর বিয়ে হয়েছিল। ওনার স্ত্রী একটু অসুস্থ ছিলেন। ওনার বড় মেয়েটা দেখতে অতটা সুন্দর ছিল না, মস্তিষ্কে একটু জটিলতাও ছিল আমার বড় বোনের মত। এরা আসলে কোথায় গেছে বা হারিয়ে গেছে কিনা কোথায় কি আছে আমি ঠিক জানিনা। কিন্তু চট্টগ্রামে যারা রসিকজন ধরো আমাদের আনোয়ার হোসেন পিন্টু, মর্তুজা বশির, খালেদ (পেইন্টার), অলক রায় (স্কালপচার) প্রমুখ ছাড়াও যারা রসিকজন শিল্প সাহিত্যের তারা মুনাল দাকে ভালোমতই চিনতেন। আমার মনটা ভেঙে যায় যে একদিন হঠাৎ ঢাকায় কোনো একটা আলোচনা হচ্ছে আলোকচিত্র শিল্প বিষয়ক এবং কে জানি একজন (নট সো ইমপর্ট্যান্ট ইন মাই অপিনিয়ন) কথা বলছিলেন। তিন মাস ছয় মাস আগের ঘটনা, তো তুমুল আলোচনা হচ্ছে। তখন আমি যখন মুনাল দার কথা বললাম, সবাই একটু হতবাক হয়ে তাকাল। এবং It was a big surprise, I found that ঢাকায় বা রাজধানীতে বসবাসকারী তথাকথিত সচেতন আলোকচিত্রী শিল্পী বা আলোকচিত্র সংক্রান্ত লোকেরা তারা যারা জানেই না যে মুনাল দা মারা গেছেন। ইতিমধ্যে কিন্তু প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। আমাদের এটা শুধরাবার কিছুটা সময়

এসেছে। নিজের পিতা নিজের পিতাই, নিজের মাতা নিজের মাতাই, নিজের মাতৃভূমি নিজের মাতৃভূমিই, এটার মতো পবিত্র জিনিস আর হয় না। আবারো বলছি মুনাল দাকে আমি আমাদের আলোকচিত্র শিল্পের পুরোধাদের একজন বলে মনে করি। এখন সময় এসেছে ওনাকে একটু স্মরণ করার। উনার প্রাপ্ত সম্মান জীবন্ত অবস্থায় না দিতে পারলেও ওনার আত্মা যাতে পায় সে জন্য এগিয়ে আসা। সেটা হয়ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো অনুপ্রাণিতই করবে যে, আমরা কেউই ভালো কাজ করলে বা সত্যিকারের শিল্পকর্ম করলে হারিয়ে যাব না। যুগ তার দাবি অনুযায়ী তাদের নিজেকে প্রকাশ করবে।

লেখক: শিক্ষক, ইউল্যাব এবং ফটোগ্রাফার ও ভিডিওগ্রাফার

আলোকচিত্র নিয়ে স্মৃতিচারণ

আলী যাকের

বলা যেতে পারে প্রায় খেলতে খেলতেই ছবি তুলতে শুরু করে দিলাম। আজ থেকে ৩০ বছরের ওপরে হবে, আমি সপরিবারে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম। কলকাতা দিয়ে শুরু, তারপর চেন্নাই, মাদুরাই, কন্যা কুমারী, ত্রিবান্দ্রাম, গোয়া, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, মুম্বাই, অতঃপর অজন্তা-ইলোরা-কলকাতা হয়ে দেশে ফিরে আসা। তখন আমাদের পুত্র ইরেশের বয়স চার বছর। মেয়ের জন্মই হয়নি। পরিবার পরিজন নিয়ে এই ধরনের প্রমোদ ভ্রমণে সবাই একটা ক্যামেরা নিয়ে যায় সাথে করে। আমার ক্ষেত্রেও কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। সে সময় আমার নিজের কোন ক্যামেরা ছিল না। আমার এক সহকর্মীর কাছে থেকে একটি রেঞ্জ ফাইন্ডার ৩৫ মিমি ইয়াশিকা ক্যামেরা ধার করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনও মনে আছে, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে চার রোল ফুজি কালার ফিল্মও কেনা হয়েছিল। ক্যামেরা সাথে ছিল ঠিকই, কিন্তু ছবি তোলার কথা প্রায়ই ভুলে যেতাম। তখন পর্যন্ত এই বিষয়টিতে তেমন আগ্রহের সঞ্চার হয়নি আমার। অথচ যেসব জায়গায় গেছি, সেখানে চমকপ্রদ সব ছবি তোলার কথা। ঐ চার রোল ফিল্মের মধ্যে এত বড় সফরে গোটা আড়াই রোল ছবি তোলা হয়েছিল এবং এর বেশিরভাগই কোন বিখ্যাত স্থাপনার সামনে দাঁড়ানো আমাদের নিজেদের ছবি।

চেন্নাই তখন মাদ্রাজ নামে পরিচিত ছিল। আমরা মাদ্রাজ শহরের একটি হোটেলে ছিলাম। সেখান থেকে টুরিস্ট বাসে করে কাঞ্চিপুরাম, মহাবালীপুরাম এইসকল জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কাঞ্চিপুরামে সুন্দর দেখতে সব মন্দির রয়েছে। দু'একটির ছবি তুলেছি। ব্যাস, এ-ই। মহাবালীপুরামের সমুদ্র সৈকতে স্যান্ডস্টোনের অসাধারণ সব স্থাপত্য রয়েছে এবং তার পেছনেই যে বঙ্গোপসাগর, তার রং এত গাঢ় নীল, যা আমি জীবনে কোনদিন চোখে দেখিনি। এরও অনেকদিন পরে সারা এবং আমি গ্রিসে এজিয়ান সমুদ্র দেখেছি। সেটিও ঐরকমই নীল। যা হোক, মহাবালীপুরামের সেই স্থাপত্য এবং সুনীল সমুদ্র দেখে এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, ছবি তোলার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

এরপর মাদুরাইয়ের মিনাক্ষী মন্দির। এটিকে একটি ছোটখাটো শহর বলা চলে। ভেতরটি অত্যন্ত পরিষ্কার। মন্দিরের ছাতের নিচেই অসংখ্য গলিপথ, যার দুধারে নানা ধরনের দোকান-পাট। এর বেশিরভাগই ফুলের দোকান। ওইসব জায়গাতেও খুব বেশি যে ছবি তোলা হয়েছে, তা নয়। এরপর অজন্তা-ইলোরার মতন ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ জায়গাতেও খুব যে একটা ছবি তুলেছি, তাও বলতে পারবো না। যাও বা তুলেছিলাম, আমার কাঁচা হাতে, সেগুলো খুব একটু হৃদয়গ্রাহী হয়নি। এখন আফসোস হয় যে, ছবি তোলায় এখনকার মতো আগ্রহ কেন তখন ছিল না। এরও অনেক পরে আমার এক অনুজপ্রতীম বন্ধু আমাকে একটি পুরনো মিনল্টা এসএলআর ক্যামেরা উপহার দেয়। ঐ ক্যামেরাতেই আমার ছবি তোলার হাতেখড়ি বলা যেতে পারে। তারপর প্রায় তিন যুগ ধরে এস্তার ছবি তুলেছি। মানুষের এবং প্রকৃতির। এখনো তুলে চলেছি প্রতিনিয়ত।

ছবি যে খুব ভাল তুলি, সে কথা বুকে হাত রেখে বলতে পারবো না। তবে যা-ই তুলি, আমার নিজের কাছে ভাল লাগে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। জীবনে যখন, যে কাজটি করেছি, কবিতা পাঠ থেকে আরম্ভ করে অভিনয়, ছবি তোলা কিংবা লেখালেখি- এই সমস্তই করেছি নিজের প্রাণের তাগিদে এবং এই সকল কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিনই আমি নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি। ছবি তোলার ব্যাপারেও আমার অভিজ্ঞতা একইরকম। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Trial & Error। এরই মাধ্যমে আমি এখনও

স্মৃতিচারণ

ছবি তোলায় হাত পাঁকানোর চেষ্টা করে চলেছি। এই চেষ্টা এবং ভ্রমের সমন্বয়ে আমার অনেক ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ কেউ তো আমায় মাথার দিব্যি দেয়নি যে, আমার ছবি বিশ্ব সভায় সমাদৃত হতে হবে।

একটা জিনিস, প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতায় এবং পরে বই পড়ে বুঝতে পেরেছি যে, ছবি তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় বিষয়টি হচ্ছে 'চোখ'। এই চোখ যদি দেখতে পায়, ক্যামেরার লেন্সও তা দেখবে- এ কথা অবধারিতভাবে বলা যেতে পারে। কোন ছবিটি তুললে তা কেমন হবে, এই বিষয়টি অবশ্য নির্ভর করে আলোর ওপরে। আমি ফ্যাশ দিয়ে ছবি তুলতে পছন্দ করি না। প্রকৃতি প্রদত্ত আলোই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি দীর্ঘদিন প্রয়াত ড. নওয়াজেশ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশের যত্রতত্র চষে ফেলেছি বনফুলের ছবি তোলার জন্য। সেই সময়ও অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। নওয়াজেশ ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি অনেক। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারতাম। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সান্নিধ্যে বড়ো আনন্দঘন দিন কাটতো আমার।

এখনও আমি যখনই বাইরে যাই, সাথে ক্যামেরা থাকে। মনে দাগ কাটে, এমন কিছু দেখলেই ছবি তুলি। তবে, আজকাল দেখতে পাই আগের তুলনায় অনেক কম। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বুঝতে পারি, বেশিদিন ছবি তোলা হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে। আমি এখন নাইকন ক্যামেরায় ছবি তুলি। এই দীর্ঘদিনের ছবি তোলার জীবনে আমি অনেক ধরনের লেন্সও কিনেছি। সবগুলো যে ব্যবহার হয় সবসময়, সে কথাও বলা যাবে না। প্রসঙ্গতঃ জগদ্বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান ফটোগ্রাফার আর্নস্ট হাস-এর একটি কথা মনে পড়ে গেল। তাঁকে তাঁর কোন এক শিষ্য জিজ্ঞেস করেছিল, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স কোনটি? উত্তরে হাস বলেছিলেন, "তোমার দুই পা। একটু পেছনে হেঁটে যাও... আরও একটু... বাহ! এই তো যথার্থ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলে।" হাস-এর প্রসঙ্গে বললাম বটে, কিন্তু আমি হচ্ছি কুঁড়ের বাদশা। কষ্ট করে পেছনে-সামনে গিয়ে ছবি তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এত প্রকার লেন্সে রমরমা। তবু বলি, প্রাইম লেন্সগুলোর ওপরে কোন লেন্স হয় না।

যাক গে, নিজেকে নিয়ে অনেক বাহুল্য কথা বলে ফেললাম। এটা বয়সের দোষ। আজকের এই আয়োজন যদি আরও বেশি তরুণদেরকে আকর্ষিত করে সৃজনশীলতার দিকে, তাহলে এদেশে সন্ত্রাস কমবে। সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা বাড়বে, সভ্যতা-ভব্যতা এইসব মূল্যবোধগুলো আবার ফিরে আসবে। মানুষে মানুষে ভালবাসা বহুমাত্রিক রূপ পাবে এবং কষ্টার্জিত আমাদের এই দেশটি বেঁচে যাবে। আপনাদের সবার কল্যাণ হোক।

লেখক: বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব

ফটোগ্রাফি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

ফারজানা বিনতে মনজু

ভারতীয় উপমহাদেশে ফটোগ্রাফির ইতিহাসটা কম প্রাচীন নয়, তা প্রায় দেড়শ বছর পুরনো। ১৯৫১ সালে গোলাম কাশেম ড্যাভিই প্রথম বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফি। ফটোগ্রাফি এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষের মনে দ্রুত গতিতে ক্রিয়াশীল।

ফটোগ্রাফি হল সময়কে ধরে রাখার চমৎকার কৌশল। আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ নানাভাবে ফটোগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত। ক্যামেরা বর্তমানে আমাদের নিত্যসঙ্গী। তরুণদের জীবনের আনন্দ-উৎসব, সুখ, দুঃখ সবকিছুই বন্দী করে নেয় ফটোগ্রাফির মাধ্যমে। অতীতকালে আমাদের ফিরে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু ফটোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা সময় বন্দী করতে পারি খুব সহজেই। যার কারণে তরুণ সমাজে ফটোগ্রাফি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তরুণ সমাজ একটু চেষ্টা করলেই বাংলাদেশের জীবনব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারে।

তরুণদের সঠিক সুযোগ দানের মাধ্যমে হয়তোবা আমরা পৃথিবীর বিখ্যাত ফটোগ্রাফার পেতে পারি। তরুণ সমাজ তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে। তরুণ প্রজন্ম ফটোগ্রাফিকে শিল্পপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম তুলে ধরতে চাচ্ছে তার সকল অস্তিত্বকে। ফটোগ্রাফি চর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানে শিল্প এবং প্রযুক্তির দৌড়ে পিছিয়ে থাকা। তারমানে এই নয় যে একটা দামি ক্যামেরা হাতে নিলে একজন ভালো আলোকচিত্রী হওয়া যায়। একজন ভালো আলোকচিত্রী হতে হলে চাই মননশীলতা, শিক্ষা ও দক্ষতা।

লেখক: শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণী, বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ফটোগ্রাফি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা হৃদন পণ্ডিত

মানব মনে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সেই আদিম যুগ থেকে। সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ কতকিছুই না করতো নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য। নারীরা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করত পশুপাখির হাড়, গাছের ছাল ইত্যাদি। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনে সৌন্দর্য ভাবনার পরিবর্তন এসেছে। একজন পেইন্টার তার পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ঐ বিষয়বস্তুর অবয়বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের মনে আনন্দ উচ্ছাস জলছবির ন্যায় প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ঠিক পেইন্টিংয়ের মত আরেক জগতের শিল্পী আছে যারা শিল্পীর মত রং তুলি ব্যবহার করেন না। তারা শুধু একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করেন মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র। তারা স্থায়ী মস্তিষ্কের মাধ্যমে চিত্রা ভাবনা করে একটি তুলির মাধ্যমে তুলে ধরেন যা বাস্তবসম্মত এবং চমকপ্রদ। শৈল্পিক দিক থেকে তুলির সাহায্যে স্থায়ী কল্লনায় যেমন একজন আদর্শ শিল্পী তেমনি একজন আলোকচিত্রী একজন বাস্তব শিল্পী বটে। বিশেষ করে বাংলাদেশী সমাজ ব্যবস্থায় আলোকচিত্রীদের অবস্থা খুবই নাজুক। কারণ, আমাদের দেশে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কর্মসূচি বা এর জন্য প্রয়োজনীয় বই-পুস্তকও নেই। তাই আমাদের দেশে তরুণ আলোকচিত্রী কম। উল্লেখ্য যে, সরকারি বা বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই এ বিষয়ে কোনো পাঠদানের ব্যবস্থা। আলোকচিত্র চর্চার বিষয়টি ব্যয়বহুল তা সকলেরই জানা। আমাদের দেশে সাধারণত মধ্যবিত্তরাই আলোকচিত্রী পেশায় আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে দামী ক্যামেরা, লেন্স কিনতে পারে না বিধায় তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। তাই আমি আমাদের দেশের সকল তরুণ আলোকচিত্রীদের পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের আলোকচিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সরকারিভাবে আলোকচিত্র শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হোক।

লেখক: শিক্ষার্থী, বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

ফটোগ্রাফি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা নিগার সুলতানা

কয়েক বছর আগের মানুষ ফটোগ্রাফি শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলনা। তাদের কাছে ক্যামেরা মানে ছিল ফিল্ম ক্যামেরা, যা শুধু তারা পারিবারিক অনুষ্ঠানেই ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করত। তবে তখনও কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ মানুষ ছিলেন যারা তাদের ছবির মাধ্যমে অনেক মূল্যবান তথ্য তুলে ধরেছিলেন মানুষের সামনে। তবে ইদানিং সব শিল্পের মধ্যে ফটোগ্রাফিটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর পিছনে কিছু কারণও আছে অবশ্য। প্রধান কারণ হল এ কালের তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ। তবে এদের অনেকেরই ধারণা ক্যামেরা থাকা মানে সে একজন ভালো ফটোগ্রাফার, যারা বিভিন্নভাবে বন্ধুদের ছবি তুলে দিয়েই খুশি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, তারা এখন খুব সহজে ছবি তুলে ফেসবুক, ফ্লিকারে প্রদর্শন করছে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ফটোগ্রাফার কখনও পছন্দ করছে, কখনও মন্তব্য করছে, কখনও বাহবা দিচ্ছে ছবির।

তবে তরুণদের ফটোগ্রাফির পিছনে ছোট্ট কারণও আছে। আজ অনেক সহজেই ইন্টারনেটে বসে শিখে ফেলা যাচ্ছে ফটোগ্রাফির টুকটাক পড়ালেখা। খুব সহজেই বড় বড় ফটোগ্রাফারদের ছবি review করতে পারছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারছে। তাছাড়া আজকাল অনেক ইউনিভার্সিটি-ই ফটোগ্রাফি কেন্দ্রিক তরুণদের আগ্রহের কথা চিন্তা করে ফটোগ্রাফির আলাদা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করছে। সেখানে তাদের বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে। এমনকি তাদের হাতে কলমে শেখানোর জন্য বিভিন্ন tour এর আয়োজনও করা হচ্ছে। তাদেরকে encourage করা হচ্ছে। তবে তারপরেও কিছু কথা রয়ে গেল। কোর্স শেষ করা মানে অনেকের ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত পড়ালেখা শেষ, যা ঠিক নয়। আবার অনেকেই কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করে শুধু show off করার জন্য। তাদের কাছে ক্যামেরা থাকার মানে হলো তারা ফটোগ্রাফার। তাছাড়া ফটোশপের কারসাজি তো রয়েছেই। যা তা ছবি তুলে ফটোশপের কারসাজিতে কিছু বাহবা হয়তো জুটে যায়। কিন্তু ফটোগ্রাফারদের জন্য ফটোশপ ব্যবহার করা তখনই প্রযোজ্য, যখন একটি ছবি ৯৫% নিখুঁত, বাকি ৫% ঠিক না করলেই নয়। একটা যা তা ছবি তুলে কারসাজি করে আপলোড করাটা আসলে ক্রিয়েটিভিটি নয়। তবে সেগুলোকে আর্টিস্টিক করা যেতে পারে। Robert Frank বলেছেন- “There is one thing that photograph must contain, the humanity of the moment. This kind of photography is realism is not enough- there has to be vision and the two together can make a good photograph.”

কথা হল আগেও তো মানুষ ছবি তুলত তারা ডিএসএলআর কি তাও জানত না কিন্তু তাদের ছবিগুলো কথা বলত। আজকাল ছবি তোলার অর্থই পাল্টে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটি কুকুর হেঁটে গেলেও তার ছবি তুলতে হবে। Ansel Adams বলেছেন- “A great photograph is one that fully express what one feels, in the deepest sense, about what is been photograph.”

ফটোগ্রাফি মানে কিন্তু বড় বড় লেন্সসহ ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় অর্থহীন ছবি তোলা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছবি তোলা নয়। অনেকেই তো আরো এক ডিগ্রি উপরে। ক্যামেরা হাতে থাকলে তারা দেশের ঐতিহ্যকেও সম্মান করতে ভুলে যায়। নিচের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আশা করি।

এই ছবিটা কোথায় তোলা সবাই দেখেই বুঝতে পারছেন। কী হবে এভাবে ছবি তুলে তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ

রইল। ঐতিহ্যকে পায়ে মাড়িয়ে নয় বরং ঐতিহ্যকে ভালবেসে ছবি তোলা উচিত। তাদের ফটোগ্রাফির কোন অংশেই ক্ষতি তো হচ্ছে না। এছাড়াও Wedding ও Model photography করেনা এমন ফটোগ্রাফার খুব কমই আছে। একটু বেসিক শিখেই এসবের পেছনে ছুটছে তারা। অনেকেরই ধারণা, Wedding ও Model photography না করলেই নাকি ফটোগ্রাফার হওয়া যায়না। সমাজের একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে এগুলো। যারা মধ্যবিত্ত বা গরিব পরিবার থেকে এসেছে তাদের অনেকেরই ক্যামেরা কেনার সামর্থ্য নেই। তাদের অনেকেরই Wedding ও Model photography তে তেমন আগ্রহ নাই। তবুও মুখ বুজে তা করছে শুধু টাকা জমিয়ে একটা ভাল ক্যামেরা কেনার জন্য। তবে এসবের পাশাপাশি তাদের ফটোগ্রাফির প্রতি আসল ইচ্ছাটুকু হারিয়ে যেতে দেয়নি। তবু আমি এখনও অনেক আশাবাদী। কারণ এখনো অনেক তরুণদের কাছে ফটোগ্রাফি তাদের জীবনের মূল প্যাশন। যারা ভালবেসে ছবি তুলছে। যাদের ছবি আজও কথা বলে, যাদের ছবি আজও দেশের মানুষের হয়ে কথা বলে। Imogen Cunningham বলেছেন “Which of my photographs is my favorite? The one I’m going to take tomorrow”

তরুণ প্রজন্মের যাদের ফটোগ্রাফির প্রতি আসলে ভালবাসা আছে, তাদের এ কথাটি মনে রেখে ছবি তুলে যেতে হবে। Because the best is yet to come.

লেখক: শিক্ষার্থী, ইন্সটিটিউট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

রাজশাহী ফটোগ্রাফী সোসাইটির ইতিহাস এ,এন,এম ফরিদ আক্তার পরাগ

রাজশাহীতে ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র চর্চার ইতিহাস বেশ পুরনো। জানা যায়, স্টার স্টুডিওর মালিক মরহুম মোতাহার হোসেন প্রথম কয়েকজন শৌখিন আলোকচিত্র শিল্পীদের নিয়ে আলোকচিত্র চর্চা শুরু করেছিলেন ১৯৫৯ সালে। তিনি আলোকচিত্র সংগঠনটির নাম দিয়েছিলেন 'ফটোগ্রাফি সোসাইটি রাজশাহী'। নানা জটিলতায় সেই সংগঠনটি তার কাজ বেশি দূর এগুতে পারেনি। এরপর বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত বার্ষিক জার্নালে রাজশাহীতে যে ফটোগ্রাফি সোসাইটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার নাম ছিলো 'বিপিএস রাজশাহী শাখা'। তবে সেই সংগঠনটিও ফটোগ্রাফি আন্দোলনে রাজশাহীতে সেভাবে কাজ করতে পারেনি।

১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময় ব্যক্তিগত কাজে রাজশাহীতে চলে আসার সময়, আমি ফরিদ আক্তার পরাগ আমার ফটোগ্রাফি শুরু ও তৎকালীন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সভাপতি জনাব এম এ বেগের সাথে যোগাযোগ করি এবং চলে আসার বিষয়টি তাঁকে জানাই। তিনি বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ সোসাইটি গঠনের পরামর্শ দেন। রাজশাহীতে এসে বেগ স্যারের পরামর্শে পূর্বের ফটোগ্রাফি সংগঠনগুলোর খোঁজখবর নিতে শুরু করি। সংগঠনগুলোর খোঁজ নিয়ে তাদের কার্যক্রমের কোন অস্তিত্ব না পেয়ে ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী যুবসমাজ ও ফটোগ্রাফি ব্যক্তিত্বদের আবারও সংগঠিত করতে থাকি। এভাবে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে আমি ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী কয়েকজন যুবককে নিয়ে 'রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটি' নামে এই সংগঠন গঠন করা যায় কিনা সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকি। সেই সময় থেকে সকলে মিলে ছবি তোলা, বিভিন্ন জায়গায় ফটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা ও আড্ডা দেওয়া শুরু করি।

১৯৮৪ সালের ২০ জানুয়ারি শুক্রবার উদয়ন গ্রন্থনিলয়, জি-৩৫, রাণীবাজার, ঘোড়ামারা, রাজশাহীতে অস্থায়ী কার্যালয় করে 'রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটি' (আরপিএস) প্রথম নয় সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে যাত্রা শুরু করে। ঐ কমিটির সদস্যরা হলেন, সভাপতি- রেজাউল আলম, সহ-সভাপতি- ডাঃ উদয় নারায়ণ মোহন্ত, সাধারণ সম্পাদক- ফরিদ আক্তার পরাগ, সহ-সাধারণ সম্পাদক- মাহফুজ আনোয়ার রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক- রাশেদ হোসেন রাইন, কোষাধ্যক্ষ- তাপস মজুমদার, নির্বাহী সদস্যরা হলেন- ডাঃ আবদুর রব চাখারী, রেজাউল করিম পল্টু, রুহিন মান্নান ও মোখলেছুর রহমান চৌধুরী।

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সহযোগিতায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ উদয় নারায়ণ মোহন্তের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

১৯৮৭ সালে আরপিএস কাশিনা বিল্ডিং, সাহেব বাজারের তিন তলায় ভাড়া করা নিজস্ব কার্যালয়ে চলে আসে এবং ফরিদ আক্তার পরাগকে সভাপতি করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৮৮ সালে রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটির মনোগ্রামের ডিজাইন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. আবু তাহের।

১৯৮৯ সালে ফুজি কালারের সহযোগিতায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রথম রঙ্গিন আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই

আলোকচিত্রের সংগঠন

প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এই প্রতিযোগিতায় ৪৯ জন আলোকচিত্রী অংশ নেন। বিচারক হিসাবে ছিলেন এম এ বেগ ও বিজন সরকার।

১৯৯১ সালে 'আরপিএস' এম এ বেগ স্যারের সহযোগিতায় প্রথম ফটোগ্রাফি বেসিক কোর্স চালু করে। এই বছর পরপর দুটি কোর্স সম্পন্ন হয়।

১৯৯৬ সালে উপদেষ্টা এডভোকেট মহসীন খান ও সোসাইটির সদস্য এ.কে.এম এনামুল কবির (শাহী)র সহযোগিতায় রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। এই বছরে এই সোসাইটিকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। আরপিএস-এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর- রাজ-এস-১৭/৯৬।

রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এ পর্যন্ত ২টি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও ২৪ টিরও অধিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

২০০৩ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত ৩৬, জাহাঙ্গীর সরণী, তলাইমারী মোড়, ডাকঘর-কাজলা, থানা-মতিহার, রাজশাহী সোসাইটির কার্যালয় অবস্থিত।

লেখক: সভাপতি, রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

এসপিএস-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নিজামউদ্দিন লস্কর

সেলফোনের অপর প্রান্ত থেকে অপরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল এক তরুণের, “স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি আছে, সেই সোসাইটির উদ্যোগে আমরা একটি উৎসব উদযাপন করতে যাচ্ছি, তাতে আপনার লেখা চাই।” তরুণটির নাম শুভাশীষ। জানতে পারলাম, বাংলাদেশের বরণ্য আলোকচিত্রী হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন আমার নম্বর তাকে দিয়েছেন। ফোনটা পেয়ে প্রাণ ভরে উঠল। সৃজনশীলতার এক অনন্য শিল্প হচ্ছে আলোকচিত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা সেই শিল্পের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে একটি সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফিক সোসাইটি আয়োজিত এই উৎসবকে সামনে রেখে তাদের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই তথ্য প্রবাহ যে কোনো সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে প্রেষণা জোগাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা শহরের মতো সিলেটেও কতিপয় স্টুডিওর ঘেরাটোপের অন্তরালে মূলত বন্দী ছিল আলোকচিত্র শিল্প। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ফটোস্টুডিওর মালিকদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সৃজনশীলতার চর্চা এবং আলোকচিত্র বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশমান ধারারও কম বেশি প্রয়াস বিদ্যমান ছিল সেখানে। বর্মণ ফটো স্টুডিও, শিল্পাশ্রম, আলোছায়া ফটো স্টুডিওসহ আরো তিন চারটি স্টুডিও ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানাদিসহ ইভেন্ট ফটোগ্রাফিতে এরাই ছিলেন তখন অপরিহার্য। সমগ্র বিশ্বে ফটোগ্রাফিকে তখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি হবি হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই সৌখিন ফটোগ্রাফার হওয়াও খুব একটা সহজ ছিল না। তদুপরি সিলেটে সৌখিন ফটোগ্রাফারের

আলোকচিত্রের সংগঠন

সংখ্যা তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল উল্লেখযোগ্য হারে। প্রবাসীদের মাধ্যমে পাওয়া উপহার সামগ্রীতে ক্যামেরার সংযোজন ছিল তার প্রধান কারণ। ফুজি কালারসহ বিভিন্ন অটো ল্যাব কোম্পানীর উপস্থিতি ছিল দ্বিতীয় কারণ। সৌখিন আলোকচিত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অটো ল্যাবের দ্রুত প্রডাকশন সামগ্রিক আলোকচিত্র শিল্পে বিশাল এক আলোড়নের জন্মদান করে তখন। গুণগত উৎকর্ষ সাধনের একটি চাহিদা সৃষ্টি হয় তাতে। এই চাহিদার আলোড়ন জাগে তখন সিলেটের এক ঝাঁক সৌখিন আলোকচিত্রীদের অন্তরে। এরাই সর্বপ্রথম আলোকচিত্রকে শিল্পের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সিলেটে একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

তরুণদের প্রচেষ্টায় অনেক সংগঠন সিলেটে তথা সমগ্র বাংলাদেশে অগণিত সংগঠন এ যাবত গড়ে উঠেছে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে কখনো মুখ খুবড়ে পড়েছে, কখনো স্থবির হয়েছে চলার গতি, আবার কখনো বিভাজিত হয়েছে একাধিক নামে। কিন্তু সিলেটের এই তরুণরা ছিল তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তড়িঘড়ি করে কোনো সাংগঠনিক কর্মকান্ডের সূত্রপাত না ঘটিয়ে তারা বরং বেরিয়ে পড়ে প্রবীণদের সন্ধানে। বর্মণ ফটো স্টুডিও-এর পূর্ণেন্দু বর্মণ, শিল্পাশ্রম ফটো স্টুডিও-এর নিশীথ পুরকায়স্থ, প্রবীণ আলোকচিত্রী আবুল লেইস শ্যামল এবং সৌখিন আলোকচিত্রী অধ্যক্ষ আবুল বশর এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঐ তরুণরা সবাই ছিল নেশায় আলোকচিত্রী। তুফান উঠল সিলেটের চায়ের আড্ডাগুলোতে। ঠুকাঠুকি শুরু হলো চায়ের পেয়ালায়, অলিম্পিক মশালের মতো ছড়াতে থাকল সৃষ্টির আগুন এক অন্তর থেকে আরেক অন্তরে। ইতিহাসের প্রয়োজনেই যথাযথভাবে লিখে রাখতে হবে আজ ওদের নাম— জগলুল হায়াত, মাহবুব হোসেইন (গ্র্যান্ড বুক স্টল), মোস্তাফিজুর রহমান আলমগীর (তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিলেট ফুজি কালার), মাহবুবুর রহমান (সিলেটের ডাক), নারায়ণ দে সঞ্জু (ফটো সাংবাদিক), আতাউর রহমান আতা (সুমি ফটো স্টুডিও), নজরুল কবির (এফআইভিডিবি), রেজাউল ইসলাম চৌধুরী মুন্না (সিলেট গ্যাস ফিল্ড), মোঃ সাইফুল ইসলাম, সামিউল হক চৌধুরী দিপু, শামসুল বাসিত শেরো, তকুল রানা, মোঃ মসরুর চৌধুরী শওকত ও দিনাজ দেবের নাম আমার মনে পড়ছে আজ।

১৯৯২ সালের ১৫ মার্চ দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকাতে “সিলেটের সৌখিন আলোকচিত্রীদের সভা আজ” শিরোনামে ছোট্ট একটি খবর ছাপা হলো। উত্তাল মার্চের আগুন ঝরা ঐ দিনটিতে সিলেটের ডাকের কার্যালয়ে প্রবীণ আলোকচিত্রী আবুল লেইস শ্যামলের সভাপতিত্বে সিলেটের নবীন-প্রবীণ-সৌখিন আলোকচিত্রীদের সমন্বয়ে সিলেট অঞ্চলের সৌখিন আলোকচিত্র শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আলোকচিত্র বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে গঠিত হয় সিলেট ফটোগ্রাফি সোসাইটি ‘এসপিএস’ এর ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি। মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় ২০ মার্চ নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হলো। অসাধারণ উদ্যম এবং উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হলো এবং মাত্র এক মাসের মাথায় ১৭ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৯২ সালের আহ্বায়ক কমিটির সভায় সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (এসপিএস) এর দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হলো।

আমার নিজের ব্যাপারে এবারে কিছু না লিখলেই নয়। বয়সের হিসেবে একমাত্র আমার অবস্থান ছিল নবীন ও প্রবীণদের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। বছর সাতেক আগে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানী থেকে ফটোগ্রাফির ওপর পড়াশুনা করে আমি তখন সিলেটে এসেছি। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, প্রথম ও তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যবর্তী ব্রীজ ছিলাম আমি। সমগ্র বিষয়টিকে সমর্থন করলেও নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো সময়, আগ্রহ কিংবা অবস্থান ছিল না আমার। কিন্তু একরকম জোর পূর্বক আমার স্ত্রী এবং আমার শত বাঁধার মুখে আমাকে এক বছর সময়ের জন্যে এসপিএস এর প্রথম দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কমিটির কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মনোনীত করা হলো।

বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো—একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদের উপযুক্ত লোকের অভাব না থাকা সত্ত্বেও একজোট হয়ে কাউকে

আলোকচিত্রের সংগঠন

জোরপূর্বক সভাপতি বানানোর ঘটনা খুব একটা সচরাচর ঘটে না।

দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কমিটির প্রথম স্তর হচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদ। উপদেষ্টারা ছিলেন: শ্রী পূর্ণেন্দু বর্মণ, অধ্যক্ষ আবুল বশর, আবুল লেইস শ্যামল, শ্রী নিশীথ পুরকায়স্থ ও সেকিল চৌধুরী।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে কার্যকরী পরিষদ: সভাপতি-নিজামউদ্দিন লস্কর। সাধারণ সম্পাদক-মাহবুবুর রহমান মাহবুব। সহ-সভাপতি- মোঃ মাহবুব হোসেইন ও নারায়ণ দে সঞ্জু। যুগ্ম সম্পাদক- মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আলমগীর ও মোঃ জগলুল হায়াত। কোষাধ্যক্ষ- রেজাউল ইসলাম চৌধুরী মুন্না। সাংগঠনিক সম্পাদক- নজরুল কবির। প্রশিক্ষণ সম্পাদক- আতাউর রহমান আতা। যোগ্যতা বিচার সম্পাদক- সামিউল হক চৌধুরী দিপু। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- সাইফুল ইসলাম। প্রদর্শনী বিষয়ক সম্পাদক- শামসুল বাসিত শেরো। নির্বাহী সদস্য- ছালেহ উদ্দিন মন্টু, মোঃ মশরুর চৌধুরী শওকত। আরমান করিম চৌধুরী দিপু, ইকরামুল কবির ও তকুল রানা।

১৭ সদস্য প্রথম পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম উল্লেখ করার মূল কারণ হচ্ছে এরা না হলে এই সংগঠনটির জন্মই হতো না। অথচ আমি না থাকলে কোনো অসুবিধাই হতো না। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কেউ এভাবে অন্যের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয় না। কিন্তু ওরা আমাকে দিয়েছিল সেদিন।

সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এসপিএস-এর যাত্রা শুরু হলো। ছলছল পড়ে গেল সিলেটের সংস্কৃতি অঙ্গণে। মাসে একাধিকবার নির্বাহী কমিটির সভা, বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রচারণা, সংগঠনের লোগো প্রস্তুত করা, সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমসহ অনেক কিছু। এসপিএস নামটি সমগ্র সিলেটের মানুষের কাছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পরিচিতি পেল ইতোমধ্যে।

১৯৯২ সালের পুরো মে মাস জুড়ে সদস্যপদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলো। সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন বোর্ডের মুখোমুখি হতে হলো আগ্রহী প্রার্থীদের। নিজস্ব ক্যামেরা না থাকলে এবং সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে সদস্যপদ দেওয়া হতো না। আজ পর্যন্ত কঠোরভাবে একই নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ঘটছিল সবকিছু। বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (বিপিএস) এর সহ-সভাপতি বরণ্য আলোকচিত্রী বিজন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসপিএস-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করার পর ১০ আগস্ট ১৯৯২ সালে এসপিএস-কে বিপিএস-এর সাংগঠনিক সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

বিপিএস এর অনুমোদন লাভের মাত্র ৪ দিন পর ১৪ আগস্ট ১৯৯২ সালে এসপিএস এর প্রথম আলোকচিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক সৌখিন ও পেশাদার আলোকচিত্রীদের এই সম্মেলনে আরেকটি বাড়তি শক্তি যোগ হলো অফিস পাওয়ার মাধ্যমে। আমাদের সংগঠনের কার্যক্রম ও গতিধারায় সমৃদ্ধ হয়ে সিলেটের অন্যতম ক্যামেরা সংগ্রাহক, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি, সিলেট গুরুত্বপূর্ণ মার্কেটের স্বত্বাধিকারী ডা. মোস্তফা শাহজামান বাহার এসপিএস-কে বিনা ভাড়ায় একটি অফিস প্রদান করলেন।

অফিস সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। জগলুল হায়াতের বাসা থেকে চেয়ার টেবিল এল, হেলাল মুকুল দিলেন শো-কেস, কেউ দিলেন ফ্যান, কেউবা দেয়াল ঘড়ি, আমি দিলাম কালার এনলার্জার। একদিকে পার্টিশন দিয়ে ডার্করুম এবং তিন দিকের দেয়ালকে গ্যালারী বানিয়ে সাজানো হলো অফিস। মাসুদ নামের এক কলেজ ছাত্রকে বেতনভুক্ত করে অফিস সহকারী করা হলো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিস খোলা হতো। এসেই হাজিরা খাতায় সই দিতে হতো। পরবর্তী সভায় উপস্থিতি পর্যালোচনা করা হতো। প্রত্যেকের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন কমিটির পদায়ন মূল্যায়ন করা হতো। আজও তাই করা হয়।

আলোকচিত্রের সংগঠন

অফিস পাবার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো সেটি হচ্ছে ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ, ইনডোর-আউটডোর ওয়ার্কশপে প্রাস্টিক্যালি ছবি তোলা ও ফটো কন্টেন্টে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করা। মাসিক কনটেন্টের ছবি গ্যালারীতে টাঙ্গিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক বুঝিয়ে দেয়া হতো আলোকচিত্রীদের।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি প্রজেক্ট নির্মাণ করার স্বপ্ন আমার বুকে লালন করে আসছিলাম অনেক দিন থেকে। বাংলাদেশের জন্যে এই কনসেপ্টটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। পশ্চিম জার্মানিতে এই পরিকল্পনাটির সাথে সর্বপ্রথম পরিচিত হই আমি। আমাদের সেখানকার স্কুলের এক ছাত্র বানিয়েছিল এই প্রজেক্ট। ছেলেটির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। ট্রান্সপারেন্সি ফিল্মের ওপর সিরিয়াল স্টিল ছবির সাহায্যে বিশেষ কোনো কবিতার চিত্ররূপ তৈরি করে স্লাইড প্রজেক্টরের সাথে সাউন্ড, মিউজিক সিনক্রোনাইজ করে অডিও ভিজুয়াল স্লাইড শো প্রদর্শনী করা। জার্মানিতে টিকেট দিয়ে সিনেমা হলে প্রদর্শনী করেছিলাম আমরা। ভাবনাটি আমার মাথায় তখন আসে। সে জন্যে একটি স্লাইড প্রজেক্টরও সাথে নিয়ে এসেছিলাম।

মুখ থেকে বের করার সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্লাইড শো নির্মাণের ভাবনাটি এসপিএস-এর সবাই লুফে নিল। টান টান উদ্বেজনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। শুরু হলো দেশের সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অডিও ভিজুয়াল স্লাইড শো “যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা” নির্মাণের প্রস্তুতি পর্ব। ৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মুহূর্তে ধারণকৃত বাংলাদেশের মুক্তিকামী অকুতোভয় আলোকচিত্রীদের অসংখ্য ছবি সংগ্রহ করলাম তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ছবি ও সিলেটের আবুল লেইস শ্যামল, নিশীথ পুরকায়স্থ এবং পূর্ণেন্দু বর্মণের তোলা যুদ্ধকালীন ছবিগুলোসহ। দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার ৭২ সালের একটি বিশেষ সংখ্যা থেকে প্রচুর ছবি পেয়েছিলাম আমরা। ট্রান্সপারেন্সি ফিল্মের ওপর ছবিগুলোকে রিপ্রডাকশন করার সময় জগলুল হায়াত দিনরাত কাজ করেছে আমার সাথে। চিত্রনাট্য তৈরি করেছিল নজরুল কবির। নজরুল কবির, জগলুল, মাহবুব, সাইফুল, মুন্না ঘন্টার পর ঘন্টা অকান্ত পরিশ্রম করে আবহ সঙ্গীত, ধারাভাষ্য, বিস্ফোরণ ও গুলাগুলির শব্দসহ পুরো সাউন্ড ট্র্যাক তৈরি করার পর নির্মিত হলো আমাদের স্বপ্নের অডিও ভিজুয়াল স্লাইড শো- “যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা”।

অবশেষে ১৯৯২ সালের ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এসপিএস-এর উদ্যোগে সিলেটে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। দৈনিক ইত্তেফাকের বিখ্যাত আলোকচিত্রী মরহুম রশিদ তালুকদারের তোলা মুক্তিযুদ্ধের সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক ছবির প্রদর্শনীর সাথে সিলেটের আলোকচিত্রী আবুল লেইস শ্যামল ও নিশীথ পুরকায়স্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবিও স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর ২য় দিনে শহীদ সুলেমান হলে সিলেটে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় “স্বাধীনতা সংগ্রামে আলোকচিত্রের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার। এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক সেমিনার তখন পর্যন্ত দেশের অন্য কোথাও আয়োজিত হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। সেই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আলোকচিত্রী রশীদ তালুকদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসপিএস-এর উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আবুল বশর। সেমিনার শেষে প্রদর্শিত হয় আমাদের সদ্য নির্মিত অডিও ভিজুয়াল স্লাইড শো- “যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা।” হলের বিশাল দেয়ালের ওপর স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াবহ আলোকচিত্রগুলো ফুটে ওঠার সাথে ধারাভাষ্য এবং আবহ সঙ্গীত বাইশ বছর পেছনে টেনে নিয়েছিল মানুষকে। ‘শো’টি দেখার পর হলভর্তি দর্শকদের কেউই সেদিন তাদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা সুলতানা কামালও ভীষণ আবেগ আপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ওপর তার তোলা বহুল আলোচিত ৩৩টি ছবি দান করেছিলেন তিনি এসপিএস-কে।

আলোকচিত্রের সংগঠন

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল একবছর এবং জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল বার্ষিক কার্যক্রমের মেয়াদ। সেই অনুযায়ী এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আটমাস পূর্ণ না হলেও আমরা নতুন কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। ৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার দিন তারিখ নির্ধারণ করা হলো। নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু হলো প্রচুর জল্পনা-কল্পনা। বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ শেষ হবার সাথে সাথে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনে না গিয়ে আবারো মনোনয়নে যেতে চাইল। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে শুধু প্রথমবারের জন্যে মনোনীত করা হয়েছিল, কিন্তু উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হলো। যেহেতু সংগঠনের বয়স এখনো এক বছর পূর্ণ হয়নি, তদুপরি সামনে অনেক কর্মসূচি অতএব আরো আমাকে আরো এক বছর সভাপতির পদে থাকতে হবে। তবে আগামী বছর এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানের নিশ্চয়তাও প্রদান করা হলো। আমার কোনো আপত্তি আমলে না নিয়েই অবশেষে আমাকে সভাপতি, মাহবুবুর রহমান মাহবুবকে সাধারণ সম্পাদক পদে পূর্ণবাহাল রেখে এবং অন্যান্য পদে কিছু রদবদল করে এসপিএস-এর দ্বিতীয় কমিটি গঠন করা হলো।

প্রথম বছরের মতো ৯৩ সালেও কার্যক্রমের কোনো ঘাটতি ছিল না। পুরো বছর জুড়েই ছিল নানা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। প্রথমেই অডিও ভিজুয়াল স্লাইড শো- “যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা”কে পূর্ণবিন্যাস করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের যে সব ছবি আগে আমরা পত্রিকার পাতা থেকে রিপ্রডাকশন করেছিলাম, এবারে মূল ছবিগুলোর আলোকচিত্রীরা স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে ছবিগুলো ব্যবহার করার জন্যে দিলেন আমাদের।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় ‘যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা’র ড্রাম্যাটিক প্রদর্শনী। ঐ দিন ওসমানী যাদুঘরে অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল বাংলা শতাব্দী ১৪০০ সাল উপলক্ষে প্রান্তিক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় ‘জননী জন্মভূমি’ শীর্ষক বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

এসপিএস-এর প্রথম উন্মুক্ত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মে মাসে এবং জুন মাসের ৮ তারিখে পৌরসভা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত এসপিএস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৫ দিন ব্যাপি আলোকচিত্র প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

ঐ বছর ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সাংগঠনিক সম্পাদক জগলুল হায়াতের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় ‘ঈদকোর্ড প্রজেক্ট’। এসপিএস-এর আলোকচিত্রীদের তোলা ছবি সিলেটের বিভিন্ন বিপণী বিতানের শোভাবর্ধন করেছিল সেবার। সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়টি ছিল, ঈদ আসার আগেই প্রতিটি দোকানের শোকেস থেকে প্রতিটি ছবি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের কার্যক্রম দেখে সিলেটের রোটারী ক্লাব অব মিডটাউন একটি জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজনে সাহায্যের হাত প্রসারিত করল। আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী ডা. রশীদ-উন-নবী শুভ্র (এফিয়াপ) এবং হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন (এফিয়াপ) এই দুজনকে বিচারক হিসেবে পেলাম বিপিএস (বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি) এর সহযোগিতার ফলে। প্রতিযোগিতার শিরোনাম ছিল “মাদকাসক্তি শুধু জীবনের ধ্বংসই ডেকে আনে।” মাদক বিরোধী জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ৪৯ জন আলোকচিত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। সাদা কালো ৪৫টি এবং রঙ্গিন বিভাগে ৬৪টি ছবি জমা পড়েছিল। প্রতি বিভাগে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান ছাড়াও তিন জন

আলোকচিত্রের সংগঠন

করে প্রতিযোগীকে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' প্রদান করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচজন নারী ফটোগ্রাফারও অংশ নিয়েছিলেন। ২৫ ও ২৬ নভেম্বর বাছাইকৃত ৩৮টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিলেটের শহীদ সুলেমান হলে। বিপিএস-এর সদস্য ঢাকার ইমতিয়াজ আলম বেগের 'শেষ পরিণতি' ছবিটি প্রথম হয়েছিল, ২য় এসপিএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জগদ্বল হায়াতের শিরোনামহীন ছবি এবং ৩য় স্থান স্থান অধিকার করেছিল বিপিএস-এর সদস্য আব্দুল হামিদ কতোয়াল-এর আনকিয়ার লাইফ ছবিটি। রঙিন বিভাগে চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (সিপিএস) সদস্য আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর 'অন্ধকারের প্রিয়া' ছবিটি প্রথম বিপিএস সদস্য এম এ তাহেরের সেক্স 'ডেট্রাকশন-১' ২য় এবং সিপিএস সদস্য সুমন দাশের 'সৃষ্টিতে নারী ধ্বংসে নারী' শিরোনামের ছবিটি ৩য় হয়েছিল। এসপিএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রেজাউল ইসলাম চৌধুরী মুনীর 'আই ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ' শিরোনামের ছবিটি পেয়েছিল সার্টিফিকেট অব মেরিট।

৯৩ সালের বিজয় দিবসকে সামনে রেখে আরেকটি নতুন প্রজেক্টের পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। সিলেটের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি এ্যালবাম প্রকাশ করা। কবি এ্যালবামের নামকরণ করা হয়েছিল-'আমরা বিজয়ী আমরা জিতেছি।' নামকরণটি প্রস্তাব করেছিলেন সিলেটের কবি দিলওয়ার। এই এ্যালবামে সিলেটের ২০৭ জন মুক্তিযোদ্ধার ছবি এবং ১৯১ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়। সমাজে পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি জনসমক্ষে আসতে না পারা গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, অথবা যারা হতদরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন, দেশ ও জাতির সেইসব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পরিচিতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। ঐ এ্যালবামটিতে প্রতিটি ছবির নীচে নাম, পিতার নাম, যুদ্ধক্ষেত্র, ট্রেনিং ক্যাম্প, ঠিকানা, বয়স ও পেশার বিবরণ ছাপা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের দেয়া ঠিকানাতে এসে ছবি তুলেছিলেন। অনেকের আসার সামর্থ্যটুকুও ছিল না, সেক্ষেত্রে এসপিএস-এর আলোকচিত্রীরা সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কানাইঘাটে ছুটে গিয়েছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্লাইড শো এর মতো এ্যালবামের মূল পরিকল্পনা যদিও আমার ছিল কিন্তু এসপিএস-এর প্রতিটি সদস্য দিনরাত শুধু পরিশ্রম করে নি, বরং আমার চেয়ে অনেক বেশি খাটাখাটনি করে দুটি প্রজেক্টের চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল। এই প্রজেক্ট দুটির নির্মাণ ভাবনা থেকে এসপিএস-এর সদস্যদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, এরা সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের রক্তধারার সন্তান। এসপিএস-এর মতো প্লাটফর্ম না পেলে এ দুটি বিশাল স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমার জীবনে কোনোদিন হতো না এ কথা আমি আজ নির্দিষ্ট স্বীকার করছি।

১৩ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পাঁচ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে প্রখ্যাত আলোকচিত্রী রশীদ তালুকদার ও আবুল লেইস শ্যামলকে, প্রকাশিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ছবির এ্যালবাম। আজও মনে পড়ছে শিল্পী রশীদ তালুকদার সেদিন বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেছিলেন-"এসপিএস-এর কার্যক্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি সংগঠনটির কার্যক্রমের প্রচণ্ড গতিধারা দেখে, এই গতিধারা চালিয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব?" জীবনের অপরাহ্নে এসপিএস প্রদত্ত সম্মাননা কাঁদিয়েছিল শিল্পীকে সেদিন।

কেউ টের পাবার আগেই যেন কর্মমুখর আরেকটি বছরের সমাপ্তি হলো। ডিসেম্বরের শেষভাগে নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক হলো। বার্ষিক সভাতে বসে এবার আরেকটি নতুন বিষয়ের অবতারণা ঘটল। একযোগে সকল সদস্য উপদেষ্টাদের সম্মুখে বসে, আমার কাছে দেয়া তাদের গত বছরের অঙ্গীকার অস্বীকার করল। তারা বলল-"কথা হয়েছিল আপনাকে সম্ভব হলে আগামী বছর সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে, তবে আমরা অনুরোধ করছি এবারটা শুধু হয়ে যান, আগামীতে আর অনুরোধও করব না এবং আরেকটি স্বাধীনতা আপনাকে এবারে দিচ্ছি আমরা, শুধু সভাপতি হিসেবে আপনাকে আমরা সভাই মিলে মনোনীত করছি,

আলোকচিত্রের সংগঠন

বাদবাকি ১৬টি পদে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করুন কোনো আপত্তি নেই আমাদের, বরং আপনার মনোনয়ন কেউ যদি না মানে তখন বলুন আমাদের।” অতএব আমাকে আরেকবার সভাপতি পদে থাকতে হলো। তবে পরের বছরে আমার অব্যাহতি সম্পর্কে একটি লিখিত প্রস্তাব পাশ করিয়ে রাখলাম। প্রসঙ্গতঃ পাঠককে উল্লেখ করে রাখি, এ বিষয়ে আপত্তি জানানোর সময় আমি বলেছিলাম-“সিলেটে অনেকে ভাবছে এসপিএস আমার পকেটের সংগঠনে পরিণত হয়েছে।” উত্তরে সদস্যরা উল্টো চার্জ করেছিল-“যারা ভাবছে ভাবতে থাকুক, আপনার অসুবিধা কোথায়?”

ওপরের কথাগুলো আমার নিজের ঢোল পেটানোর উদ্দেশ্যে লিখি নি, আপনারা যারা পাঠ করবেন, তাদের জ্ঞাতার্থে লিপেছি। সাংগঠনিক পর্যায়ে এই সংস্কৃতির নজির গোটা বাংলাদেশের আর ক’টি কাবে রয়েছে একবার শুধু খোঁজ নিয়ে দেখুন এবং আমার মনে হয় তখনি আজকের এসপিএসকে সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হবেন।

অতি সংক্ষেপে ৯৪ সালের কার্যক্রম বর্ণনা করছি আমি। বছরের শুরুতে ৪ জানুয়ারী চট্টগ্রামের দ্য পোট্রেট-এর উদ্যোগে এসপিএস-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সিলেটে আলোকচিত্রণ ক্যাম্প ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং ৮ এপ্রিল শহীদ সুলেমান হলে অনুষ্ঠিত হয় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক। মহান মে দিবস উপলক্ষে ১ থেকে ৩ মে এসপিএস গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় “শ্রমজীবী মানুষ” শীর্ষক বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ২৮ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ফটোগ্রাফি কর্মশালা। ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সোলেমান হলে অনুষ্ঠিত হয় এসপিএস সদস্যদের মধ্যে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা। ২৯-৩০ অক্টোবর এসপিএস-এর তত্ত্বাবধানে সিলেট প্রেস কাবে অনুষ্ঠিত হয় ফটোসাংবাদিকতা বিষয়ক অরিয়েন্টেশন কোর্স। এসোসিয়েটেড প্রেস এপি-এর বিখ্যাত আলোকচিত্রী পাভেল রহমান কোর্সটি করিয়েছিলেন। ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর সিলেট প্রেস কাবে অনুষ্ঠিত হয় পাভেল রহমানের তোলা একক সংবাদ চিত্র প্রদর্শনী। ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর জেলা ক্রীড়া ভবনে বিজয়মেনা উপলক্ষে প্রদর্শিত হয় এসপিএস-এর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

এসপিএস-এর পথ চলা থামে নি। ৯৫, ৯৬, ৯৭...এভাবে একটি একটি করে বিশ বছর পাড়ি দিয়ে এসেছে। নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অর্জনের খাতায় সাফল্যগাঁথা সংযোজিত হচ্ছে নিয়মিত।

এসপিএস-এর সাফল্যগাঁথার সাথে আরেকটি উল্লেখ করার মতো অনুষ্ঠানের কথা না লিখলেই নয়। ২০১০ সালে এসপিএস কর্তৃক ব্র্যাক ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হলো ২য় জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা। উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ৯০০ ছবি জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ১০০ ছবি প্রদর্শনীর জন্যে বাছাই করা হয়েছিল। তাতে গ্র্যান্ড প্রাইজ-সরফরাজ হায়দার-ঢাকা, ১ম পুরস্কার মোঃ এখলাস উদ্দিন-সিলেট, ২য় পুরস্কার সৌরভ দাশ-ঢাকা, ৩য় পুরস্কার কেএম আসাদ-ঢাকা, পাঁচটি অনারবল মেনশন এবং দুটি স্পেশাল জুরি এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল।

এসপিএস গড়ে তোলার পেছনে প্রধান লক্ষ্য ছিল, সিলেট অঞ্চলের আলোকচিত্র শিল্পীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, সৃজনশীল এই শিল্প মাধ্যমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, শিল্পটির প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং একই সাথে সিলেট অঞ্চলের তরুণদের আলোকচিত্র শিল্পের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। বিশ বছর পর আজকের নেতৃত্ব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবি করতে পারে যে, সেই লক্ষ্যগুলো কল্পনাতীতভাবে অর্জন করেই এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এসপিএস।

জন্ম লগ্ন থেকে এত পরিশ্রম, এত প্রশিক্ষণ, এত কর্মশালা বিফলে যায় নি। ৯৫ সালেই আসে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৯৯৫ সালে এসপিএস সদস্য আব্দুল মোনায়েম জাপানের আকু কনটেস্টে ফুজি ফিল্ম এওয়ার্ড লাভ করে সর্বপ্রথম এসপিএস-এর অগ্রগতি

আলোকচিত্রের সংগঠন

চাকায় দ্বিগুণ গতির সম্ভার করে। ইতোমধ্যে মুনায়েম কয়েকবার এসপিএস-এর সভাপতি হয়েছে এবং বর্তমানে সে সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ করছে।

মুনায়েম সম্পর্কে দুটি কথা লিখা প্রয়োজন। ওর বড়ভাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তার আরেক ভাই ফটো স্টুডিওর মালিকানা বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল ভালো কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মুনায়েমকেও তারা বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল। ঠিক তখনি মুনায়েমকে ক্যামেরা হাতে ছুটাছুটি করতে দেখে তার পরিবারের সবাই চিন্তিত হয়ে গেল। বড়ভাই বশর এল আমার কাছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করেছিলাম মুনায়েমের পরিবারকে সেদিন আমি। মুনায়েম সিলেট শহরের সবচেয়ে পরিচিত ফটোগ্রাফার, সুপরিচিত মডেল ফটোগ্রাফার, ইভেন্ট ফটোগ্রাফিতে একজন সফল আলোকচিত্রী নয় শুধু আন্তর্জাতিক মানের একজন আলোকচিত্রী। এসপিএস-এর সদস্যদের মধ্যে অনেকেই আজ আলোকচিত্রণকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি বরং সফলভাবে গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাচ্ছে।

জন্মলগ্ন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এসপিএস-এ নির্বাচন হয় না। তবে বার্ষিক সাধারণ সভা এক বছরের পরিবর্তে প্রতি দুবছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার সভাপতি প্রয়োজনে আগামী বছরের যোগ্যতা বিচার সম্পাদকের দায়িত্বে যেতে পারেন। পরফর্ম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেই পদায়ন করা হয়।

পরিশেষে আপনাদের উৎসব এবং সংগঠনের ক্রমাগত সাফল্য কামনাসহ লেখাটি শেষ করছি।

লেখক: উপদেষ্টা, এসপিএস (সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি)

এডিপিএস

শাকুর মজিদ

বুয়েটে ক্লাস শুরু হয়েছিল ১৯৮৬ সালে, আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে। দ্বিতীয় বর্ষে উঠি ১৯৮৭ সালেই। এখানে এসে একটা কোর্সের সাথে পরিচিত হই, ফটোগ্রাফি। এক সেমিস্টার পর এই কোর্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সবাই ধার করা ক্যামেরা ফেরত দিয়ে দেন, আমি দেই না। বন্ধুর ক্যামেরা আমার কাছে থেকে যায়, আমি ছবি তুলতে থাকি। কিছু কাজের, কিছু অকাজের। এর মধ্যে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাথে যোগাযোগ বাড়ে, আমি ওখানকার সদস্য হয়ে যাই। মাসিক প্রতিযোগিতায় ছবি জমা দেই। পরপর দু'বার মাসের সেরা ফটোগ্রাফার হলাম। এরপর পুরস্কার আর পুরস্কারে হাত ভরে যেতে থাকলো। ১৯৯০ সালে দেশী বিদেশী ৩টা প্রতিযোগিতায় অংশ নিলাম, ৩টাতেই পুরস্কার জুটলো, আমাকে পায় কে! আমি বইখাতার সাথে ক্যামেরাটা প্রায় অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনা করি। যেখানেই যাই আমার কাঁধে থাকে ক্যামেরা ব্যাগ।

১৯৯১ সালের জুন/জুলাই মাসে একদিন ফুয়াদ স্যার ডিপার্টমেন্টের নীচতলায় আমাকে থামিয়ে বলেন 'তুমি তো একা একাই শুধু ক্যামেরা নিয়ে ঘুরাঘুরি করো, ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের নিয়ে একটা ফটো ক্লাব টাইপের কিছু তো করতে পারো।'

ফুয়াদ স্যার সেকেন্ড ইয়ারে ফটোগ্রাফির টিচার। আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে ২য় বর্ষে ৫০ নম্বরের একটা কোর্স আছে ফটোগ্রাফির। এ কোর্সে সামান্য ২/৩ টা অ্যাসাইনমেন্টে বছর শেষ হয়ে যায়। এ সময় কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে ক্যামেরার প্রতি আগ্রহী দেখা যায়। কিন্তু

শাহাজালাল ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি গালীব

“Photography for mankind with artistry” এই স্লোগান নিয়ে শাহাজালাল ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ১লা জুলাই তাদের যাত্রা শুরু করে। পনের বছর পরে বিশাল সফলতা অর্জন করে। এসইউপিএস এর সদস্যদের নিয়ে বিশিষ্ট বিশিষ্ট আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই ক্লাবটি আলোকচিত্র বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার, আউটিং, এবং ট্যুর সহ বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এসইউপিএস এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইকোনোমিকসের ছাত্র আনিসুর রহমান। ১৯৯৬ সালে ২১-২৩ নভেম্বর প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এর দুই বছর পরই এসইউপিএস ২রা নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে প্রথম কর্মশালা বিষয়ক ট্যুর আয়োজন করে। ওই বছরই এসইউপিএস এর প্রথম ১৯ ডিসেম্বর নৌ-ভ্রমণ হয়, শাবিতে। এরপর ১৯৯৯ সালে এসইউপিএস প্রথম এর বর্ষপঞ্জি বের করে। একই বছর সেপ্টেম্বরে ২৬-৩০ তারিখে প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে এবং ১৭ই নভেম্বর নবীনদের সংবর্ধনা দেয়। ২০০০ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রথম টি-শার্ট উদ্বোধন করে। ২০০১ সালের এপ্রিলে এসইউপিএস এর দলবল নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ট্যুর আয়োজন করে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের শিলংয়ে। এর কিছুদিন পরে জুলাইয়ে এসইউপিএস এর প্রথম পাবলিকেশন “ভিউফাইভার” প্রকাশিত হয়। এসইউপিএস প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের উপর নিয়মিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

লেখক: সভাপতি, শাহাজালাল ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব

ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি ক্লাব। ক্লাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে EWUPC নামে পরিচিত। ক্লাবটির আছে ১২ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। মোঃ সহীদ আলম এবং ফারহানা ফেরদৌসি হচ্ছেন ক্লাবটির প্রতিষ্ঠালগ্নের কার্যকরী সদস্য। বিগত ১২ বছরে EWUPC থেকে অনেক ভালো আলোকচিত্রী বের হয়েছেন, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন।

ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাবের এই ১২ বছরের ভ্রমণ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে অনেক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, যার মধ্যে ৭টি বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ছিল। বিগত ৩ বছরে তাদের বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে আয়োজন করেছে এবং এটি অনেক বড় মিডিয়া কাভারেজ পায়। ঐ উৎসবগুলোতে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা আলোকচিত্রী সাইদা খানমকে, যিনি একজন প্রধান আলোকচিত্রী, চলচ্চিত্রগ্রাহক ও স্থাপত্যপ্রকোশলী। এছাড়াও আনোয়ার হোসেন, রশীদ তালুকদার এবং জনাব নাসির আলী মামুনকে পুরস্কৃত করা

আলোকচিত্রের সংগঠন

যে আলোকচিত্র শিল্পে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য। এছাড়াও ক্লাবটি বর্ষে কয়েকটি বিষয়নির্ভর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে যেমন পোর্ট্রেইট আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্টিল আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ভ্রমণ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রে অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই ২০১২ সালে নেপাল ভ্রমণ করে। এ ভ্রমণে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ভ্রমণটি নিয়ন্ত্রণ করেন ক্লাবের নিয়ন্ত্রক ও সহকারী অধ্যাপক মোঃ সাইদ আলম। এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা আলোকচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পেরেছি যেমন: পোর্ট্রেইট, ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল লাইফ এবং আর্কিটেকচার।

লেখক: সভাপতি, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব

“আলোকচিত্র যুদ্ধে জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পাই”

তাপস কুমার সাহা

ছিল না কোন ফটোগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ছিল না ফটোগ্রাফির উপর প্রকাশিত কোন বই পুস্তক পড়ে শুরু করা। নারায়ণগঞ্জ জেলায় বসবাসরত একঝাঁক তরুণ ১৯৯০ সালে আলোকচিত্রকে ভালোবেসে আলোকচিত্রী হবার স্বপ্ন দেখলেন। প্রথম খেয়ালটি এলো কামাল উদ্দিনের মাথায়। সময়না কিছু মানুষের সাথে আলোকচিত্র বিষয়টি আলোচনা করলে তাদের ভাবনায়ও বিষয়টি ছিল বলে প্রকাশ করেন। শুরু হলো প্রাথমিক আলোচনা, উপস্থিত ছিলেন বংশী সাহা (প্রয়াত সাংবাদিক), কাশেম জামাল, সুনিল আমিন, হাবিবুল বাহার চৌধুরী, শামসুস সালেহিন, তোফাজ্জেল হোসেন, আরিফ আলম দিপু, প্রস্তাবক কামাল উদ্দিনসহ আরো অনেকে। নামকরণ করা হয় নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফি সোসাইটি। অনুমতি নেয়া হয় বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি সোসাইটি থেকে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বিপিএস এর অনুমতি সাপেক্ষে একটি করে জেলা সংগঠন হতে পারে, তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফি সোসাইটি। শুধু ক্যামেরা থাকলে চলবে না, প্রয়োজন আলোকচিত্র জ্ঞান, প্রয়োজন ফটোগ্রাফি শিক্ষা। ছুটে চললেন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ আমাদের ফটোগ্রাফি গুরু আলোকচিত্রাচার্য এম. এ. বেগ এর কাছে। শুরু হলো প্রশিক্ষণ। শুরু হলো ছবি তোলা। কামাল উদ্দিন তার বাসায় তৈরি করলেন ডার্করুম। সাদাকালো ছবি প্রিন্ট করা, ডেভেলপ করা ইত্যাদি। যখন একঝাঁক তরুণ ক্যামেরা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছবি তোলা শুরু করলেন, তখন তাদের দেখে অনেক শিক্ষিত যুবক আগ্রহ প্রকাশ করে এনপিএস এর সদস্য হয়ে ছবি তোলা শুরু করেন। ধীরে ধীরে নারায়ণগঞ্জ শহরে অনেক আলোকচিত্রী তৈরি হয়ে উঠলো। ১৯৯১ সালে আলি আহম্মদ পৌর মিলনায়তনে তিনদিন ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো; যার ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। প্রদর্শনীতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিলো ব্যাপক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের গুরু মঞ্জুরুল আলম বেগ, ডঃ শহিদুল আলম, বিজন সরকার, রশিদ তালুকদারসহ দেশের সব বিখ্যাত আলোকচিত্রীগণ। পর্যায়ক্রমে সদস্যপদ গ্রহণ করেন মোহাম্মদ হাতেম, জামিরুল হক নিপু, পিটার অসিম ডিকস্টা, তাপস কুমার সাহা, জাকির হোসেন মুন্না, বজলুর রশিদ সেলিম, সামসুর রহমান, প্রনব কৃষ্ণ রায়, জি. এম. বি আকাশ, চঞ্চল মাহমুদ, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন, ইমতিয়াজ আলম বেগসহ আরো অনেক আলোকচিত্রী।

ক্রমান্বয়ে দেশে বিদেশে বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে স্বর্ণপদক সহ বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হন

আলোকচিত্রের সংগঠন

এনপিএস সদস্যরা। আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত আলোকচিত্রীগণ হলেন পিটার অসিম ডিকস্টা, হাবিবুল বাহার চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, তাপস কুমার সাহা, জি. এম. বি আকাশ সহ আরো অনেকে। ক্রমান্বয়ে দেশে বিদেশে আলোকচিত্র অঙ্গণে ছড়িয়ে পরে নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির নাম ও খ্যাতি। এনপিএস নিয়মিত আয়োজন করে ওয়ার্কশপ, ফটোগ্রাফিক আড্ডা, জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর। তৈরী হয় নতুন নতুন আলোকচিত্রী, এরই মধ্যে অনেকে চলে যান দেশের বাইরে। আবার অনেকে কর্মব্যস্ততার কারণে ছেড়েও দিয়েছেন নিয়মিত ফটোগ্রাফি। এনপিএস এর যে কোন আয়োজনে উপস্থিত থাকেন সকলে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় ফটোগ্রাফির, চলে আসে ডিজিটাল ক্যামেরা। শুরু হয় ফটোগ্রাফির নতুন ধারা ও প্রযুক্তি। এনপিএস কখনো থেমে থাকেনি। নিয়মিত চলছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও পথ প্রদর্শনী। সংগঠনের দায়িত্ব নেয়া কিছু আলোকচিত্রী তাদের ব্যস্ততার কারণে সংগঠনের ধারাবাহিকতায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও মন থেকে মুছে যায়নি ভালোবাসার এনপিএস। কালের পরিবর্তনে সাংগঠনিক কার্যক্রম থেমে থেমে চললেও ব্যক্তিগতভাবে ফটোগ্রাফি চালিয়ে গেছেন অনেকে। অনেকে দেশের বাইরে থাকেন। কিন্তু পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফটোগ্রাফিকে। অনেকে দেশে থেকেও ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। ফটোসাংবাদিকতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের নাম উল্লেখ করলে আবার অনেকের নাম মনের ভূলে বাদ পরে যেতে পারে তাতে মনে অসন্তুষ্টি তৈরী হতে পারে। গোলাম কাশেম ড্যাডি এনপিএসকে ভালোবেসে অনেক উপদেশ, অনেক শাসন, অনেক শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। পাঠশালায় প্রশি়ণরত অনেক ছাত্র এনপিএস সদস্য পরিচয় দিলে ডঃ শহিদুল আলম তাকে আরো বেশী স্নেহ দিয়েছেন। অনেক নতুন সদস্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে বেসিক কোর্স গ্রহণ করে আলোকচিত্রী হয়েছেন। অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বিপিআই থেকে, প্রিজম থেকে। আমরা গর্ববোধ করি আমাদের উত্তরসূরীরা যেভাবে এনপিএস এর নাম দেশে বিদেশে প্রচার করেছেন এবং সুনাম অর্জন করেছেন, ফটোগ্রাফির যে কোন মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে এনপিএস এর নাম বললে যেন একটু বেশী ভালোবাসা পাওয়া যায়। ধন্যবাদ জনাব কাশেম জামাল, জনাব কামাল উদ্দিন, সুনিল আমিন, এম এ মালেকসহ আরো অনেককে, যারা এখনো এনপিএস এর হাল ধরে রেখেছেন। এখনো রেখেছেন যথেষ্ট নজরদারী। কারণ, আপনাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি এনপিএস-কে কিভাবে মায়ের মতো, সন্তানের মতো ভালোবাসতে হবে। বর্তমানে যারা এনপিএস এর সাংগঠনিক দায়িত্ব আছেন তাদের অন্যতম বর্তমান সভাপতি শামসুস সালাহিন। তার নেতৃত্বে এনপিএস ২০ বছর পূর্তি উৎসব আয়োজন করেছেন (৭দিন ব্যাপী)। বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম ও বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র (নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন) সেলিনা হায়াত আইভি। তাদের দুজনকে একই মঞ্চে তুলে এনপিএস এর সদস্যরা গর্বিত হয়েছেন। এনপিএস গর্ববোধ করেন তাদের নিয়ে, যারা দেশে বিদেশে ফটোগ্রাফিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যখন যারা এনপিএস এর সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়েছেন, তারাই দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সাথে এনপিএস এর পতাকা সম্মুখে এগিয়ে নিয়েছেন। ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া আন্দোলন “জাতীয় আলোকচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই”। তার স্লোগান এখনো আমাদের কণ্ঠে বহমান। হয়তো আলোকচিত্র আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাগুরু জনাব এম এ বেগ আমাদের শিখিয়েছেন আলো দিয়ে যে ছবি তোলা হয়, তা হচ্ছে আলোকচিত্র। আমরা আজো সেই আলোকচিত্রের সন্ধান ঘুরে বেড়াই দেশে-বিদেশে, পথে-ঘাটে, পাহাড়ে, সমুদ্রের তলদেশে সেই ঝিনুক খোঁজার মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটির এই মহৎ আয়োজনকে আমরা স্বাগত জানাই। আপনাদের এই বিশাল আয়োজনে আপনাদের পথের সাথী হতে চাই।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

১৯৯৮ সালের এ্যান্টি ব্যাপিস্ট মুভমেন্ট (ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন) এর সময় তিন চারজন শিক্ষার্থী নিজের তাগিদে এই আন্দোলনের একটা ডকুমেন্টেশন শুরু করে। সে সময় ওদের তোলা অনেক ছবি পত্রিকার প্রধান ছবিও হয়। পরে তারা একত্রিত হয়ে জন্ম দেয় জেপিএস, যার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে ছিলেন শামীমা বিনতে রহমান, বিশ্বজিৎ দাস, রাজিবুল হোসেন এবং লিমা। ১৯৯৯ সালে জেপিএস প্রথম ফটোগ্রাফি কোর্স শুরু করে ২৯ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। কোর্স শেষে জেপিএস প্রথম ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন করে 'ফাস্ট ক্লিক' শিরোনামে। সেবার জেপিএস বাংলাদেশে প্রথম আজীবন সম্মাননা চালু করে। প্রথম ফটোগ্রাফার যিনি আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পায় তিনি হচ্ছেন রশীদ তালুকদার। ১৯৯৯ থেকে এখনো পর্যন্ত জেপিএস এখনো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ফটোগ্রাফি কোর্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন করে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বুধবার 'ছবিবার' নামে জেপিএস এর একটি নিয়মিত এক্সিবিশনও চালু আছে।

বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি বা বুয়েটপিএস। বুয়েট পড়ুয়া নবীন আলোকচিত্রীদের ধাপে ধাপে আলোকচিত্রের বিস্তৃত জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয় এর পথচলা। নবীন প্রবীণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্ব স্ব দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অতঃপর আত্মপ্রকাশ করে একটি পরিবার। বর্তমানে এই পরিবারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় অর্ধসহস্র। এই সংগঠনটি নিয়মিত আয়োজন করে আসছে ফটো আড্ডা, আলোচনা বৈঠক, ফটোওয়াক এবং আলোকচিত্র বিষয়ক কর্মশালার। সম্প্রতি জুলাই মাসে আয়োজিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী কর্মশালা "Workshop: Basic & Advanced Photography".

এছাড়াও প্রতিবছর বুয়েট পিএসের ব্যানারে আয়োজিত হয় বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী যাতে বুয়েটের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষক বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরেন তাদের সাম্প্রতিক কাজ। চলতি বছরের জুন মাসে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারীতে আয়োজিত "Transcendence Beyond Time" প্রদর্শনীর মাধ্যমে বুয়েটপিএস উদযাপন করেছে তার ১৫তম বর্ষপূর্তি।

ফেলে আসা বছরগুলোতে বুয়েটপিএস এর অর্জন উৎসাহ দেয় তাকে আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ভিশন ০৯ ফটোগ্রাফি কনটেস্টে নাসের ইমরান হোসেন পান প্রথম পুরস্কার। আনিক মোস্তফা সরওয়ার ফাইনালিস্ট হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। এছাড়া বিগত তিন বছরে আইআইইউপিই তে বুয়েটপিএস অর্জন করে ১২টি পুরস্কার। বুয়েট পিএসএ নির্বাহী পরিষদের সভাপতি আনিক মোস্তফা আনোয়ার মনে করেন এ সংগঠনটি "ঘরের বাইরে আরেকটি ঘর পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার"।

আলোকচিত্রের সংগঠন

আর এই পরিবারটি প্রতি বছর স্বাগতম জানায় একঝাঁক নবীন আলোকচিত্রীদের; একত্রে আলোকচিত্রের বিচিত্র ভূবনে শুরু হয় আরেকটি অভিযান।

লেখক: সদস্য, বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি(ইউ আই ইউ) হুজাতুল ইসলাম

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর ক্লাব গুলোর মধ্যে ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাবটি অন্যতম। ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করা এ ক্লাবটি ইতোমধ্যেই নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় এর বাইরেও বোদ্ধা মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমানে ক্লাবটি বিশ্ববিদ্যালয় এর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বিগত দিনগুলোর মত, বিশ্ববিদ্যালয় এর কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা এবং ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদের সুচিন্তিত এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ক্লাবটিকে আরো নুতন অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে বলে ক্লাব সংশ্লিষ্ট সবাই বিশ্বাসী। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সালেহিন এর কাছ থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট দর্শন চাকমা এবং তার নির্বাহী সদস্যবৃন্দ একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্লাবটি উত্তরোত্তর আরো ভাল কাজের মাধ্যমে ক্লাবের ভবিষ্যৎ সদস্যদের সামনে একটি রূপরেখা দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং একই সাথে ক্লাবটি যাতে সামাজিক দায়বদ্ধতাগুলো পূরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আরো বৃদ্ধি করতে পারে।

এই লক্ষ্যে ক্লাব তার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এ বছর মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইউ আই ইউ ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবস উদযাপনই না, নবাগত শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্লাবটিকে পরিচিত করে তোলাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাবের সদস্যদের তোলা ছবি থেকে সম্মানিত বিচারকদের রায়ে ৩০ টি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ৪ টি আভ্যন্তরীণ প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিল ক্লাব। উক্ত প্রদর্শনীগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও বছর ব্যাপী ক্লাব নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক সেমিস্টারে সদস্য সংগ্রহ, সদস্যদের নিয়ে আলোকচিত্র এবং সাংবাদিকতার উপর নানাবিধ কর্মশালার আয়োজন, দেয়াল ম্যাগাজিন, মাসিক ছবি তোলার জন্য ট্যুর, ছবি সংগ্রহ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ সহ আরো অনেক কিছু। এর বাইরেও ক্লাব নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফটোগ্রাফি ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা একটি ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করাই ক্লাবের অন্যতম লক্ষ্য। এবং সে লক্ষ্যেই ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: নির্বাহী, মিডিয়া এবং প্রকাশনা, ইউ আই ইউ পি সি

আলোকচিত্রের সংগঠন

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাবের যাত্রা শুরু হয় ২০০১ সালে মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে। যা গত ১১ বছরে দুই শতক ছাড়িয়েছে। মাঝে কিছুদিন ক্লাবের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও সম্প্রতি পূর্ণ উদ্যমে আবারও কাজ শুরু হয়। গত বছরে ক্লাবের উদ্যোগে সফলভাবে তিনটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব হতে সফল ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজী আশিক-উজ্জামান, নাভিদ বিন সাখাওয়াত, মুহাম্মদ জাকিউল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। উঠতি ফটোগ্রাফার হিসাবে আসিফ ইকবাল, তুষার চৌধুরী, ইশিকা আলিম, মুশদা আলী ক্লাবের সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। ক্লাবের উপদেষ্টা হিসাবে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মদ নাফিসুর রহমান এর অবদান অনস্বীকার্য। আলোকচিত্রশিল্পকে আত্মপ্রকাশের সৃজনশীল ধারা হিসেবে উপস্থাপন করা এই ক্লাবের লক্ষ্য। ভবিষ্যতে আলোকচিত্র শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব।

AIUBPC

APC, ২০০৫ সালের চব্বিশে ডিসেম্বর এই AIUB তে অধ্যয়নরত কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এ ক্লাবের যাত্রা শুরু হলো। ফটোগ্রাফিতে অধিক আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচেষ্টায়, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও আগ্রহীদের মধ্যে নির্দিষ্ট সংযোগের মাধ্যমে নিজেদের ফটোগ্রাফির উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই মূলত এই ক্লাবের সূচনা। এর সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব AIUB এর ছাত্রছাত্রীদের হাতে থাকলেও প্রতিষ্ঠানের অনুমতিক্রমে সকল আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গত বছর (২০১১) এ ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে APC থেকে AIUBPC (American International University of Bangladesh Photography Club) রাখা হয়। এবং উক্ত বছরে দৃক গ্যালারিতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আলোকচিত্র প্রদর্শনী (Intra AIUB Photography Exhibition) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ক্লাবের সদস্য বাদেও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

ফটোগ্রাফির প্রাথমিক ধারণা ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ছাড়াও ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী সহ সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা করার সুযোগ করে বাংলাদেশকে নতুন করে দেখার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ অঞ্চলে ফটোগ্রাফি আউটডোর ব্যবস্থা সহ আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করা এ ক্লাবের দায়িত্ব।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস)

মাণ্ডুক ইসলাম ঝন্টু

ফটোগ্রাফির প্রতি ঝোক ছিল ছোটবেলা থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্র ছিলাম। সেই সময়ে বেসিক কোর্স করে ছিলাম। খেয়াল করে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার কোনো ব্যবস্থা নেই অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি সুযোগ থাকা উচিত ছিল। এখানেই সুযোগটা বেশি এটা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে (যারা ফটোগ্রাফির বিষয়ে আগ্রহী) ১৯৯৯ সালে জুন মাসে অস্থায়ীভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির (ডিইউপিএস) আহ্বায়ক কমিটি গঠন করি। সেই কমিটিতে আমি মাণ্ডুক ইসলাম ঝন্টু আহ্বায়ক, তারিকুল ইসলাম ইমন সাধারণ সম্পাদকসহ আরো অনেকে ছিল এবং আমাদের প্রথম সাধারণ সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন। এরা সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়মিত ছাত্র ছিল। এই সাধারণ সদস্যরাই মূলত ডিইপিএস এর প্রথম ফান্ড তৈরী করে। প্রত্যেকেই ৫০ টাকা করে চাঁদা দেয়। এই ফান্ড থেকেই আমরা প্রাথমিকভাবে সিল, প্যাড, ব্যানার, অফিসের প্যাড, লোগো তৈরী ইত্যাদির সমুদয় খরচ বহন করি। যাই হোক এরপর আমাদের স্থায়ী কমিটির প্রক্রিয়া শুরু হয় ২৯ আগস্ট, ১৯৯৯। আমরা ১৫ সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি গঠন করি। আমি সভাপতি, তারিকুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। শফিকুল ইসলাম বাপ্পিকে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম স্থায়ী কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ফাউন্ডার মেম্বর হিসেব গণ্য করা হয়। কমিটির মেয়াদ রাখা হলো এক বছর। এরপর প্রতিবছর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন হয়ে আসছে এ পর্যন্ত। সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের পাশাপাশি আমরা একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করি। এর সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ডিইউপিএস এর উপদেষ্টা হিসেবে সংযুক্ত করি। এর মধ্যে ছিলেন তৎকালীন ভিসি এ.কে.আজাদ চৌধুরী, প্রো-ভিসি ড. শাহাদাৎ হোসেন বর্তমান ভিসি আ.আ.ম.স আরফিন সিদ্দিক, ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, ড. দুর্গা দাস ভট্টাচার্য, ড. আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। সেবছরই ১৬ই ডিসেম্বর ডিইউপিএস-এর পক্ষ থেকে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করি। ১৪ এপ্রিল ২০০০ পহেলা বৈশাখ ডিইউপিএস-এর প্রথম ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর যাত্রা শুরু হয়। ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন সেই সময়ের প্রো-ভিসি ড. শাহাদাৎ হোসেন এবং ড. আরফিন সিদ্দিক স্যার। এ প্রোগ্রামে মোট ১১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ট্রেনিং প্রোগ্রাম সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব আবু সাঈদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এ.কে.আজাদ চৌধুরী, প্রো ভিসি ড. শাহাদাত হোসেন, ড.আরফিন সিদ্দিকসহ অনেকে। পাশাপাশি একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিলো। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী জনাব আবু সাঈদী। এরপর থেকে প্রতিবছর ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ হলে থ্রেডিয়েশন পদ্ধতি যাচাই করে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেয়া হত। একসময় প্রতিষ্ঠাতা কমিটির মেয়াদ শেষে হয়ে আসে। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠাতাদের সকলেই অবসর নেয় কিন্তু প্রতিবছরই একঝাঁক তারুণ্যদীপ্ত, আলোকচিত্রে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডিইউপিএস এ গঠন করা হয় নতুন কমিটি। নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রী, নতুন নতুন মুখ। হাটি হাটি পা করে দিন মাস বছরঘুরে একযুগ সাফল্যের সাথে পথ অতিক্রম করেছে সংগঠনটি। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আলোকচিত্রে অংশ নেয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আলোকচিত্র চর্চার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ডিইউপিএস। আগামীতে আরো সফলতার সাথে ডিইউপিএস এগিয়ে চলুক এই কামনা করি। ডিইউপিএস এর সকল কার্যকরী কমিটির সদস্য সাধারণ সদস্য সহকর্মী ও শিক্ষক মণ্ডলী সবার প্রতি রইল শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

১৯৯৮ সালের এ্যান্টি র‍্যাপিস্ট মুভমেন্ট (ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন) এর সময় তিন চারজন শিক্ষার্থী নিজের তাগিদে এই আন্দোলনের একটা ডকুমেন্টেশন শুরু করে। সে সময় ওদের তোলা অনেক ছবি পত্রিকার প্রধান ছবিও হয়। পরে তারা একত্রিত হয়ে জন্ম দেয় জেপিএস, যার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে ছিলেন শামীমা বিনতে রহমান, বিশ্বজিৎ দাস, রাজিবুল হোসেন এবং লিমা। ১৯৯৯ সালে জেপিএস প্রথম ফটোগ্রাফি কোর্স শুরু করে ২৯ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। কোর্স শেষে জেপিএস প্রথম ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন করে 'ফাস্ট ক্লিক' শিরোনামে। সেবার জেপিএস বাংলাদেশে প্রথম আজীবন সম্মাননা চালু করে। প্রথম ফটোগ্রাফার যিনি আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পায় তিনি হচ্ছেন রশীদ তালুকদার। ১৯৯৯ থেকে এখনো পর্যন্ত জেপিএস এখনো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ফটোগ্রাফি কোর্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন করে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বুধবার 'ছবিবার' নামে জেপিএস এর একটি নিয়মিত এক্সিবিশনও চালু আছে।

বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

তাহমিদ সৈয়দ আবতাহী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি বা বুয়েটপিএস। বুয়েট পড়ুয়া নবীন আলোকচিত্রীদের ধাপে ধাপে আলোকচিত্রের বিস্তৃত জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয় এর পথচলা। নবীন প্রবীণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্ব স্ব দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অতঃপর আত্মপ্রকাশ করে একটি পরিবার। বর্তমানে এই পরিবারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় অর্ধসহস্র। এই সংগঠনটি নিয়মিত আয়োজন করে আসছে ফটো আড্ডা, আলোচনা বৈঠক, ফটোওয়াক এবং আলোকচিত্র বিষয়ক কর্মশালার। সম্প্রতি জুলাই মাসে আয়োজিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী কর্মশালা "Workshop: Basic & Advanced Photography".

এছাড়াও প্রতিবছর বুয়েট পিএসের ব্যানারে আয়োজিত হয় বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী যাতে বুয়েটের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষক বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরেন তাদের সাম্প্রতিক কাজ। চলতি বছরের জুন মাসে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারীতে আয়োজিত "Transcendence Beyond Time" প্রদর্শনীর মাধ্যমে বুয়েটপিএস উদযাপন করেছে তার ১৫তম বর্ষপূর্তি।

ফেলে আসা বছরগুলোতে বুয়েটপিএস এর অর্জন উৎসাহ দেয় তাকে আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ভিশন ০৯ ফটোগ্রাফি কনটেস্টে নাসের ইমরান হোসেন পান প্রথম পুরস্কার। আনিক মোস্তফা সরওয়ার ফাইনালিস্ট হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। এছাড়া বিগত তিন বছরে আইআইইউপিই তে বুয়েটপিএস অর্জন করে ১২টি পুরস্কার। বুয়েট পিএসএ নির্বাহী পরিষদের সভাপতি আনিক মোস্তফা আনোয়ার মনে করেন এ সংগঠনটি "ঘরের বাইরে আরেকটি ঘর পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার"।

আলোকচিত্রের সংগঠন

আর এই পরিবারটি প্রতি বছর স্বাগতম জানায় একঝাঁক নবীন আলোকচিত্রীদের; একত্রে আলোকচিত্রের বিচিত্র ভুবনে শুরু হয় আরেকটি অভিযান।

লেখক: সদস্য, বুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি(ইউ আই ইউ) হুজাতুল ইসলাম

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর ক্লাব গুলোর মধ্যে ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাবটি অন্যতম। ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করা এ ক্লাবটি ইতোমধ্যেই নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় এর বাইরেও বোদ্ধা মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমানে ক্লাবটি বিশ্ববিদ্যালয় এর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বিগত দিনগুলোর মত, বিশ্ববিদ্যালয় এর কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা এবং ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদের সুচিন্তিত এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ক্লাবটিকে আরো নুতন অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে বলে ক্লাব সংশ্লিষ্ট সবাই বিশ্বাসী। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সালেহিন এর কাছ থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট দর্শন চাকমা এবং তার নির্বাহী সদস্যবৃন্দ একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে চাকমা এবং তার নির্বাহী সদস্যবৃন্দ একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্লাবটি উত্তরোত্তর আরো ভাল কাজের মাধ্যমে ক্লাবের ভবিষ্যৎ সদস্যদের সামনে একটি রূপরেখা দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং একই সাথে ক্লাবটি যাতে সামাজিক দায়বদ্ধতাগুলো পূরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আরো বৃদ্ধি করতে পারে।

এই লক্ষ্যে ক্লাব তার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এই লক্ষ্যে ক্লাব তার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এ বছর মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইউ আই ইউ ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবস উদযাপনই না, নবাগত শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্লাবটিকে পরিচিত করে তোলাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাবের সদস্যদের তোলা ছবি থেকে সম্মানিত বিচারকদের রায়ে ৩০ টি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ৪ টি আভ্যন্তরীণ প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিল ক্লাব। উক্ত প্রদর্শনীগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও বছর ব্যাপী ক্লাব নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক সেমিস্টারে সদস্য সংগ্রহ, সদস্যদের নিয়ে আলোকচিত্র এবং সাংবাদিকতার উপর নানাবিধ কর্মশালার আয়োজন, দেয়াল ম্যাগাজিন, মাসিক ছবি তোলার জন্য ট্যুর, ছবি সংগ্রহ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ সহ আরো অনেক কিছু। এর বাইরেও ক্লাব নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফটোগ্রাফি ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা একটি ফটোগ্রাফি এবং জার্নালিজম ক্লাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করাই ক্লাবের অন্যতম লক্ষ্য। এবং সে লক্ষ্যেই ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: নির্বাহী, মিডিয়া এবং প্রকাশনা, ইউ আই ইউ পি সি

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাবের যাত্রা শুরু হয় ২০০১ সালে মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে। যা গত ১১ বছরে দুই শতক ছাড়িয়েছে। মাঝে কিছুদিন ক্লাবের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও সম্প্রতি পূর্ণ উদ্যমে আবারও কাজ শুরু হয়। গত বছরে ক্লাবের উদ্যোগে সফলভাবে তিনটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব হতে সফল ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজী আশিক-উজ্জামান, নাভিদ বিন সাখাওয়াত, মুহাম্মদ জাকিউল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। উঠতি ফটোগ্রাফার হিসাবে আসিফ ইকবাল, তুর্য চৌধুরী, ইশিকা আলিম, মুশাদা আলী ক্লাবের সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। ক্লাবের উপদেষ্টা হিসাবে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মদ নাফিসুর রহমান এর অবদান অনস্বীকার্য। আলোকচিত্রশিল্পকে আত্মপ্রকাশের সৃজনশীল ধারা হিসেবে উপস্থাপন করা এই ক্লাবের লক্ষ্য। ভবিষ্যতে আলোকচিত্র শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাব।

AIUBPC

APC, ২০০৫ সালের চব্বিশে ডিসেম্বর এই AIUB তে অধ্যয়নরত কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এ ক্লাবের যাত্রা শুরু হলো। ফটোগ্রাফিতে অধিক আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচেষ্টায়, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও আগ্রহীদের মধ্যে নির্দিষ্ট সংযোগের মাধ্যমে নিজেদের ফটোগ্রাফির উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই মূলত এই ক্লাবের সূচনা। এর সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব AIUB এর ছাত্রছাত্রীদের হাতে থাকলেও প্রতিষ্ঠানের অনুমতিক্রমে সকল আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গত বছর (২০১১) এ ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে APC থেকে AIUBPC (American International University of Bangladesh Photography Club) রাখা হয়। এবং উক্ত বছরে ঢাক গ্যালারিতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আলোকচিত্র প্রদর্শনী (Intra AIUB Photography Exhibition) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ক্লাবের সদস্য বাদেও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

ফটোগ্রাফির প্রাথমিক ধারণা ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ছাড়াও ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী সহ সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা করার সুযোগ করে বাংলাদেশকে নতুন করে দেখার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ অঞ্চলে ফটোগ্রাফি আউটডোর ব্যবস্থা সহ আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করা এ ক্লাবের দায়িত্ব।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস)
মাস্তুল ইসলাম বন্টু

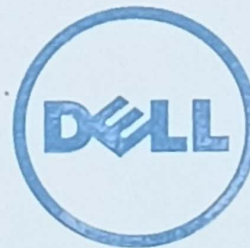
ফটোগ্রাফির প্রতি ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্র ছিলাম। সেই সময়ে বেসিক কোর্স করে ছিলাম। খেয়াল করে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার কোনো ব্যবস্থা নেই অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি সুযোগ থাকা উচিত ছিল। এখানেই সুযোগটা বেশি এটা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে (যারা ফটোগ্রাফির বিষয়ে আগ্রহী) ১৯৯৯ সালে জুন মাসে অস্থায়ীভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির (ডিইউপিএস) আহ্বায়ক কমিটি গঠন করি। সেই কমিটিতে আমি মাস্তুল ইসলাম বন্টু আহ্বায়ক, তারিকুল ইসলাম ইমন সাধারণ সম্পাদকসহ আরো অনেকে ছিল এবং আমাদের প্রথম সাধারণ সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন। এরা সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়মিত ছাত্র ছিল। এই সাধারণ সদস্যরাই মূলত ডিইপিএস এর প্রথম ফান্ড তৈরী করে। প্রত্যেকেই ৫০ টাকা করে চাঁদা দেয়। এই ফান্ড থেকেই আমরা প্রাথমিকভাবে সিল, প্যাড, ব্যানার, অফিসের প্যাড, লোগো তৈরী ইত্যাদির সমুদয় খরচ বহন করি। যাই হোক এরপর আমাদের স্থায়ী কমিটির প্রক্রিয়া শুরু হয় ২৯ আগস্ট, ১৯৯৯। আমরা ১৫ সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি গঠন করি। আমি সভাপতি, তারিকুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। শফিকুল ইসলাম বাপ্পিকে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম স্থায়ী কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ফাউন্ডার মেম্বর হিসেবে গণ্য করা হয়। কমিটির মেয়াদ রাখা হলো এক বছর। এরপর প্রতিবছর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন হয়ে আসছে এ পর্যন্ত। সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের পাশাপাশি আমরা একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করি। এর সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ডিইউপিএস এর উপদেষ্টা হিসেবে সংযুক্ত করি। এর মধ্যে ছিলেন তৎকালীন ভিসি এ.কে. আজাদ চৌধুরী, প্রো-ভিসি ড. শাহাদাৎ হোসেন বর্তমান ভিসি আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক, ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, ড. দুর্গা দাস ভট্টাচার্য, ড. অনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। সেবছরই ১৬ই ডিসেম্বর ডিইউপিএস-এর পক্ষ থেকে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করি। ১৪ এপ্রিল ২০০০ পহেলা বৈশাখ ডিইউপিএস-এর প্রথম ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর যাত্রা শুরু হয়। ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন সেই সময়ের প্রো-ভিসি ড. শাহাদাৎ হোসেন এবং ড. আরিফিন সিদ্দিক স্যার। এ প্রোগ্রামে মোট ১১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ট্রেনিং প্রোগ্রাম সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব আবু সাদ্দী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এ.কে. আজাদ চৌধুরী, প্রো.ভিসি ড. শাহাদাত হোসেন, ড. আরিফিন সিদ্দিকসহ অনেকে। পাশাপাশি একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিলো। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী জনাব আবু সাদ্দী। এরপর থেকে প্রতিবছর ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ হলে গ্রেডিয়েন্ট পদ্ধতি যাচাই করে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেয়া হত। একসময় প্রতিষ্ঠাতা কমিটির মেয়াদ শেষে হয়ে আসে। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠাতাদের সকলেই অবসর নেয় কিন্তু প্রতিবছরই একঝাঁক তারুণ্যদীপ্ত, আলোকচিত্রে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডিইউপিএস এ গঠন করা হয় নতুন কমিটি। নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রী, নতুন নতুন মুখ। হাটি হাটি পা করে দিন মাস বছরষ্মুরে একযুগ সাফল্যের সাথে পথ অতিক্রম করেছে সংগঠনটি। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আলোকচিত্রে অংশ নেয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আলোকচিত্র চর্চার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ডিইউপিএস। আগামীতে আরো সফলতার সাথে ডিইউপিএস এগিয়ে চলুক এই কামনা করি। ডিইউপিএস এর সকল কার্যকরী কমিটির সদস্য সাধারণ সদস্য সহকর্মী ও শিক্ষক মণ্ডলী সবার প্রতি রইল শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

আয়োজক



Dhaka University
Photographic Society

প্রাইম স্পন্সর



The power to do more

কো-স্পন্সর



সহ-আয়োজক



সহযোগিতা

journey